রবীন্দ্র-নাটকের ভাব-ধারা

মনোরঞ্জন জানা

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রবীন্দ্র-নাটকের ভাব-ধারা

মনোরঞ্জন জানা

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী
৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

১ম হইতে ৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
নব গৌরাঙ্গ প্রেস্ কর্তৃক
অবশিষ্টাংশ ৫১নং ঝামাপুকুর
লেন, রাজলক্ষ্মী প্রেস্
হইতে শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী
কর্তৃক মুদ্রিত

বাঁধাইয়াছেন
ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক বর্ত্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। রচনা হিসাবে অসার্থক বিবেচিত হওয়ায় যে সেগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা অবশ্য অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। নাট্য-রচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের যে একটি ভাব-ধারা, তাঁহার যে একটি অধ্যাত্ম-সত্তা ধীর বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহারই পরিচয় লাভ বর্ত্তমান রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া কোথাও একই ভাবের পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য, কোথাও বা মূল এই ভাব-ধারা বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হওয়ায় এইরূপ নির্ব্বাচন পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

রচনার ক্রম অনুসারে 'চিত্রাঙ্গদা'র পর 'মালিনী'র স্থান লাভের কথা, তাহা না হইয়া উহা অনেক পূর্ব্বে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র পর চলিয়া গিয়াছে। মুদ্রণ শালায় সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিবার সময় কেমন করিয়া এইরূপ গোলযোগ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে যখন সচেতন হই, তখন ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল না। ইহার জন্য পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন। কয়েকস্থলে মুদ্রণ ত্রুটি আছে তবে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবার মত নয়।

মনোরঞ্জন জানা

৩৬ সাউথ এণ্ড পার্ক, কলিকাতা—২৯

রবিবার, ৫ই পৌষ, ১৩৬৫

সূচীপত্র

প্রকৃতির প্রতিশোধ

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক বা নাট্যকাব্যটি রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক যৌবন, অর্থাৎ বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের রচনা। ইহা সেই সময়কার রচনা যে সময়ে মানুষের প্রাণের জাগরণ ঘটে সবচেয়ে বেশি। প্রাণের জাগরণ ঘটে বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া। জাগতিক সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই যে বোধ তাহা ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ পথ ধরিয়া পঞ্চ রূপে বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও প্রেম মানুষের অন্তরে অনুভূত হয়। আর প্রেমের অনুভূতির যে স্বরূপ অর্থাৎ বিমিশ্র আনন্দ ও বেদনা তাহা এই প্রথম বোধের কালে যুগপৎ অসহনীয় জ্বালা ও হর্ষের সঞ্চার করে। ইহার কারণ মানুষ্য জীবনের এই পর্য্যায়ে ইন্দ্রিয় যথেষ্ট বিকাশ লাভ করিলেও বোধের তীব্রতা বহনের সামর্থ্য তখনও যথেষ্ট হয় না। কেবল তাহাই নহে বিশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের এই যে সংযোগ এবং যোগে এই যে লীলা তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যে সমৃদ্ধ মানস-লোক, (ইহার উর্দ্ধতর বোধের বিকাশের কথা এক্ষেত্রে যদি নাও উল্লেখ করা যায়) এবং যে মানস-লোক কতকটা নিরাসক্ত দ্রষ্টার মত ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারে (কারণ মিলন বোধ না থাকিলে যেমন সম্ভোগ হয় না, তেমনি পৃথক বোধ না থাকিলেও ভোগ হয় না) সেই মনের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ততটা না থাকায় মানুষ কতকটা অসহায়ভাবে আত্মকর্তৃত্ব শূন্য হইয়া প্রকৃতির প্রাণ-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়। কেবল একটা অস্থির উদ্বেগ ও উত্তেজনায় মানুষ উদ্বেলিত সমুদ্র তরঙ্গে ছিন্ন-পাল তরণীর মত দিক-শূন্য হইয়া ক্রমাগত আছড়াইয়া পড়িতে থাকে। মনে হয় যেন কোন একটা মুহূর্ত্তে শতখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া কোন অতলে তলাইয়া যাইবে।

এই ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ ও প্রাণ চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়াই যখন ধীরে ধীরে মনের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটিতে থাকে তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের

উপর কতকটা শাসন যেমন আসে তেমনি প্রাণের এই অতি অস্থির অত্যন্ত চঞ্চল অনুভূতি ওই লোকে যথেষ্ট গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়া ধীর শান্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রাণের এই প্রথম জাগরণের কালে মানুষের যে অসহায়তা বোধ তাহা জয় করিয়া উঠিতে মানুষের জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগে, তাহা হইল ইন্দ্রিয় ও প্রাণের মূলে যে হৃদয় তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবার বা নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা। তাহা হইলে অন্তরে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ যেমন থাকিবে না তেমনি তজ্জনিত সংগ্রামও সেই সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা যদি সম্ভবও হয়, অর্থাৎ এই চেষ্টায় মানুষ যদি তাহার হৃদয়কে সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে এবং এইরূপে সকল অন্তর্দ্বন্দ্বকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিতে পারেও ইহা মানুষের জীবনের নিষেধাত্মক বা negative ফল পরিণাম, কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টার আস্তিক্যের দিকটি কি? বস্তুতঃ হৃদয় নিরুদ্ধ করাই যেখানে একমাত্র চেষ্টা সেখানে আস্তিক্যের দিক বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; কারণ এক্ষেত্রে তথাকথিত যে শান্তি তাহা শূন্যতার শান্তি, আত্মহত্যার শান্তি। ইহা জীবনের ছেদ, পূর্ণতা সাধন নয়।

সুতরাং পূর্ণতা সাধনের জন্য ভিন্ন পথ দেখিতে হয়। সে সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হৃদয় নিরুদ্ধ করিবার যে সাধনা, যে শূন্যতা বা আত্মহত্যার পথ সন্ন্যাসী বাছিয়া লইয়াছিল তাহা যে-জীবনের আদর্শ হোক, সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ নয়। সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ কী তাহার কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে তাহার একটি আস্তিক্যের দিক আছে। সেই পরা আস্তিক্যের সন্ধান লাভের পর তাহারই যোগে কেমন করিয়া সকল অনস্তিত্বও পরিণামে আস্তিক্যের বোধ জাগ্রত করে তাহার আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে এইকালে রবীন্দ্রনাথ যাহা বুঝিতেন আমরা তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই নাটকে যে দ্বন্দ্ব তাহা

ওই আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনাদর্শের। এই কালে পূর্ণ জীবনবোধ এবং পূর্ণ জীবনাদর্শ সম্পর্কে তিনি যাহা বুঝিতেন তাহারও আলোচনা প্রয়োজন।

সন্ন্যাসী ওই বিশিষ্ট সাধন পথ কেন অবলম্বন করিয়াছিল সন্ন্যাসীর উক্তির মধ্যেই তাহার কারণ লাভ করিতে পারা যাইবে। সৌন্দর্য্য ও প্রেমরূপে অভিব্যক্ত প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া সন্ন্যাসী বলিতেছে—

"আমার হৃদয় রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবস-রজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি।
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ,
হৃদয়ের রক্ত পাতে বিশ্ব রক্ত ময়
রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।
বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো।
নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে
দিনরাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস।"

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে সন্ন্যাসী ওই পথ অবলম্বন করিয়াছিল জীবনের গভীরতর কোন সত্য প্রেরণায় নয়, যাহাকে Positive বা সাধনলক্ষ্যের আস্তিক্যের দিক বলা যাইতে পারে। সন্ন্যাসী ওই পথ অবলম্বন করিয়াছিল হৃদয়ের অশান্ত ভাব দূর করিবার জন্য! অশান্তি বহুবিধ আছে। সন্ন্যাসীর অশান্তির স্বরূপ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের বিক্ষোভ। তাহাও বিশিষ্ট কোন বোধ নয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ কোন একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়াও প্রকাশ লাভ করে নাই। কারণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যেখানে একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করে সেখানে তাহা যথেষ্ট গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে। ওই বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের সকল রূপ সম্ভোগ করে। প্রাণ যেখানে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়াছে সেখানেই বুঝিতে

হইবে মানুষের মনের বিকাশ ও সমৃদ্ধি অনেকটা ঘটিয়াছে। সন্ন্যাস জীবনের যে এষণা তাহা মনেরও উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য। সুতরাং মানস-লোকের সম্পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি ব্যতীত ওই এষণা সার্থকরূপে জাগা অসম্ভব; জাগিলেও জীবনে তাহা সত্য অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিণাম রূপে জাগে না বলিয়া তাহার কোন সত্যফল লাভ থাকে না।

এখন কতকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে সন্ন্যাসীর ওই পথ অবলম্বনের গোপন প্রেরণার স্বরূপ কি, তাহা হইল ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা। ইহার সহিত গভীর কোন আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা জড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণের এই প্রকাশ যে কিরূপ দুর্ব্বার হইয়া দেখা দিয়াছিল এবং এই ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ, প্রাণের এই অসহনীয় প্রকাশকে শান্ত করিতে তাঁহাকে যে কত রূপে কত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল (এই সংগ্রামও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। মানুষের অন্তর্জীবনের প্রয়াস মাত্রকেই আধ্যাত্মিক প্রয়াস বলা হয়। কারণ এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই উন্নততর বোধের বিকাশ ঘটে, এবং তাহার সহিত নিম্নতর বোধসমূহের ধীর সামঞ্জস্য সাধিত হইতে থাকে।) তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় তাঁহার এই সময়কার রচনা 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে।

সন্ন্যাসীর এই জাতীয় চেষ্টার যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলাম তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তির মধ্যেও লাভ করিতে পারা যাইবে। নাটকটি সম্পর্কে তিনি একস্থলে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—

"This was to put in a slightly different form the story of my own experience, of the entrancing ray of light which found its way into the depths of the cave into which I had retired away from all touch with the outside world and made me more fully one with Nature again." (My Reminiscencs)

দুশ্চর সাধনা ও দুঃসহ কৃচ্ছ্রতা ভোগের পর দীর্ঘকাল পরে সন্ন্যাসী যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সে তত্ত্ব সন্ন্যাস-জীবনের উপলব্ধ তত্ত্ব নয়। সন্ন্যাস জীবনে উপলব্ধ সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এইকালে যে ধারণা ছিল তাহাকেই তিনি একভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। সন্ন্যাসী সুদীর্ঘ তপস্যার ভিতর দিয়া যাহা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ হৃদয় নিরোধ। সন্ন্যাসীর এই অবস্থার স্বরূপ আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাহা হৃদয় নিরোধও নহে। মনোবিদ্যায় হৃদয়বোধের অবদমন বলিতে যাহা বুঝায় সন্ন্যাসীর এই অবস্থা তদতিরিক্ত আর কিছু নহে। অবদমিত বোধ বস্তুর সান্নিধ্যে আবার ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করিতে বাধ্য। ধ্যানাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী যখন আবার সংসারে ফিরিয়াছে তখন দীর্ঘকালের দমিত হৃদয়-বোধগুলি একের পর এক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সন্ন্যাসী যদি আদৌ হৃদয়বোধ জয় করিয়া উঠিতে চায় তবে তাহার ঊর্দ্ধতর চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া কারণ সন্ন্যাসী জানে প্রাণ-লোকে থাকিয়া প্রাণকে একপ্রকার দমিত হয়ত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা একপ্রকার অসম্ভব। বৃত্তির দমনে আধ্যাত্মিক কোন ফল লাভ নাই, কেবল তাহাই নহে তাহাতে মনুষ্য-সত্তা বিকৃত হইয়া পড়ে। মনুষ্য সত্তার বিকাশ বিরুদ্ধ যে-কোন চেষ্টায় স্বভাব বিকৃতি অনিবার্য্য।

তাই বলিতে চাহিয়াছিলাম সন্ন্যাসীর উপলব্ধ বৃহৎ বৃহৎ তত্ত্বে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবার কোন কারণ নাই, কারণ উহা না সন্ন্যাসীর জীবনে না নাট্যকারের (রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ জীবনপর্য্যায়টির কথা বুঝিতে হইবে) জীবনে উপলব্ধ সত্য। সন্ন্যাসীর জীবনে ওই চিত্তবৃত্তি জয় করার চেষ্টাও নয় দমিত করিবার প্রয়াসটির স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই জাতীয় কোন চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ ওই কালে কোন সময়ে যে করেন নাই তাহা নহে। প্রাণাবেগের প্রবল প্রতিক্রিয়া স্বরূপে ওই জাতীয়

চেষ্টা সাময়িক ভাবে মানুষের জীবনে জাগা একান্ত স্বাভাবিক। এই জাতীয় চেষ্টা কী কারণে নিষ্ফল, কী কারণে এই জাতীয় সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায় তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সেই ব্যর্থতার কাহিনীটিকেই নাটকে নানা তত্ত্বের ছদ্মবেশে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

একদিকে এই যেমন ব্যর্থতা, তেমনি অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ব্যাপী উপলব্ধ সত্যের একটি বীজভূত প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই সত্যটিকে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ত্তমান নাটক আলোচনার ইহাই মুখ্য প্রয়োজন।

গিরি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে আবার সংসার প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই সংসার প্রত্যক্ষ করিবার পশ্চাৎ প্রেরণা কি তাহার কোন উল্লেখ নাটকটির মধ্যে নাই। নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী সংসারে তাহার উপলব্ধ সত্য প্রচার করিতে আসে নাই, কিংবা তাহাই হয়ত কে বলিতে পারে।

সংসারে অগনিত নর-নারী তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনে ব্যাপৃত, তুচ্ছ হৃদয়-বোধে মুগ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। ইহাদের মাঝখানে বৃহতের কোন আসন পাতা নাই। প্রথম সংসার দৃষ্টে সন্ন্যাসীর অন্তরে একপ্রকার ঘৃণা, উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বোধ জাগিয়াছে দেখিতে পাই। আর সেই সঙ্গে আপনার হৃদয় জয়ের ও পূর্ণ জ্ঞান লাভের অহঙ্কার, হয়ত বঞ্চিত অগনিত নর-নারীর জন্য কিছু করুণা !

"এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলেরে নিশ্বাস।"

সন্ন্যাস জীবনের যে ত্যাগৈক প্রেরণা তাহা নিষেধাত্মক নহে, তাহা সম্পূর্ণ আস্তিক্য মূলক। অর্থাৎ তাহা এমন একটি পরা-চেতনার সন্ধান লাভের চেষ্টা যাহাতে সকল প্রাণ, প্রাণের সকল প্রকাশ অর্থাৎ রূপ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহা অসীম অনন্ত বলিয়া সকল

প্রাণ ও সকল রূপকে যুক্ত করিয়াও লাভ করিতে পারা যায় না, সকল প্রাণ ও রূপকে তাই ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। এই ছাড়াইয়া উঠিবার আকাঙ্ক্ষা যে মূলে যুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহা ভুলিলে চলিবে না। নাটকে সন্ন্যাসীর যে বিশিষ্ট সাধনা ও সিদ্ধি তাহা আদৌ শূণ্যতার সাধনা বলিয়া উহা সন্ন্যাসীকে বিশ্বের সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়েছে। সন্ন্যাসী ব্যক্তিগত জীবনে যে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার স্বরূপ যাহাই হোক-না-কেন সন্ন্যাসী পুনরায় বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে কেন—"পারি কি এদের মাঝে মিশিতে আবার।"

প্রাণের অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার। প্রাণের অনুভূতি যত গভীর ও নিবিড় হয়, আনন্দ ও বেদনাবোধও তত তীব্রতা লাভ করে। সুতরাং প্রাণ নিরুদ্ধ করিলে অনিবার্য্য রূপে আনন্দ ও বেদনা যুগপৎ লুপ্ত হয়। সন্ন্যাস জীবনে মানবিক আনন্দ ও বেদনা ব্যতিরিক্ত অন্য ফল লাভ আছে, তাহার যে নাম দেওয়া যাক্-না-কেন; কিন্তু প্রাণের স্তরে থাকিয়া প্রাণকে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টার মধ্যে কোন আস্তিকের দিক নাই, ইহাতে তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ শ্বাস-রুদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটপট করিতে থাকে। সন্ন্যাসীর মানসিক অবস্থাকে একমাত্র এই অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসীর নিরুদ্ধ প্রাণের কান্না আবার তাই অমন করিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়াছে।

অসহায়া বালিকার পিতৃ সম্বোধন তাইতো মুহূর্ত্তের জন্য সন্ন্যাসীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। "আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে।" আহা! সে ডাক যেন নিদাঘ দগ্ধ পথিকের উপর হঠাৎ এক পশলা বর্ষণের মত,—দেহের সকল জ্বালা তাহাতে জুড়াইয়া যায়, পদতলের অগ্নিপাত্রবৎ মৃত্তিকা যেন মাতৃ বক্ষের স্নিগ্ধতা লাভ করে। প্রাণ-লোকে থাকিয়া সন্ন্যাসী প্রাণকে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সুতরাং প্রাণের স্পর্শে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইতে বাধ্য, আবার প্রাণের যে বোধ অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা তাহাকে

যে স্বরূপেই হোক স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সন্ন্যাসী ধীরে এই প্রাণের জগৎটিকে ফিরিয়া লাভ করিতে চলিয়াছে।

বোধ বা সংস্কার যতই মিথ্যা হোক-না-কেন দীর্ঘকাল ধারণ করিয়া রাখিলে সহজে পরিহার করিতে পারা যায় না। প্রাণের বোধ মাত্রকেই সন্ন্যাসী এতকাল অপরাধ বলিয়া জানিয়াছে, জানিয়াছে যে উহা মানুষের জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করিয়া ঘোর বিনষ্টি ঘটায়, জানিয়াছে মানুষের সার্থকতার পথ ইহার ঠিক বিপরীত। প্রাণের এই বোধ সঞ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর অন্তরে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সন্ন্যাসী বালিকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায়, কিন্তু প্রয়াস মুহূর্ত্তে আবার অভিমানে আঘাত লাগে—'আমার দীর্ঘকালের তপস্যা এত ভঙ্গুর! এত স্পর্শকাতর! এমনি হীনবল!'

"অবহেলা করি আমি বিশ্ব জগতেরে
বালিকা দেখিয়া শেষে পালাইতে হবে।"

সন্ন্যাসীর তাই বালিকাকে পরিহার করা ঘটিয়া উঠিল না। সন্ন্যাসী বালিকাকে আরও নিবিড় করিয়া নিকটে লাভ করিয়াছে। এই নিবিড় প্রাণের অনুভূতি সন্ন্যাসীর অন্তরে এক অলৌকিক বোধের সঞ্চার করিয়াছে। এই বোধে মানুষ তাহার অস্তিত্বের সীমাবোধ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া যায়।

"আহা তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।"

নিবিড় প্রীতিবোধ মানুষকে মুহূর্ত্তের জন্য অসীমের আস্বাদ অর্থাৎ বোধের সীমাহীন প্রসারতা দান করিতে পারে সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসী এই আস্বাদকে তাহার ইতিপূর্ব্বের ধ্যানের আস্বাদের সহিত তুলনা করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসীর ধ্যানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা শূন্যতার উপলব্ধি মাত্র। সন্ন্যাসীর এই নিবিড় প্রীতিবোধের উপলব্ধি পূর্ণতার, তাহা সীমা-লোকে হোক, অথবা অসীম-লোকে হোক।

প্রাণের এই উপলব্ধিতে এই প্রীতি বা প্রেমে যেন জগতের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই বিশ্বের আপাত রূপের মধ্যে যে কী অপরূপতা, আপাত তুচ্ছতার মধ্যে যে কী মহিমা তাহা আমরা কেবল মাত্র তখনই বোধ করিতে পারি যখন আমরা ইহাকে ভালোবাসি। এই অনুরাগ দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বের একটির পর একটি অবগুণ্ঠন খুলিয়া যায়, রস ও মাধুর্য্য-লোকের দ্বার একটির পর একটি উদ্ঘাটিত হইতে থাকে।

বালিকার প্রতি প্রীতির ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রাণ সন্ন্যাসীর অন্তরে কিছুমাত্র সঞ্চারিত হইয়া যাইতে সন্ন্যাসী এই জগৎ ও জীবনকে বড় মধুর অপরূপ মাধুর্য্য মণ্ডিত বলিয়া বোধ করিয়াছে।

"সহসা পড়িল চোখে একী মায়া ঘোর,
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি।"

সন্ন্যাসী তাহার পর আপনার প্রাণকে আপনি ভুলাইয়াছে। প্রাণ এমনি করিয়া সকল অভিমান ভুলাইয়া মানুষকে দিয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধি করাইয়া লয়। প্রাণের আকর্ষণ ইতিমধ্যেই সন্ন্যাসীর জীবনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়া চলিয়াছে চিত্তের গভীরে সন্ন্যাসীর সচেতন মনের বাহিরে।

"আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া।"

সংসার সন্ন্যাসীর নিকট এমনি অনতিক্রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর সন্ন্যাসী আপনার হৃদয় বোধ সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। বালিকাকে কখন সঙ্গে লইয়া কখন তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়া আবার নিকটে গভীর অনুকম্পাভরে টানিয়া লইয়া আবার তীব্র ঘৃণায় দূরে বিতাড়িত করিয়া সন্ন্যাসী তাহার ইতিপূর্ব্বের মানসিক অবস্থাটি ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে। সন্ন্যাসীর জীবনের এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীর অন্তর যে কতকটা সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে (মানস-লোকের সহিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-লোকের) তাহা আমরা অনুমান করিতে

পারি। এই সামঞ্জস্য লাভের ফলে সন্ন্যাস-পূর্ব্ব জীবনের ইন্দ্রিয় ও প্রাণের বিক্ষোভ যথেষ্ট শান্ত হইয়াছে। এখন তাহা কতকটা মানস-সংযোগ ও মানস-সম্ভোগ বলিয়া শান্ত গম্ভীর, বিশ্বের সে রূপ মাধুরী অতি স্নিগ্ধ, অপরূপ করুণা বিজড়িত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া একদিকে সন্ন্যাসীর মানস-লোকটি যেমন সমৃদ্ধ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত ধীর সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। এই যে পরম গম্ভীর ব্যাপ্ত করুণার কথা বলিলাম তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে সন্ন্যাসীর উক্তির মধ্যে। হৃদয় নিরুদ্ধ করিবার ওই প্রয়াস সন্ন্যাসী অবশ্য তখনও পর্য্যন্ত ত্যাগ করে নাই, কিন্তু ওই প্রয়াসের মধ্যে ইতিপূর্ব্বের দম্ভ নাই।

"অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়
তোদের সে মেঘময় মায়া দ্বীপগুলি।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।"

'আমি ফিরিব না' সন্ন্যাসীর এই উক্তির মধ্যে কী শ্রান্তি, কী অবসাদ না জড়িত হইয়া আছে! আনত হৃদয়ের ভার!

সন্ন্যাসী পুনরায় দীর্ঘকালের জন্য ধ্যান মগ্ন হইয়াছে। ধ্যানের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসী যে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বের চিত্তবৃত্তি নিরোধের শান্তি নয়, তাহা উন্নততর বোধের সহিত নিম্নতর সকলবোধের সামঞ্জস্য উদ্ভূত। ধ্যান ভাঙ্গিয়া সন্ন্যাসী বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে।

"সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।"

সীমা আজ আর সন্ন্যাসীর নিকট মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতেছে না। আজ তাহার নিকট অসীম যতখানি সত্য, সীমাও ঠিক ততখানি

সত্য। সীমাও অসীমের মধ্যে সংযোগ সেতুর নাম প্রেম। মর্ত্ত্যের প্রেম মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে সীমা হইতে অসীমে লইয়া যায়, আবার মর্ত্ত্যের ওই প্রেমের পথ বাহিয়া মানুষ অসীম হইতে সীমায় নামিয়া আসে। সীমাও অসীমের যোগের লীলার নাম প্রেম।

ইহার ভিতর দিয়া সন্ন্যাসী আর একটি তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে। ইহাকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন উপলব্ধ সত্যের বীজমন্ত্র বলা যাইতে পারে।—"অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি।"
রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"This Nature's Revenge may be looked upon as an introduction to the whole of my literary work ; or rather this has been the subject on which all my writings have dwelt—the joy of attaining the Infinite with the finite. (My Reminiscences)

বালিকাকে রাখিয়া সন্ন্যাসী একাকী সংসার পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে। এবার সন্ন্যাসী মর্ত্ত্য-প্রেমের এক বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। তাহা দুই বন্ধুর বিদায়কালীন দৃশ্য। বিশ্বে ইহাই প্রেমের একমাত্র স্বরূপ। আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহাকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে চাহি না। বুকের মাঝখানে প্রেমাস্পদকে লাভ করিয়াও কী অধীরতা শান্ত হয়। বিশ্বে সব কিছু যে ফুরাইয়া যায়, হারাইয়া যায়, তাই ভয় বাহুবন্ধন এতটুকু শিথিল হইলে বুঝি আমার প্রেমের পাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইবে। কাঁদিয়া সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করিলেও তাহার আর দর্শন মিলিবে না। মানুষের প্রেম এমনি অসহায়! নর-নারীর প্রেমে তাই এত অধীরতা এত অশ্রুপাত এমন আশঙ্কা।

"একী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল,
হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না।

তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।"

ইহাই যদি প্রেমের একমাত্র স্বরূপ হয়, এত ক্ষণিক, এমনি নির্ভরতা শূন্য, এমনি সহজ নিঃশেষ বিলুপ্তি তবে এই প্রেমে মানুষের কী প্রয়োজন। ইহা নিত্য অতৃপ্তি জাগাইয়া ক্ষণকালের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তবে কেন এই জীবন সর্ব্বস্ব সমর্পণের পণ। সন্ন্যাসী শেষবারের মত বালিকাকে বিতাড়িত করিয়া হৃদয় নিরুদ্ধ করিবার জন্য ধ্যান মগ্ন হইয়াছে। সন্ন্যাসী তখনও বুঝিতে পারে নাই যে মর্ত্ত্যের প্রেম ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী প্রেম তীব্রতায় গভীরতায় মুহূর্ত্তে সকল সীমার বোধ ছাড়াইয়া যায়। মুহূর্ত্ত সেই অসীমের যোগে চিরন্তন হইয়া উঠে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে চেষ্টা করিয়াও আর আপনার হৃদয় নিরুদ্ধ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী বুঝিয়াছে এই চেষ্টা মনুষ্য স্বভাব বা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যে প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে অনন্তকোটি রূপ-লোক বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, সেই প্রাণ-সমুদ্রেরই একটি বুদ্বুদ এই 'আমি'। অন্তহীন দেশ-কালের বক্ষে কণাতম দেশ-কালে ইহার প্রকাশ, মুহূর্ত্ত কাল পরে উহা আবার ওই প্রাণ-সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইবে। যে প্রাণের যোগে এই প্রাণের প্রকাশ সে প্রাণ কেমন করিয়া এই প্রাণকে ছাড়াইয়া উঠিবে! ইহার বিপক্ষ যুক্তি আছে, কিন্তু সে আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী তথা রবীন্দ্র-নাথের উপলব্ধ সত্যটিকে বুঝিলে আমাদের চলিবে। সন্ন্যাসী তাই পরিশেষে এই পথ নিঃসংশয়ে পরিহার করিয়াছে। সন্ন্যাসী সে কথা বলিয়াছে—

"যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।"

হৃদয় নিরুদ্ধ করিবার যে চেষ্টা তাহা সন্ন্যাসীর মতে অহংকার

প্রসূত। এই চেষ্টা তাই মানুষকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনে। মানুষ যেখানে আপনার প্রাণকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হয় সেইখানে মানুষের মুক্তি সেইখানে মানুষের সর্ব্বশেষ সার্থকতা।

কিন্তু ইহাই নাটকের শেষ কথা নয়। সন্ন্যাসী এতকাল প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। প্রকৃতি এতকাল ধরিয়া বালিকা মূর্ত্তি ধরিয়া নানারূপে তাহার স্নেহ কামনা করিয়াছে, বারংবার সন্ন্যাসী তাহাকে আঘাত দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী আজ মর্ত্ত্যপ্রেমের সত্যমূল্য বোধ করিলে কী হইবে তাহার এই দীর্ঘকালীন নিষ্ঠুরতার জন্য ওই প্রেম চরিতার্থ হইবার আর পথ পাইবে না। মর্ত্ত্য-প্রেম একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া যেমন হৃদয়ে অনুভূত হয়, তেমনি এই বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া তাহা বিশ্বমুখীন হয়। এই রূপ হারাইয়া গেলে প্রেম চিরকালের জন্য হাহাকারে হারাইয়া যায়। সন্ন্যাসীর প্রেমে বালিকা ছিল আশ্রয়। প্রকৃতি ওই বালিকাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়া সন্ন্যাসীকে চিরান্ধকার লোকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। প্রাণকে নিপীড়ন করিলে প্রাণ এমনি করিয়া তাহার শাস্তি বহন করিয়া আনে।

মালিনী

মালিনীর মধ্যে প্রেমের যে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় বর্ত্তমান আলোচনায় কেবল তাহারই স্বরূপ বিচার করিব।

মালিনীর প্রেম প্রকাশের স্পষ্ট দুটি দিক নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একটি তাহার দিব্যানুভূতির দিক, অপরটি তাহার মানবিক দিক। দিব্যানুভূতির দিক বলিতে আমি জীবনের সেই দিকটির কথাই উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি যাহাকে সাধারণ মানবিক বোধ ও বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় না। নাটকের মধ্য হইতে এই ভাবের পরিচায়ক কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। উদ্ধৃতি কয়েকটির মধ্যে সেই দৈব ভাবের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে যাহা মানবিক বোধ ও বুদ্ধির অতীত, যাহার সহিত কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের নিত্য সম্বন্ধ নাই। মালিনী প্রাচীন হিন্দু সংস্কার ও অধ্যাত্ম বিশ্বাসের মধ্যে সাধারণ মানব জীবনের প্রাণ প্রবাহ হইতে অনেক দূরে রাজ অন্তঃপুরে সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত। সেই মালিনী 'নবধর্ম্মে' দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে ওই ধর্ম্ম প্রচারকদের নিকট হইতে। তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনার ভিতর দিয়া সেবা ও ভক্তির ভিতর দিয়া মালিনী তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্বগুলিকে আপনার জীবনে একান্ত বালিকা বয়সে অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মালিনী এখন নবধর্ম্মের বিগ্রহ স্বরূপিনী ব্যক্তিগত বাসনা ও কামনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সম্পূর্ণ অধ্যাত্মময় জীবন বলিতে যাহা বুঝায় মালিনী এখন সেই জীবন লাভ করিয়াছে। অধ্যাত্মময় বা দিব্য জীবন বলিতে বুঝায় ঈশ্বরীয় ইচ্ছার মধ্যে আপন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়া, সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় ইচ্ছার দ্বারা আপনার জীবনের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করা।

সেই ঈশ্বর-ভাব-ভাবিতা জীবনের নানা অনুভূতির পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে পাওয়া যাইবে।

"নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে

কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মুরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো ; বায়ুর তরঙ্গ যত,
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথা সম
কী যেন বাজিছে আছি অন্তরেতে মম
বারংবার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে,
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।"

একমাত্র এই দিব্য জীবন আশ্রয় করিয়া দিব্য অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়। মালিনীর জীবনেও সেই অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"আমি স্বপ্ন দেখি জেগে.
শুনি নিদ্রা ঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকা খানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই—গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে ; কোথা হ'তে বিশ্বাস আমার
এল মনে ?"

এই দিব্য অভিপ্রায় কেবল সেই জীবনকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয় যে জীবন সম্পূর্ণ মানবিক অভিপ্রায় শূন্য, মানবিক সর্ব্ববিধ সম্পর্কের বন্ধন মুক্ত। মালিনীর জীবনে তাই কোন ব্যক্তিগত অভিপ্রায় নাই, তাহার জীবনেও তাই সকল সম্পর্ক-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

"বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা—সে যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।"

সেই অলৌকিক অনুভূতির কথা মালিনী নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

"আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যত দুঃখ সেথা আছে সকলের 'পরে
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
অনন্ত-প্রবাহে।"

কিংবা

—"দেহ নাহি মোর, বাধা নাই
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।"

এই নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিকেই একপ্রকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে ধর্ম্ম কোন অতি মানবিক বোধ নয়, তাহা কোন অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপও নয়, তাহা বস্তুতঃ মানবিক বোধই তবে তাহা অনিয়ন্ত্রিত নয় ঈশ্বরীয়বোধমুখীন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রিত মানবিক বোধই ঈশ্বরমুখীন হইয়া এমন প্রসারতা ও গভীরতা লাভ করিতে পারে যাহাকে আমরা ঈশ্বরীয় বোধ বলিতে পারি। ঈশ্বরীয় বোধ (Divine love) রবীন্দ্রনাথের মতে মানবিক বোধেরই (Human affection) উন্নততর পরিণাম। এই দুই সম্পূর্ণ বিপ্রকৃতিক নয়। যাঁহারা এই দুই বোধকে সম্পূর্ণ বিপ্রকৃতিক বলেন তাঁহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথ এক মত নন। মানবিক বোধই অচিন্তনীয় প্রসারতা ও গভীরতা লাভ করিয়া ওই পরিণাম লাভ করে বলিয়া মানবিক বোধের যে স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দ ও বেদনাও আশ্চর্য্য প্রসারতা ও গভীরতা লাভ করে। এই অতি ব্যাপ্ত আনন্দ ও বেদনা পরিণামে এক অখণ্ডতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বানুভূতি।

উপরে যে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাহা আর-যাই-হোক একান্ত মানবিক বোধের

(Human affection) প্রসার নয়। এই প্রত্যেকটি অনুভূতি ও দৈব প্রেরণার পশ্চাতে মানবিক বুদ্ধি ও বিচার কিছুমাত্র নাই।

মালিনী স্বয়ং কিন্তু ইহাকে তাহার ভাব তন্ময় মুহূর্ত্তের অনুভূতি বলিয়া সুপ্রিয়ের নিকট উল্লেখ করিয়াছে। ইহার স্বরূপ সে আপনিও জানে না। কোন্ দিব্য ইচ্ছা তাহার জীবন আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত, সার্থক হইতে চায় তাহাও সে জানে না। শুধু জানে তাহার সকল কর্ম্ম সেই ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তাহার পর ওই দিব্য প্রেরণা মুহূর্ত্ত যখন তাহার জীবনে থাকে না তখন সে সাধারণ বোধ সম্পন্না বালিকা মাত্রে পরিণত হইয়া যায়। তখন পূর্ব্ব জীবনের সকল প্রয়াস তাহার মনে অলৌকিক ভীতির সঞ্চার করে।

মালিনী স্বয়ং তাহার জীবনে এই উভয় জাতীয় প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ইহাদের যোগের রহস্য সে আপনিও বোধ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ মালিনীর জীবনে সেই মানবিক বোধের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহা সমুন্নত, মার্জ্জিত, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের সহিত বিজড়িত কিন্তু তাহা যে মানবিক বোধ (Human affection) তাহা বুঝিয়া লইতে ভুল হয় না। এই প্রেরণা এবং উপরের দৈবী প্রেরণার মধ্যে যোগের সেই রহস্যটি কি, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ ইহার কোন্ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহা পরে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব। বর্ত্তমানে মালিনীর মানবিক বোধের পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। সুপ্রিয়ের সহিত বিবাহ প্রস্তাবে মালিনীর কপোল লজ্জায় অরুণিম হইয়াছে দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন।

> "কন্যা কোথা ছিল এ শরম
> এতদিন! বালিকার লজ্জা ভয় শোক
> দূর করি দীপ্তি পেত অম্লান আলোক
> দুঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হতে এল আজ
> অশ্রুবাষ্পে ছল ছল কম্পমান লাজ—"

রাজা ইহার পর বলিয়া উঠিয়াছেন—

"আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এত ক্ষণে
বিকশি উঠিল — দেবী না রে দয়া না রে
ঘরের সে মেয়ে।"

ইতিপূর্ব্বে মালিনীর জীবনে যে দৈবী প্রেরণার উল্লেখ করিয়াছি তাহা আদৌ মানবিক বোধের প্রসার কিনা এবং তাহা কোন পরিণামে ওই বোধ লাভ করিতে পারে কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে এবং তাহা যুক্তি বিচার সাপেক্ষ হইলেও রবীন্দ্রনাথের মনে এ সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না। মানবিক বোধের প্রসার রূপে তিনি যে মানব ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করেন তাহার পরিচয় তিনি সুপ্রিয়ের উপলব্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুপ্রিয়ের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের নিজের উপলব্ধি।

"বুঝিলাম, ধর্ম্ম দেয় স্নেহ মাতা রূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন, দাতা রূপে
করে দান, দীন রূপে করে তা গ্রহণ,
শিষ্য রূপে করে ভক্তি, গুরু রূপে করে
আশীর্ব্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব্বত্যাগ। ধর্ম্ম বিশ্ব লোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্ত জাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেম ক্রোড়ে, সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে।"

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া নর-নারীর যে প্রেম লীলা, প্রেমের যে বিচিত্র সম্পর্ক ধর্ম্ম বলিতে এই মানবিক বোধের বিচিত্র লীলা-রূপটিকে বুঝায়। বিশ্বের এই বিচিত্র প্রেম লীলাকে যত গভীর করিয়া যত ব্যাপ্ত করিয়া মানুষ লাভ করিতে পারে বিশ্বের যত রূপের সহিত মানুষ আপনাকে বাঁধিতে পারে সে মানুষের ধর্ম্ম তত উন্নত। মানবিক বোধটিকেই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মের আদি ও অন্ত পরিণাম রূপে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কিন্তু মানবিক বোধ বলিতে কেবল তাহার মাধুর্য্য ও প্রেমটিকেই বুঝায় না, তাহার অপরাধ প্রবণতার একটা দিক আছে এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য ইহার সহিত মানুষকে সংগ্রাম করিতে হয়। এক মানবিক প্রেমই যদি নিম্নতর চেতনা পর্য্যায়ে নানা বিবৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয় তবে মানবিক প্রেম উন্নততর পর্য্যায়ে যে কোন ভিন্ন স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় না তাহা ওই পরিণাম লাভ না করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না।

মনুষ্য বোধকে ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম দানের জন্য তাহার ওই বোধকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য মানুষের উন্নততর বৃত্তিগুলির নিয়ত অনুশীলনের জন্য সচেতন পদ্ধতির প্রয়োজন। এই সচেতন পদ্ধতি দেশ-কালে এমন কি মানুষে মানুষে পৃথক। মানুষ তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম্ম অনুযায়ী ওই পদ্ধতি বা পথ সৃষ্টি করে। সে পথ তাহার সম্পূর্ণ নিজের পথ তাহা তাই অন্য কাহারও পথ বা পদ্ধতি হইতে পারে না। মানুষের ভুল হয় এখানে। এই একের পথকে সে অন্যের সাধন পথ রূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

অন্তরের দিব্য আলোকে তাঁহারা আপনার পথ কাটিয়া চলেন। সেই আলোক না থাকিলে যে-কোন সাধন পথই বন্ধ্যা। তাহা কেবল মানুষকে ঘুরাইয়া মারে। তাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের নানা অজ্ঞতা, কুসংস্কার, নিম্নতর নানা প্রবৃত্তি বাসা বাঁধে, ক্রমে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়।

মালিনীর জীবনে এই দৈবী প্রেরণা যদি সত্য হয়, তাহা যদি আদৌ মানবিক বোধের একপ্রকার ভাবময় প্রকাশ হইয়া থাকে তবে জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার একটা পথ প্রয়োজন। নর-নারীর জীবনে এই দৈব প্রেরণা আসে, কিন্তু মুহূর্ত্তের এই প্রেরণা লাভটাই জীবনে সব নয়। ওই বোধকে জীবনে স্থায়ী করিয়া তুলিতে হয়। এই বোধকে জীবনে স্থায়ী করিয়া তুলিতে হয় নানা অনুশীলন বা চর্চ্চার ভিতর দিয়া। ইহাকেই বলে সাধনা বা তপস্যা। ইহার ভিতর দিয়া জীবন এমনভাবে গড়িয়া উঠে যাহাতে ওই বোধটি

স্থায়ী হয়। ইহাই প্রকৃত দিব্য জীবন লাভ। জীবনের এই প্রস্তুতি না থাকিলে মুহূর্ত্তে দিব্য প্রেরণা নিম্নতর চেতনায় নানা বিকৃতরূপে, নানা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারে। তাহাতে মানুষের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই হয় বেশি।

মালিনী এই অনুভূতির কথা সুপ্রিয়কে বলিয়াছে। এই দিব্য প্রেরণা মুহূর্ত্ত পার হইয়া গেলে তাহার জীবন শূন্যময় হইয়া যায়। তাহার আপন কর্ম্মেরও সে কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না। সাধারণ বোধে ফিরিয়া আসিলে সাধারণ মানুষের মতই সে সংসারের জটিলতায় বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়ে :

"মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্য জ্ঞান ক্ষণ-প্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে।"

মালিনী তাহার এই দিব্যানুভূতিকে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। মালিনী তাহার দিব্য অভিপ্রায় পূত জীবনে তাই সুপ্রিয়ের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে। দিব্য জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দিব্য প্রেরণা একমাত্র পরিশুদ্ধ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া জীবনে সার্থকভাবে লীলা করিতে পারে।

সুপ্রিয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, নানা শাস্ত্র তাহার অধিগত, কিন্তু ছিল না কেবল সেই দৈবী প্রেরণা, সেই অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার। বিশ্বের সকল তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিয়াও দিব্যানুভূতি লাভ করিতে পারা যায় না। এই সকল জ্ঞান তাহার জীবনে তাই একান্ত ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সুপ্রিয় মালিনীর মধ্যে আত্মার সেই দিব্যাভরণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। আপনার সকল পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তাই সে তাহার চরণে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিতে কিছুমাত্র সংশয় বোধ করে নাই। জ্ঞান হইল প্রদীপ দিব্য-প্রেরণা তাহার শিখা। সুপ্রিয়ের জ্ঞানের প্রদীপে

এতদিনে মালিনী শিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে। মালিনীর নিজের জীবনে এই প্রদীপের অভাব ছিল। ধর্ম্ম জীবনে পূর্ণতা লাভের জন্য উভয়ে উভয়কে তাই অমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। সুপ্রিয় মালিনীকে বলিয়াছে—

"পথ আছে শত লক্ষ শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।"

ভূমিকায় মালিনীর (তথা আপনার) ধর্ম্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উদ্ধৃতিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

"আমার মনের মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা তখন গৌরী শঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্ম্মল তুষার পুঞ্জের মতো নির্ম্মল নির্ব্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্ব্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্ত্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাবে যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম্ম জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে দুই একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ, মহাবাণী সকল যুগে সকল দেশে এক। এই বিষয়ে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, স্পিনোজা, একহার্ট, সক্রেতিশ, গেটে, দান্তে, বাল্মীকির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে

যেখানে জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিংবা ওই আদর্শমুখান করিয়া সমগ্র জীবনকে যেখানে রূপায়িত করিবার সচেতন চেষ্টা দেখা দিয়াছে সেখানে সেই চেষ্টার মধ্যে যেমন রূপায়ণের মধ্যেও তেমনি নানা পার্থক্য অনিবার্য্য রূপে আসিয়া পড়িয়াছে। সমগ্র সমাজ পরিকল্পনার পশ্চাতে এই সচেতন প্রয়াস যদি না থাকে তবে কয়েকটি পরিশুদ্ধ জ্ঞানময় মহাবাণী জীবনকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না।

চূড়ান্ত অধ্যাত্ম আদর্শের সহিত মানুষের নিম্নতম বোধের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে একমাত্র সমাজ অবশ্য যদি তাহা সুপরিকল্পিত হয়।

সমগ্র সমাজ ও সংস্কার পরিকল্পনার পশ্চাতে এই সচেতন প্রয়াস আছে। কোন শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবনকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। সমগ্র জীবনকে রূপায়িত ও রূপান্তরিত করিবার জন্য সচেতন প্রয়াস দরকার। এমনি করিয়া বিচিত্র সংস্কার অনুষ্ঠান আচার আচরণ গড়িয়া উঠিয়াছে; কিংবা বলা যায় ওই রূপায়ণ ও রূপান্তর সাধনের জন্য ওই সকল সংস্কার আচার ও আচরণকে ওই উদ্দেশ্য মুখীন করিয়া তাহাদের প্রতীক স্বরূপতা দানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সামাজিক বিচিত্র সংস্কার, আচার আচরণ তাই মিথ্যা বা প্রকৃত ধর্ম্মবোধের বিঘ্ন তো নয়ই পরন্তু সমগ্র সমাজ জীবনকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য উহাদের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমগ্র সমাজ ব্যষ্টি ও সমষ্টি একটি শিল্পরূপ, সেই ধ্যানরূপের আদর্শে পড়িয়া তোলা। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন গড়িয়া তুলিতে সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন। ব্যষ্টির অনুশীলন বলিতে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও অধ্যাত্ম সত্তার একের পর একের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন বুঝায়। সমষ্টির জীবনেও একথা সত্য।

তবে এই সচেতন চেষ্টার রূপ এই সমাজ-পরিকল্পনা সকল যুগে এক থাকে না। ভিন্ন যুগে ভিন্ন সমাজরূপে এই অনুশীলনের (যাহা সংস্কার, আচার আচরণ অনুষ্ঠানরূপে প্রকাশ লাভ করে) যদি

স্বাভাবিক রূপান্তর না ঘটে তবে প্রাচীন পদ্ধতি পরবর্ত্তী জীবন বিকাশে সহায়তা না করিয়া নানা বন্ধন সৃষ্টি করে। তখন স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন সাধন যদি সম্ভব না হয় তবে ওই সমস্ত সংস্কার-বন্ধন, ওই সমস্ত অনুশীলন পদ্ধতি সামাজিক ওই সমস্ত পরিকল্পনাকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিয়া নূতন সংস্কার, নূতন বিশ্বাস অনুযায়ী আচার আচরণ অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হয়। রূপায়ণ আদর্শ সকল যুগে এক। ওই আদর্শ মুথান করিয়া তুলিতে নূতন সৃষ্ট এই সমস্ত সংস্কার আশা-বিশ্বাস ও আচার আচরণকে Symbol বা প্রতীক স্বরূপতা দান করিতে হয়।

তাই দেখিতেছি, ব্যষ্টি হোক বা সমষ্টি হোক, জীবনকে রূপায়িত ও রূপান্তরিত করিতে সামাজিক সংস্কার, আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। লক্ষ্য স্থির থাকিলে ওই সমস্ত সংস্কার সেই লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তা করিতেছে কিংবা প্রতিবন্ধকতা করিতেছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। যদি সহায়তা করে তবে বুঝিতে হইবে সমাজে ওই সমস্ত সংস্কার জীবন্ত, যদি প্রতিবন্ধকতা করে তবে বুঝিতে হইবে উহারা মৃত, সমাজে উহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে।

সমাজে এক একটা সময় আসে যখন শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সকলের দৃষ্টি সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হয় নানা প্রয়োজনে। প্রথমতঃ প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের মূল্য বিচারের জন্য। দ্বিতীয়তঃ সেই মূল্য যদি লুপ্ত হইয়া যায় তবে উহার আলোকে নূতন সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা ;—আত্মিক প্রেরণার এই সৃষ্টি ক্রিয়া কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত কতকটা সচেতন।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শমূলক বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ইহা মহৎ প্রতিভা সাপেক্ষ, কিন্তু এই আদর্শের অনুকূল করিয়া সমগ্র সমাজজীবনকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টি-ক্ষম সংস্কার, আচার আচরণ গড়িয়া তোলা ততোধিক প্রতিভা ও জ্ঞান সাপেক্ষ।

বিসর্জন

রাণী গুণবতী বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারিণী, স্বামীর হৃদয়েশ্বরী সে, কিন্তু সন্তানহীনা বলিয়া এই সমস্ত কিছু তাহার নিকট মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তাহার সকল শান্তি, সকল সুখ হরণ করিয়া লইয়াছে। নারীর নিকট মাতৃত্বের মূল্য, সন্তান স্নেহের মূল্য আর সকল মূল্যকে ছাড়াইয়া যায়। তরুতল বাসিনী ভিখারিণীও মাতৃত্ব গৌরবে তাহার ঈর্ষার পাত্র। রাণীর অন্তরে সন্তান স্নেহ লাভের জন্য কী গভীর অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষার কী তীব্র ব্যাকুলতা। বিশ্বজননী বিশ্বের অনন্ত কোটি জীব-ধাত্রীর নিকট তাই সে সন্তান কামনা করিয়াছে।

"আমি হেথা
সোণার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে, বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব।"

মানবিক প্রেমের দুটি দিক আছে। একটি কেবল আপনার মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করে। সে প্রেম বিশ্ব হইতে নর-নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর একাকীত্বের মাঝখানে টানিয়া আনে। ইহার জন্য বিশ্বের যে-কোন সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বকে যে-কোন প্রেমকে লাঞ্ছিত করিতে মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। ইহা মনুষ্য স্বভাবকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র করিয়া তাহার মধ্যে কী ঘোরতর বিকৃতি, কী দারুণ মোহ, কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার প্রকাশই না ঘটাইতে পারে। মনুষ্য স্বভাবের ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত গতি। ইহাতে মনুষ্য আত্মার উপর আবরণের পর আবরণ টানা হইয়া যায়। তাহার উপর একের পর এক অদৃশ্য বন্ধন পড়ে, মানুষ অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকার-লোকে নামিয়া যায়।

প্রেমের আর একটি দিক আছে, যে ক্ষেত্রে মনুষ্য চেতনা বিশ্বের সহিত গভীর হইতে গভীরতর ভাবে যুক্ত হইতে থাকে, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। সে প্রেম বিশ্বের আর সকল প্রেমের সহিত যুক্ত হইয়া সকল প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া আপনার প্রেম, আপনার প্রাণকেই ক্রমাগত গভীর করিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে। ইহা পূর্ণতার, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পথ বলিয়া মানুষ বিশ্বের সহিত যতই যুক্ত হইতে থাকে ততই তাহার অন্তরে মহাভাবের বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ঘটে। সকল প্রাণের মধ্যে এক প্রাণ, সকল প্রেমের মধ্যে এক প্রেম অনুভব করে বলিয়া মানুষ তখন সামান্যতম প্রাণের জন্যও আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ইতস্ততঃ করে না। সকল অস্তিত্বের মূলে যে অস্তিত্ব, যে অস্তিত্বের যোগে সকলের অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বের সন্ধান পায় বলিয়া মানুষ আত্ম-বিসর্জ্জনে ভয় পায় না। কারণ ভয় জাগে শূন্যতা বোধ হইতে। এখানে মহা অস্তিত্বের যোগে মহৎ ভয় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

গুণবতীর প্রেম কেবল আপনার মধ্যে আপনি চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে। বিশ্বের সকল প্রেম ও প্রাণের মূল্য সম্পর্কে সে অন্ধ। সন্তান লাভের আশায় তাই সে জীব জননীর নিকট জীব-বলির মানত করিয়াছে। হৃদয় বোধের কী আশ্চর্য্য বিকার!

"— মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক-শো মহিষ,
তিন শত ছাগ।"

নর-নারীর সেই এক প্রেম কখন নিম্নাভিমুখী হইয়া তাহার মধ্যে নানা বিকৃতি, নানা কদর্য্যতা, তুচ্ছতা, দীনতা হীনতার প্রকাশ ঘটাইতেছে। আবার সেই এক প্রেম ঊর্দ্ধাভিমুখী, আত্মাভিমুখী ও বিশ্বতোমুখী হইয়া করুণা, মৈত্রী, তিতিক্ষা, ক্ষমা, ইত্যাদি দেবভাবের প্রকাশ ঘটাইতেছে, তাহাকে পরিণামে ঈশ্বর স্বারূপ্য দান করিতেছে।

গুণবতীর মাতৃ প্রেম পিপাসাই এক্ষেত্রে অমন নিম্নপথ অনুসরণ করিয়াছে। গুণবতী যতই নিম্নাভিমুখী হইতেছে, লক্ষ্য করিতে পারা

যাইবে তাহার মধ্যে ততই নানা গোপন, পাপ অভিসন্ধির নানা হীনতার প্রকাশ ঘটিতেছে, গৃহ ও সমাজের সহিত সমগ্র রাজ্যও বিশ্বের সহিত তাহার বিচিত্র স্নেহ-সম্পর্ক একের পর এক ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই বিকৃত প্রেমই তাহাকে হৃদয়হীনতার কোন নিম্নতম লোক পর্য্যন্ত না টানিয়া আনিয়াছে!

রাজসৈন্য তাহার বলির নৈবেদ্য ফিরাইয়া দিলে গুণবতী রাজার নিকট অভিযোগ করিয়াছে, রাজাদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইতে কাতর অনুরোধ করিয়াছে। কোন ফল না হইতে গুণবতীর হৃদয় প্রেম বিমুখ হইয়াছে। ওই এক প্রেমই তাহার আর এক প্রেমের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ক্ষুদ্র প্রেম বৃহৎ প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছে।

প্রেমে স্বামী ও স্ত্রী একাত্ম হইয়া যায়। প্রেম তাই নর-নারীর যুগল সাধনা। সন্তান সেই প্রেম-বৃক্ষের পরিণত ফল। গুণবতী সেই ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় সেই বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। গুণবতী জানে না যে-বোধ নর-নারীর পবিত্র প্রেমে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা ধর্ম্ম বোধ নহে। প্রেম নারীকে শ্রেষ্ঠ সাধন ফল দান করিতে পারে। নারীর প্রেম বঞ্চিত কোন ধর্ম্ম সাধনা নাই। গুণবতী ইতিমধ্যেই তাহার স্বামী প্রেম হইতে অনেকদূরে সরিয়া আসিয়াছে।

"শুনিয়াছি, আপনার পাপ পুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমার দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।"

গুণবতী স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায় রঘুপতিকে তাহার পুরোহিতের মর্য্যাদা প্রত্যর্পণ করিয়াছে। গুণবতী রঘুপতিকে আশ্বস্ত করিয়াছে এই আশা লইয়া যে রাজা তাহার কাতর সপ্রেম অনুনয় কিছুতেই উপেক্ষা করিবে না। রাজার সাময়িক বিমুখ চিত্তকে সে অনুনয়ে প্রসন্ন করিবেই।

এই আশা বক্ষে লইয়া গুণবতী পুনরায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, কিন্তু অনুনয়ে এবারও কোন ফল হইল না। গুণবতী ভাবিয়াছে পুত্রহীনার পতির নিকট সকল অভিমান এমনি ব্যর্থ হইয়া যায়। গুণবতী আপনার দিক হইতে রাজাকে বিচার করিয়াছে। কিন্তু এ কথা নয়, ওই প্রেমই যে গুণবতীকে সকল হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ধতম বোধের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াও তাহার ওই প্রেম বারংবার বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ একটি অধ্যাত্ম বিশ্বাস ছিল যে মানুষ যতই স্খলিত হোক-না-কেন, কোন অবস্থায় মানবিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। তাহার অন্ধতম ক্রিয়া-কলাপের পশ্চাতেও ওই বিকৃত প্রেমের গোপন প্রয়াস আবিষ্কার করিতে পারা যায়।

গুণবতীর কাতর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইতে গুণবতী রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আপনার ইচ্ছাকে জয়ী করিতে চাহিয়াছে। ইহার জন্য সে এমনকি রঘুপতির সহিত ষড়যন্ত্র কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে।

রাণী ধর্ম্মের কথা, অধিকার ভেদ প্রভৃতি কথা যতই বলুক-না-কেন তাহা আসিয়াছে তাহার সন্তান কামনা তাহার প্রেম ব্যাকুলতার সহিত বিজড়িত হইয়া। রাণী চিরাচরিত সংস্কার ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশ্বাস করে যে দেবীর নিকট জীব-বলির মানত করিলে এবং সেই মত পূজা সম্পূর্ণ করিলে সে দেবীর প্রসাদে সন্তান লাভ করিতে পারিবে। আর তাহার সন্তান নাই বলিয়াই তো রাজার নিকট তাহার সকল প্রেম উপেক্ষিত। এইরূপে সন্তান স্নেহ ও রাজার প্রেম লাভের জন্যই গুণবতী রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তুত হইয়াছে। এমনি করিয়াই তো ক্ষুদ্র প্রেম বৃহৎ প্রেমকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহৎ স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে। গুণবতীর ক্ষুদ্র প্রেম গুণবতীর বৃহৎ প্রেমকে লাঞ্ছিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

রঘুপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিলে কি হইবে গুণবতীর অন্তরে এখনও আশা আছে যে অভিমান করিয়া থাকিলে রাজা তাহার

প্রেম লাভের জন্য দীর্ঘ দিন তাহার সঙ্কল্পে অটল থাকিতে পারিবে না।

'আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছুদিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়।"

রাজার অন্তরে গুণবতীর প্রতি প্রেম সত্য। কোন কারণেই গুণবতীর প্রতি তাহার প্রেম বিচলিত হয় নাই। রাজা ইহার চেয়েও বড় প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই রাণীর প্রেম ক্ষুণ্ণ হইবে এই আশঙ্কায় তিনি বৃহৎ প্রেমকে লাঞ্ছিত করিতে চান নাই। রাণীর প্রেমের মূল্য, হৃদয়বোধের মূল্য তিনি স্বীকার করেন কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ব-প্রেমের মূল্যও স্বীকার করেন। এই বিশ্ব-প্রেমকে তিনি অপরোক্ষ করিয়াছেন বলিয়া উভয় প্রেম তাঁহার জীবনে কোন সঙ্ঘাত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রাণীর প্রতি তাঁহার প্রেম সত্য, কিন্তু মোহমুক্ত বলিয়া সে প্রেম মহত্তর প্রেমে এতটুকু ছায়াপাত করিতে পারে নাই। আদর্শনিষ্ঠ পুরুষের হৃদয়ের সামর্থ্যের গভীরতা অন্ততঃ গুণবতীর মত নারী করিতে পারে না।

গুণবতী তাহার নারী স্বভাবের অনুকূল করিয়া ভাবিয়াছে যে সন্তানহীনা বলিয়া তাহার প্রতি রাজার সে পূর্ব্বের অনুরাগ নাই, থাকিলে তাহার এই লাঞ্ছনা ঘটিত না, তাহার এমন অনুরোধ উপেক্ষিত হইত না।

এই ভাবনা-মুহূর্ত্তে ধ্রুবকে দেখিয়া রাণীর এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হইয়াছে। এই শিশুকে ভালোবাসিয়াই তো রাজার আপন সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই, নহিলে রাণীর পূজায় রাজা এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিত না।

ধ্রুবের প্রতি তাহার এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবের পশ্চাতে তাহার অন্তরের প্রেমটাই যে বিকৃতরূপে ক্রিয়া করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত পরেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। একদিকে নিরপরাধ অসহায় এক

শিশুর প্রতি তাহার এই বিদ্বেষ, অন্যদিকে আপন অন্তরের নিগূঢ় বাসনা—একযোগে উভয়েরই প্রকাশ ঘটিয়াছে।

"খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান—দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।"

এই সন্তান আকাঙ্ক্ষায় গুণবতী বিশ্বের আর সব প্রেমের প্রতি বিমুখ হইয়া একান্ত কুলিশ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রেমই আত্ম-মুখীন হইয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর লোকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে এমন একটা লোকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, যেখানে মানুষের সাধারণ মানবিক বোধ স্বাভাবিক চিন্তা শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়।

গুণবতী নক্ষত্ররায়ের সহিত ধ্রুবকে মন্দিরে বলি দিবার গোপন ষড়যন্ত্র করিয়াছে। গুণবতী নক্ষত্ররায়কে বলিয়াছে—

"অর্দ্ধ রাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন।"

অথচ আশ্চর্য্য গুণবতী সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যায় নাই। ফিরিয়া ফিরিয়া নক্ষত্ররায়কে বলিয়াছে—"মনে রেখো, মোর নামে করো নিবেদন"।

নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়, অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যও নয় গুণবতী নিষ্পাপ, সরল এক শিশুকে বলি দিয়া দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে চায়। তাহা হইলে দেবীর প্রসাদে সে সন্তানবতী হইবে। এক প্রেমাকাঙ্ক্ষাই আজ তাহার হৃদয় হইতে সকল প্রেম সকল হৃদয় বোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। মানুষ হত্যার, শিশু হত্যার চেয়ে বড় পাপ জগতে কিছু নাই, গুণবতী নারী হইয়া সন্তান লাভের জন্য মাতৃ হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা লইয়াই সেই পাপ অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহার প্রেম লাভের

জন্য এই সমস্ত কিছু, সেই রাজার মুখ দর্শনে তাহার পাপ বোধ হয়! জীবনের এই এক আশ্চর্য্য রহস্য।

গুণবতী রঘুপতির নিকট প্রতিজ্ঞা পালনের কথা বলিয়াছে। এই প্রতিজ্ঞা পালনের পশ্চাতে তাহার সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা যে ছিল, তাহা যে নিছক প্রতিজ্ঞা মাত্র নয় তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অর্থাৎ সন্তান লাভের আশায় গুণবতী আজ বিশ্বপরিহার করিয়াছে—রাজ্য, পতি, প্রেম, হৃদয়ের সমস্ত বোধ, সব, সবকিছু। ইহাই তো চূড়ান্ত অনস্তিত্বের লোক। ইহা মৃত্যু-লোক নয়, কারণ মৃত্যু তো অনস্তিত্বের প্রতীক নয়। মৃত্যু অস্তিত্বেরই এক প্রকাশ বিশ্ব-প্রেমেরই একটি পর্য্যায়। তাহা অন্ধকার নয়, আর এক ধরণের আলোক। তাহা সমাপ্তি নয়, আর এক সূচনা। গুণবতীর জগৎ প্রকৃত চিরান্ধকারের। গুণবতী রঘুপতিকে বলিয়াছে—

> "আনিয়াছি মার পূজা
> রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
> প্রতিজ্ঞা আমার।"

রঘুপতির উক্তিতে গুণবতীর ভাব-লোকটা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ধর্ম্মের এই সংস্কার তাহার জীবনে সত্য হইলে গুণবতীর জীবনে এই পরিণাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। ধর্ম্ম-সংস্কার তাহার জীবনে যদি সত্য না হয় তবে ইতিপূর্ব্বে অমন নিষ্ঠুরতম ক্রিয়া-কলাপ সম্ভব হইল কেমন করিয়া, কারণ তাহার বিকৃত প্রেমটাই তো ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া অমন অধোগামী হইয়াছে?

গুণবতীর ভাব-জীবনটা কেন যে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল না তাহার কারণ আছে। গুণবতীর অধঃপতন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, গুণবতীর কামনা কোন্ হীনতম পথ অনুসরণ করিয়া চরিতার্থ হইতে চাহিয়াছে তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু এই সমস্ত প্রয়াস তাহার ভাবাবেগ আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয় বলিয়া ইহার ভিতর দিয়া

তাহার চরিত্র গড়িয়া উঠে নাই, তাহার মধ্যে কোন অপরাধ প্রবণ প্রবৃত্তি গড়িয়া উঠে নাই।

যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর স্বভাবে ভাবাবেগ অত্যন্ত বেশি তাহারা কল্পনায় বা কার্য্যতঃ এমন অনেক কাজ করিতে পারে যাহা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু পাপ-চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর নারী ও পুরুষ নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববোধের ভয়াবহতায় তাহারা হয় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে নতুবা শক্তিমান হইলে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনবোধে ফিরিয়া আসে।

গুণবতীর জীবনে প্রেমটাই একমাত্র এবং প্রবলতম সত্যবোধ। মাঝের ওই পর্য্যায় একটা দুঃস্বপ্নের মত তাহার ওই প্রেমকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল মাত্র। ভাবাবেগ স্ফীত হইয়া যতই সে ওই প্রেমের বিরোধিতা করুক না কেন ইতিমধ্যেই তাহা যে একান্ত ভার স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহার ওই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া সে যেন কেবল আপনার ছায়ার বিভীষিকা দেখিতেছিল, রঘুপতি যেন তাহার মুখ আলোকের দিকে ফিরাইয়া দিল। ওখানে ব্যক্তির ছায়ার কোন বিভীষিকা নাই, অন্ধকারের কোন ভয় নাই।

গুণবতী তাই অত সহজে অমন সম্পূর্ণ অনায়াসে তাহার পূর্ব্বের প্রেম ফিরিয়া লাভ করিয়াছে। গুণবতী পরিশেষে রাজার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া আপনাকে প্রেমে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছে।

"আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।"

যাহারা ধর্ম্মের নামে নানা ভাবে ধর্ম্মহানি করিতেছে, রঘুপতি তাহারই একটি প্রতীক চরিত্র। রঘুপতির চরিত্র আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে বিশিষ্ট উপলব্ধিটিকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, রঘুপতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে তাহার সামগ্রিক

পরিচয় লাভ প্রয়োজন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে তাহারই দুই একটি দিক উল্লেখ করিলেই চলিবে।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণে যখনই কোন প্রতিবাদ উঠিয়াছে তখন সর্ব্বাগ্রে যে যুক্তিটি উপস্থাপিত করা হয় তাহা হইল অধিকার ভেদ লইয়া। অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্পর্কে কথা বলিতে পারে কেবল একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় যাহারা অন্ততঃ বিগ্রহাশ্রয়ী উপাসনায় বিগ্রহ ও জনসাধারণের, দেবতা ও মানবের মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়া বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ইহার মূল বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটুকু হইলে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই পূজা ও তাহার সহস্র বিধি ও বিধান সম্পর্কে একমাত্র তাঁহারাই মতামত প্রকাশ করিতে পারেন।

কিন্তু ওই সমগ্র সম্প্রদায়টাই যদি প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া যায়, তবে তাহাদের অধর্ম্মাচরণে প্রতিবাদ করিবে কাহারা। ওই প্রতিবাদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যতদিন সংস্কার সম্ভব হয় ততদিন ওই আদর্শটা যেমন তেমনি ওই আদর্শের সহিত বিজড়িত হইয়া সমগ্র সম্প্রদায়টা বাঁচিয়া থাকে। যখন তাহা সম্ভব হয় না তখন সমগ্র সম্প্রদায়টা অচল হইয়া যায়। তাহার পর একটা সময় আসে যখন সম্পূর্ণ সম্প্রদায়টাই তাহার অধর্ম্মাচরণের ভারে নিঃশেষে তলাইয়া গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বিশ্বের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ধর্ম্মাচরণে, ধর্ম্মের আচার আচরণ ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে অধিকার ভেদের কথা তোলা হয়, তাহার মধ্যে সত্যতা যে কিছু নাই তাহা নহে কিন্তু উহাকে আশ্রয় করিয়া কত যে মিথ্যাচার বাসা বাঁধিয়া যথেচ্ছাচার করিবার সুযোগ লাভ করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; এবং এই সমূহ অন্যায় ও মিথ্যাকে সামগ্রিক ভবে বিচার করিয়া দেখিলে প্রকৃত সংশয় জাগে এই অধিকার ভেদ অন্যায় ও যথেচ্ছাচারের একটা অন্তরাল বা ছদ্মবেশ মাত্র কিনা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবশ্য কোন সংশয় ছিল না।

তাঁহার মতে সত্যের বোধ সার্ব্বভৌমিক। পরিশুদ্ধ হৃদয় মাত্রেই তাহার প্রকাশ ঘটে। তাহা কোন বিশিষ্ট বিগ্রহ এবং উহার বিশিষ্ট কোন পূজা-বিধি বা বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায় আশ্রয় করিয়া যে ঘটিতেই হইবে তাহার কোন অত্যাবশ্যকতা নাই, পরন্তু উহাকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিবার পশ্চাতে সমূহ বিপদ আছে। তাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লইয়া বিচারের অধিকার, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার, প্রয়োজন হইলে সকল শক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিবার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই আছে।

জীবনে যে-বিশ্বাস যে-তন্ত্র আশ্রয় করা হোক-না-কেন, তাহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বোধের সহিত যতদূর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে তাহা ততদুর সত্য, এবং তাহা ওই বিশ্ব-ধর্ম্মকে যতদূর ক্ষুণ্ণ করে ততদূর অধর্ম্ম ও মিথ্যা।

সকল মত, বিশ্বাস, আদর্শ সমস্ত কিছু বিশ্ব-ধর্ম্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নিম্নতর সকল বোধের বন্ধন একের পর এক ছিন্ন করিয়া ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে। এই উন্নততর পরিণাম দানে সহায়তা করিতে সেই সঙ্গে নিম্নতর বোধের বন্ধন তাহা সমাজ রাষ্ট্র যাহাকেই আশ্রয় করুক-না-কেন, ছিন্ন করিতে মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে।

রাজ্যে জীব-বলি নিষিদ্ধ করিয়া দিতে রঘুপতি রাজাকে প্রথম অধিকার ভেদের কথা বলিয়াছে। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে বিধান আছে সে সম্পর্কে সমালোচনা তাহার ন্যায়-অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা একমাত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণরাই বলিতে পারে। কারণ এ কর্ত্তব্য ভার একমাত্র তাহাদেরই উপর ন্যস্ত। রাজার কর্ত্তব্য ও অধিকার এবং ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। সে ক্ষেত্রে একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। রঘুপতি তাই রাজাকে বলিয়াছে, "শাস্ত্র বিধি তোমার অধীন নহে।"

এই অধিকার ভেদের সংস্কার সমগ্র সমাজের মর্ম্মমূলে রহিয়াছে। রাজসভাসদ সকলে তাই রঘুপতির এই যুক্তি মানিয়া লইয়াছে।

রাণী গুণবতীও এই অধিকার ভেদের কথা তুলিয়া রাজার সহিত তর্ক করিয়াছে, অনুনয় বিনয় করিয়াছে। রাজা বাহিরে কাহারও সহিত ইহা লইয়া তর্ক করেন নাই, ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে চান নাই। কারণ তিনি জানিতেন এই অন্ধ সংস্কার সমগ্র সমাজের বুকে যে পাষাণভার চাপাইয়া দিয়াছে তাহাকে কেবল যুক্তি বিচার দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিতে পারা যায় না, তাহাতে সমস্যা আরও জটিল এবং কর্ত্তব্য আরও দুরূহ হইয়া উঠে। জাতির জীবনে এমন এক একটি পরীক্ষা-মুহূর্ত্ত আসে যখন বিলম্বের অবসর থাকে না, তখন বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, যুক্তি বিচার সমস্ত কিছু পরিহার করিয়া অন্যায়কে নির্ম্মম ভাবে দলিত করিতে হয়। কারণ এইরূপ না করিলে ওই ক্ষত সমস্ত সমাজ-দেহে দ্রুত বিষ সঞ্চার করিয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটাইতে পারে। রাজাকে তাই এমন একটি পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

এই অধিকার ভেদের কথাটা যে কত বড় অযৌক্তিক রাজা তাহা জানিতেন। তিনি গুণবতীকে সে কথাও বলিয়াছেন—

> "দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
> রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।"

রাজার স্থির সঙ্কল্প জানিয়া রঘুপতি ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছে। রাজার প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করিয়া রঘুপতি রাজাকে বলিয়াছে—

> "তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
> ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
> তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
> বলি? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
> মায়ের সেবক।"

ঈশ্বরীয় ইচ্ছা যদি অমোঘ হয়, বিশ্বের যে-কোন প্রতিকূল শক্তি যদি সে ইচ্ছার সম্মুখে স্রোতের মুখে তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া যায়

তবে রঘুপতির আশঙ্কা কেন ? রাজার সকল দম্ভ সকল অনাচার তাঁরই ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। রঘুপতির জীবনে এই জাতীয় কোন ধর্ম্ম বা বিশ্বাসবোধ ছিল না। বিশ্বমাতার বলির আকাঙ্ক্ষা রঘুপতিই মিটাইবে! রঘুপতির এই উক্তি কোন ধর্ম্মবোধ প্রসূত নয়। বস্তুতঃ যে প্রতিষ্ঠানটিকে সে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য ন্যায় অন্যায় বিচারের কোন প্রয়োজনীয়তা সে কোনদিন বোধ করে নাই। ইহাকে আশ্রয় করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করিবার যে ক্ষমতা যে-অপ্রতিহত ইচ্ছা, যে-শাসন চালাইবার ক্ষমতা সে লাভ করিয়াছে, ওই প্রতিষ্ঠান কোন কারণে ভাঙ্গিয়া পড়িলে সেই অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। রাজার নিষেধ তাহার ধর্ম্মবোধে কোন আঘাতই করে নাই, আঘাত করিয়াছে তাঁহার ক্ষমতায়। রঘুপতি তাই পদাহত ভুজঙ্গের মত ক্রোধ জর্জ্জর হইয়াছে।

ক্ষমতা রক্ষার প্রশ্ন যেখানে সেখানে আপনায় দায় আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে বহন করিতে হয়, অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিলে চলে না। দেবীর ইচ্ছার কথা রঘুপতি যতই দম্ভের সহিত প্রকাশ করুক, তাহার উপর রঘুপতির লেশমাত্র নির্ভরতা ছিল না।

রঘুপতি ক্ষোভে দুঃখে অপমানে জয়সিংহের সম্মুখে ফাটিয়া পড়িয়াছে।

"ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্ম তেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী 'পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকর
সভাসদ্ সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু, দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?

দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষ যজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবি কাষ্ঠ হবে।"

ইহার মধ্যে ধর্ম্ম বিনাশের আশঙ্কার কথা যতই প্রকাশ পাক-না-কেন, ব্রাহ্মণের ক্ষমতাধিকার হানির আশঙ্কা সমস্ত আশঙ্কাকে ছাড়াইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সত্য রক্ষার প্রয়োজন দেবতা বা ঈশ্বরের যদি না থাকে তবে ব্রাহ্মণের আছে! তাহা হইলে অ-দৃষ্ট স্বর্গ-লোক হইতে দেবতাদের বিতাড়িত করিয়া দৈত্যরা স্বর্গ সুখ কতখানি ভোগ করিতে পারিবে তাহা বলিতে পারা যায় না তবে মানুষ যে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই। স্বর্গরাজ্য রক্ষার দায় দেবতাদের থাকুক বা না-থাকুক তাহা লইয়া ব্রাহ্মণের কিছু যায় আসে না, মর্ত্ত্যের বিশিষ্ট অধিকার হইতে আপনাদের রক্ষা না করিতে পারিলে ব্রাহ্মণের গৌরব হানি হইবে। দেবতা ও ঈশ্বরের সহায়তা যদি নাও পাওয়া যায় তাহাতে ব্রাহ্মণের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। কোনরূপ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য বিচারে তাহা বাহুল্য মাত্র। রঘুপতির যুক্তি এবং যে মন হইতে এই জাতীয় যুক্তির উদ্ভব হয় সেই মনটিকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

ধর্ম্মবোধ বলিতে যাহা বুঝায় বস্তুতঃ রঘুপতির তাহা লেশমাত্র ছিল না। ধর্ম্মকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় যদি আদৌ তাহা সম্ভব হয়। একটি মানবিক বোধের জগৎ অর্থাৎ যাহাকে হৃদয় মন ও মনীষার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই মানবিক বোধকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে বোধের দ্বারা তাহা নৈতিক বোধ।

ধর্ম্মের আর একটি দিক আছে যাহাকে বলা যায় অতি মানবিক বোধের জগৎ। অর্থাৎ যে জগতের উপলব্ধি লাভ করিতে মানুষকে মানবিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বলিতে

তথাকথিত মানবিক ও অতিমানবিক উভয় বোধই বুঝায়, কারণ উভয় চেতনাই এক মনুষ্যত্বের অন্তর্গত।

যে নৈতিক বোধ দ্বারা মানবিক বোধের সমগ্র দিক নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় তাহা আসে এই অতি মানবিক প্রেরণা হইতে। তাহাই উন্নততর নৈতিক প্রেরণা যাহা সমগ্র জীবনকে সুসংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অতিমানবিক চেতনামুখীন করিয়া তুলে। ধর্ম্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও এমন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসীমের প্রতি মানুষের যে মনোভাব তাহাকেই বলে ধর্ম্ম।

নিম্নতর নৈতিক বোধের মার্জ্জনার জন্য উন্নততর বোধের জগতের উপলব্ধি প্রয়োজন। একটা বিশেষ পরিবেশে যাহা নৈতিক বোধ ছিল তাহা ভিন্ন যুগে ভিন্ন পরিবেশে আর নৈতিক বোধ বলিয়া অনুভূত হয় না, তাহার কারণ ওই বোধ আশ্রয় করিয়া আর উন্নততর বোধের জগৎটিকে লাভ করিতে পারা যায় না। কারণ উন্নততর বোধ যে পরিবেশে নিম্নতর বোধের জগতে লীলায়িত হয়, সেই জগতের অনুকূল রূপে তাহার যে বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে, (ইহাই সমসাময়িক নৈতিক চেতনা) ভিন্ন যুগে ভিন্ন পরিবেশে তাহার সে প্রকাশ ঘটিতে পারে না।

এই যে উর্দ্ধতর ও নিম্নতর চেতন জগতের যোগ রহস্য তাহার কোন অনুভূতি রঘুপতির জীবনে নাই। নীতি ও ধর্ম্মবোধের লেশমাত্র তাহার জীবনে ছিল না বলিয়া ধর্ম্ম বোধের নামে উর্দ্ধতর বোধের সকল জগৎকে সে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। রঘুপতির একমাত্র অভিপ্রায় আপন ক্ষমতায় আসীন থাকা, ইহার জন্য যে-কোন পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত হইতে তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। ক্ষমতা লোলুপতায় রঘুপতি মানবিক বোধ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে। আপন ক্ষমতায় আসীন থাকিবার জন্য রাজার বিরুদ্ধে যত প্রকার ষড়যন্ত্র করা যাইতে পারে রঘুপতি তত প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।

রঘুপতি রাণীর স্নেহ দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া অভিশাপের ভয় প্রদর্শন করিয়া রাজার ও রাজ্যের সমূহ অকল্যাণের ভয় প্রদর্শন

করিয়া রাণীর নিকট হইতে পূজার অধিকার, ব্রাহ্মণের অধিকার যাঞ্চা করিয়া লইয়াছে। পতিপরায়ণা নারী স্বামীর অকল্যাণ আশঙ্কায়, রাজ্যের অকল্যাণ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণকে পূজার অধিকার ফিরাইয়া দিয়াছে। গুণবতী সামান্যা নারী মাত্র ব্রাহ্মণের ভীতি প্রদর্শণে তাই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রঘুপতি আর কিছু জানুক বা না-জানুক সাধারণ মনুষ্য চরিত্র ভালো করিয়াই বুঝে। কাহার নিকট কোন পন্থা অনুসরণ করিলে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে তাহা সে জানে এবং তাহার নিপুণ প্রয়োগ কৌশলও তাহার অজ্ঞাত নয়।

"যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দন্ত-মঞ্চ খানি জলবিম্ব সম।
যুগে যুগে রাজ পিতা পিতামহ মিলে
ঊর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে রাজ-মহিমা
অভ্রভেদী ক'রে, মুহূর্ত্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝা হত।"

রঘুপতি রাণীর হৃদয়কে কলুষিত করিয়া তাহাকে রাজার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। নারীর যে একমাত্র আশ্রয় সেই প্রেম, পতি-প্রেমই, নারীর একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয় হইতে রঘুপতি গুণবতীকে স্খলিত করিয়া দিয়াছে।

রঘুপতি ইহার পর সেনাপতি নয়নরায়কে তাহার সৈন্যদল লইয়া রাজপুরী আক্রমন করিতে পরিশেষে গোবিন্দমাণিক্যকে বন্দী করিয়া হত্যা করিতে পরামর্শ দিয়াছে। রাজার আদেশে নয়ন-রায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাসেও আঘাত লাগিয়াছে, তাহার জন্য রাজার সঙ্গ, তাহার কর্ত্তব্য ভার, তাহার রাজ্য পর্য্যন্ত সে ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু রাজার প্রতি সে বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারে না। নয়নরায়ের এই বিশ্বাসটাই পরিণামে নয়নরায়কে মুক্তি দিয়াছে। জীবনের যে-কোন একটি মহৎ বোধ আশ্রয় করিয়া খাঁটি অধ্যাত্ম

অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। জীবনের আর সকল প্রেরণা ওই এক প্রেরণামুখীন হইয়া সমস্ত জীবনকে আশ্চর্য্য সুষমা দান করে।

রানী গুণবতী রাজার, স্বামীর প্রেমের বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে নাই। রানী গুণবতী নয়নরায়ের মত বলিতে পারে নাই যে 'আমি যুক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে চাহি না। আমি স্ত্রী, স্বামীর প্রতি সকল অবস্থায় আমার প্রেম ধ্রুব তারকার মত অচল থাকিবে।" এই অবিচলিত প্রেমই তাহাকে মুক্তির আস্বাদ দান করিতে পারিত। ধর্ম্মবোধের কথা নয়নরায়ও বলিয়াছে, ব্যক্তিগত হৃদয় বোধের কথাও বলিয়াছে এবং ইহার জন্য রাজার সহিত অসহযোগ করিয়াছে কিন্তু বিশ্বাস ঘাতকতা করে নাই।

গুণবতী রাজার বিশ্বাসের মাঝখানে তাহার অন্তঃপুরে তাহার বক্ষের মধ্যে থাকিয়াই রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। নয়নরায়কে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে না পারিয়া রঘুপতি প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া রাজার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাহাদের অস্ত্র দিয়া সহায়তা করিতে চাহিয়াছে।

ক্ষমতায় আসীন থাকিবার জন্য একজন ক্ষমতা লোলুপ যত প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারে রঘুপতি তাহাই করিয়াছে। রঘুপতি যাহা ধর্ম্মের আড়াল দিয়া করিয়াছে অন্যক্ষেত্রে তাহা অন্য আড়ালের পশ্চাতে থাকিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অপার্থিব কোন কিছু লাভের জন্য নয়, পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ অন্য সকল ক্ষেত্রে যতদূর নীচতার পরিচয় দিতে পারে ধর্ম্মের নামে রঘুপতি ততদূর নীচতার পরিচয় দিয়াছে। মানুষ ধর্ম্মের নামে যেখানে সহস্র অধর্ম্মাচরণ করিতে ইতস্ততঃ করেনা সেখানে বুঝিতে হইবে প্রয়োজনটা ধর্ম্মের নয়, প্রয়োজন কেবল আপনার। রঘুপতি তাই জয়সিংহকে বলিয়াছে—

—"সে-কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়।"

ধর্ম্ম রক্ষার প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণে পড়িতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন ছিলেন পশ্চিমের কোন এক স্থানে। সেখানে তিনি একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু সেখানকার ইংরাজ কার্য্যাধ্যক্ষ বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই সম্মতি দান না করিতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। তাঁহার সমগ্র ভাব-জীবনটাই ইহাতে একপ্রকার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। পরাধীনতার অসম্মান এমন করিয়া তিনি জীবনে আর কখনও বোধ করেন নাই। অশান্ত মনকে শান্ত করিবার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনে গিয়া গভীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। ইহার ভিতর দিয়া যে সত্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীর নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "মা আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে রক্ষা করিব না তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।"

ঈশ্বরীয় ইচ্ছার নিকট এই যে নিঃশেষ আত্ম বিসর্জ্জন, একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাকে এইরূপে যে জীবনে সত্য করিয়া তোলা, ধার্ম্মিকদের ইহাই একমাত্র ধর্ম্মযুদ্ধের স্বরূপ, অন্যায় কারীর সঙ্গে অন্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ধর্ম্ম সংগ্রাম নহে।

রঘুপতির সংগ্রাম যে প্রকৃত ধর্ম্ম সংগ্রাম নয় তাহা উল্লেখ বাহুল্য। অধ্যাত্ম ও নীতিবোধের লেশমাত্র রঘুপতির জীবনে ছিল না।

নয়নরায়ের সহিত রঘুপতির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, প্রজাদের ধর্ম্মের নামে রাজদ্রোহী করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। রানীর পূজা রাজা ও রাজ সৈন্য দল সম্পূর্ণ করিতে দেয় নাই। এইরূপে সকল দিক হইতে ব্যর্থ হইতে রঘুপতি ক্রোধে আক্রোশে ফাটিয়া পড়িয়াছে। রাজা তাঁহার নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে রঘুপতি বলিয়াছে—

"আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজ-হস্ত হতে,
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে"।

এমন একটা বোধের জগৎ আছে সত্য, যাহাকে মানুষ পার্থিব সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও লাভ করিতে পারে না। ইহাই মানুষের অন্তরের ধর্ম্মরাজ্য। এই ধর্ম্মরাজ্যে মানুষকে প্রবেশ করিতে হয় পার্থিব সকল ঐশ্বর্য্য, সকল অহঙ্কার মুক্ত হইয়া কেবল ভক্তি মাত্র সম্বল করিয়া। রঘুপতি কি সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের কথা রাজাকে বলিয়াছে। রঘুপতির ইহা মিথ্যা আস্ফালন মাত্র, তাহা বলের বিরুদ্ধে আর এক বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ তাহার শক্তির নিকট রাজশক্তিও নিষ্প্রভ। তাহা এক পশুশক্তির বিরুদ্ধে আর এক পশুশক্তি প্রয়োগ করিবার মিথ্যা আস্ফালন। রঘুপতি রাজাকে বলিয়াছে—

"অবিশ্বাসী সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র সব
ব্রহ্মগর্ব্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।"

রঘুপতি 'ব্রহ্মতেজ' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা বলিয়াছে এবং সে ক্ষমতা এবং অভিপ্রায় যদি সত্য হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে রাজার এই মানবিক বা পশুশক্তি কোথায় ভাসিয়া যাইবে। আর সেই ঈশ্বরিক ক্ষমতা যদি সত্য না হয়, যদি পশুশক্তিই জয় লাভ করে তবে সকল শাস্ত্র, ঐশ্বরীয় ক্ষমতা, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী তো মিথ্যা হইয়া যায়।

রঘুপতি দিব্য অভিপ্রায়, ঐশ্বরিক ক্ষমতা ইত্যাদির কথা যতই সদম্ভে সরোষে প্রচার করুক-না-কেন, বস্তুতঃ ইহার কোন

উপলব্ধি তাহার জীবনে নাই। সেই জন্য ঈশ্বরীয় ইচ্ছা জীবনে অমোঘ শাসন রূপে কেমন করিয়া লীলায়িত হয় তাহার সকল স্বরূপ তাহার নিকট অজ্ঞাত। আপনার ক্ষমতা লোলুপতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিকে ঈশ্বরীয় বোধের সহিত একাত্ম করিয়া তুলিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন, ভক্তি প্রাণ, সরল সাধারণ নর-নারীর সাধারণ যুক্তি বিচার, স্বাভাবিক মানবিক বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে আপনার স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ করিয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বরীয় ইচ্ছা জয়সিংহের ভাষায় রসাতল গামী চোরের মত সুড়ঙ্গ পথ অনুসন্ধান করে না। ঈশ্বরীয় ইচ্ছা উপনিষদের ভাষায় সেই মহৎ ভয়, মহা ত্রাশ, অমোঘ শাসন, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া নিখিল বিশ্বের এই সমস্ত কিছু, অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য্য-চন্দ্র আপন আপন কক্ষে বিচরণ করিতেছে, বাতাস দিকমুখান হইয়া অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে, নদী স্রোতের বিরাম নাই।

সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতে রঘুপতি শেষে নক্ষত্ররায়কে ভ্রাতৃহত্যার পরামর্শ দিয়াছে, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নয়, সিংহাসনের প্রলোভন দেখাইয়া।

"ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য

* * *

* গোপনে তাহারে

বধ ক'রে আনিবে সে তপ্ত রাজ রক্ত

দেবীর চরণে। "

রাজসিংহ ধর্ম্মের নামে এই ঘৃণ্যতম পাপ পরামর্শের কথা বলিতে রঘুপতি বলিয়াছে—

"আর

কী উপায় আছে বলো।"

ধর্ম্ম বোধ রঘুপতির মধ্যে কিছুমাত্র ছিল না, এ সম্পর্কে কোন বিশ্বাসবোধ তো দূরের কথা কোন সংস্কারও তাহার ছিল না। মন্দিরের পৌরহিত্য তাহার ক্ষমতা ও অহঙ্কারকে অপ্রতিহত

করিয়া রাখিবার একটা উপায় ছিল মাত্র। যদি ইতিপূর্ব্বে কোথাও এতটুকু সংস্কারের বন্ধন তাহার অন্তরের মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহা যে পরে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায় তাহা এই জাতীয় উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

রঘুপতি জীবনে সর্ব্বাধিক অপরাধ করিয়াছে জয়সিংহের ঈশ্বরীয় ভক্তি, শুদ্ধ ধর্ম্মবোধ, বিশেষ করিয়া তাহার গুরুভক্তি ও পিতৃ স্নেহের সুযোগ লইয়া সেই সকল স্নেহ ও ভক্তির উপর আপনার দাবী জানাইয়া তাহাকে রাজ রক্তের জন্য দেবীর চরণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করাইয়া লইয়া। পাপ কার্য্যে প্রিয়জনের সহায়তা গ্রহন বিশেষ করিয়া তাহার স্নেহের সুযোগ লইয়া তাহাকে পাপ কার্য্যে লিপ্ত করার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নাই। তাহাতে অপরাধ জীবনে শতগুণ প্রতিশোধ লয়। সেই প্রিয়জনের উপর অপরাধের শাস্তি আসিয়া পড়ে বলিয়া শাস্তি বহুগুণ হইয়া বুকে বাজে।

রঘুপতির সকল ষড়যন্ত্র এমনি করিয়া বার বার ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার সকল অভিপ্রায়, সকল ইচ্ছা এমনি করিয়া বারবার প্রতিহত হইয়া কেবল তাহাকেই দংশন করিয়াছে, তাহারই বিষে রঘুপতি জর্জ্জরিত নীল। প্রবল ইচ্ছার বেগ বাহিরে প্রতিহত হইলে তাহা আত্মমুখীন হইয়া মানুষকেই নির্ম্মম ভাবে আঘাত করে। সেই ইচ্ছার বেগে রঘুপতি আজ একপ্রকার অপ্রকৃতিস্থ। রঘুপতি তাই অকারণ হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। ধ্রুবকে হত্যা করিয়া রাণীর যে স্বার্থ-সিদ্ধি হোক তাহাতে রঘুপতির কোন স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে না। তবু রঘুপতি ধ্রুবকে আপন হস্তে হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছে। রঘুপতির জীবনে এখন পাপ প্রয়াসের লক্ষ্যটাও নাই। তাহার পাপ সকল ফল পরিণাম শূন্য অকারণ পাপ।

তবে এখনও আর এক ইচ্ছা আছে তাহা হইল রাজা-গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করা। সে হত্যায় তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা ফিরিয়া আসিবে কিনা সে বিচার আজ রঘুপতির নাই। তাহার অন্ধ জিঘাংসা প্রবৃত্তি অতিক্রুর উদ্যত সর্পের মত রাজাকে আজ দংশন করিতে

উদ্যত হইয়াছে। তাহারপর রঘুপতির প্রাণ যদি বাহির হইয়া যায় তাহার জীবনে যত বড় লাঞ্ছনাই আসুক তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই। ওই একমাত্র ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে রঘুপতি সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দিয়াছে।

রাজা নির্ব্বাসন দণ্ড দিলে রঘুপতি তাই দুটি দিন মাত্র সময় প্রার্থনা করিয়াছে। রাজার হৃদয়ে করুণা সঞ্চার করিবার জন্য যতদূর হীনতা স্বীকার করা সম্ভব রঘুপতি ততদূর হীনতা স্বীকার করিয়াছে। ওই দুটি দিনের জন্য সে যে-কোন অগৌরব স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তাহার পর রাজার করুণা লাভ করিয়া কী আশ্চর্য্য পৈশাচিক উল্লাস বোধ। ওই উল্লাসবোধই অমন দীনতা স্বীকারের ভিতর দিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়াছে।

> "মহারাজ রাজ অধিরাজ!
> মহিমা সাগর তুমি কৃপা অবতার!
> ধূলির অধম আমি, দীন, অভাজন!"

গৃহে ফিরিয়া রঘুপতি জয়সিংহের নিকট নত জানু হইয়া করজোড়ে রাজরক্তের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাকে বারংবার তাহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। ওই এক জিঘাংসা প্রবৃত্তি ও প্রতিশোধ স্পৃহা রঘুপতিকে এমন অন্ধ করিয়া দিয়াছে। ওই ইচ্ছাই তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তাহাকে দিয়া তাহার সন্তান তুল্য জয়সিংহের নিকট করজোড়ে নিবেদন জানাইয়াছে। রঘুপতির চরিত্রের পরিণাম এইখানে সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহারপর জয়সিংহের মৃত্যুতে তাহার যে বিলাপ তাহাতে তাহার বিপর্য্যস্ত ভাব-জীবনের পরিচয়ই কেবল ব্যক্ত হইয়াছে। রঘুপতি যে পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেও সে তাহার পূর্ব্বের স্বাভাবিক জীবন লাভ করিতে পারিত না। রঘুপতির এই যে সমস্ত উক্তি তাহা প্রলাপ ছাড়া আর কী হইতে পারে।

> "দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
> পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্ব্বোধের মতো।

মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা হা!
কোন দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোর-তর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ।"
"কার কাছে কাঁদিতেছ
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয় দলনী পাষাণীরে। লঘু হোক
জগতের বক্ষ।"

আস্তিক্য যে-কোন বোধ মাত্রেরই সহিত মহৎ অস্তিত্বের যোগ আছে। তাই যে-কোন আস্তিক্য বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ সেই পরম আস্তিক্যের সন্ধান লাভ করিতে পারে। রঘুপতি আজ যে পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহা যে-কোন আস্তিক্য বোধ শূন্য মহা শূন্যতার লোক।

কিন্তু নাট্যকার রঘুপতির জীবনে এই পরিণাম চিহ্নিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই তাহাকে সকল সংস্কার মুক্ত পূর্ণ আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কোন্ বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের ফলে তাঁহার পক্ষে রঘুপতির মত চরিত্রের এই পরিণাম দান সম্ভব হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি রঘুপতির জীবনে ধর্ম্মের লেশমাত্র ছিল না। কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-সংস্কারও তাহার অন্তরে এতটুকু স্থান লাভ করিতে পারে নাই। রঘুপতি সংগ্রাম করিয়াছে কেবল আপন ক্ষমতা ফিরিয়া লাভ করিবার জন্য। তাহার সকল প্রয়াস তাহার ধর্ম্মাচরণের উপর তাহার নিজেরই কোন বিশ্বাস ছিল না।

তাহার জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল জনসাধারণের উপর অবাধ আধিপত্য লাভ করিতে। দারুণ আঘাতে সেই ক্ষমতা লোলুপতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই ধর্ম্মের উপর রঘুপতির যদি প্রকৃত বিশ্বাস থাকিত এই ধর্ম্ম বিশ্বাস যদি অজ্ঞানতা রূপে তাহার চরিত্রে দৃঢ় মূল হইত তবে ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রকৃত অধ্যাত্ম সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে অপরূপ চরিত্র রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিত, তাহাতে মানুষ্য সত্তার গভীরতম তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া যে মহাবিস্ময় সৃষ্টি করিত সেই জাতীয় জীবন সাক্ষাৎকারের কোন বিস্ময়-প্রেরণা রঘুপতির চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল না। অথচ ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ওই অজ্ঞানতটাকেও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিতেন।

অতি প্রবল ক্ষমতা লোলুপতার যে অনিবার্য্য পরিণাম, ইতিপূর্ব্বে রঘুপতির জীবনে যে পরিণামের কথা উল্লেখ করিয়াছি, রঘ পতির চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে সেই জাতীয় জীবন-সাক্ষাৎকারও ছিল না। তাহা হইলে রঘুপতির ওই বিশিষ্ট পরিণাম চিন্তা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। রঘুপতির চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে তাহার ওই বিশিষ্ট পরিণাম চিহ্নিত করিয়া দিবার পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের কোন্ জীবন-সাক্ষাৎকার ছিল তাহা তাই বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য ক্ষমতা লোলুপতার সহিত বিচিত্র হীন ষড়যন্ত্র ও পাপ প্রয়াসের সহিত জয়সিংহকে আশ্রয় করিয়া রঘুপতির জীবনে যে স্নেহের দ্বন্দ্ব ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন পরিচয় দান করি নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম বিশ্বাস ছিল যে মানুষ যতই অধঃপতিত হোক-না-কেন তাহা অতি ভয়াবহ হীন পরিণামও হইতে পারে, কিন্তু মানুষের আত্মা থাকে অম্লান। কেবল তাহাই নহে তাহার প্রেরণা কোন-না-কোন রূপে জীবনে থাকিয়া যায়। মানুষ কোন অবস্থাতেই আত্মার প্রেরণা শূন্য হইতে পারে না। আত্মার প্রেরণা মানবিক বোধের জগতে প্রেম বা স্নেহ রূপে লীলায়িত হয়। মানুষ যতই নিম্ন হইতে

নিম্নতর লোকে নামিয়া যায় প্রেম বা স্নেহের এই বোধটাও ততই নানা বিকৃত পরিণাম লাভ করিতে থাকে। ঘৃণ্যতম পাপ প্রবৃত্তির পশ্চাতেও এই প্রেমের প্রকাশ। ক্রমিক নিম্ন লোকে উহার স্বভাব ক্রমিক হীন স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। মানুষের হৃদয় যতই পরিশুদ্ধ হইতে থাকে, মনুষ্য চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে এই এক প্রেম ততই উন্নত স্বভাব প্রাপ্ত হয়, অলৌকিক ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত হইয়া যায়। গুণবতীর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মূল জীবন বোধের উল্লেখ করিয়াছি।

রঘুপতির হৃদয়েও স্নেহ প্রেম ছিল, সকল স্নেহ কাতর পিতার মতই তাহা ছিল অসীম, অগাধ। ক্ষমতা লোলুপতার সঙ্গে রঘুপতি যতই নিম্ন হইতে নিম্নতর লোকে নামিয়া আসিয়াছে জয়সিংহের নিকট রাজার প্রেম, অপর্ণার ভালোবাসার সত্য রূপটি ততই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়সিংহ হৃদয়বান পুরুষ ছিল বলিয়া সত্য প্রেমটিকে মুহূর্ত্তে চিনিয়া লইতে ভুল করে নাই। সত্য প্রেম নর-নারীকে মুক্তি দেয়। রাজা গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংকে প্রেমে সেই মুক্তি লাভের কথা শুনাইয়াছে, বালিকা অপর্ণা জয়সিংহকে আপনার প্রেমে মুক্তি দিতে চাহিয়াছে আর রঘুপতির প্রেম তাহাকে একের পর এক শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়াছে। রঘুপতি যতই স্খলিত হইয়াছে সেই সঙ্গে জয়সিংহও ততই দূরে সরিয়া গিয়াছে। রঘুপতি তাই তাহাকে নানা ভাবে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাই অন্ধতম আসক্তি, আসক্তি হোক, তাহা মানবিক প্রেমেরই বিকৃত রূপ। রঘুপতির এই বিকৃত প্রেমই জয়সিংহকে হত্যা করিয়াছে। প্রেমে মানুষ মানুষকে মুক্তির অমৃত আস্বাদ দান করিতে পারে, প্রেমে মানুষ মানুষকে চির বন্ধন দুঃখও দান করিতে পারে।

রঘুপতি অধঃপতনের একের পর এক সোপানে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে নাট্যকার একের পর এক বিকৃত প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহার পৃথক বিস্তারিত পরিচয় দানের কোন প্রয়োজন নাই।

ওই আসক্তির সহিত বিজড়িত হইয়া তাহার জীবনে অন্য সকল পাপ প্রবৃত্তি লীলায়িত হইয়াছে। জয়সিংহের মৃত্যুতে এই আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে রঘুপতির হৃদয় সাময়িক ভাবে শূন্য হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে সকল পাপ-প্রয়াসও নির্মূল হইয়া গিয়াছে। এই শূন্যময় অসীম বেদনা পরিপূর্ণ অন্তরে অপর্ণার শুদ্ধ প্রেমকে স্বীকার করিয়া লইতে তাহার কোথাও বাধা হয় নাই। অপর্ণা যেন তাহার সম্মুখে অপার্থিব প্রেমের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে, যেমন করিয়া তিমির-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সূর্য্যের মহান অভ্যুদয় ঘটে। রঘুপতি সেই প্রেমে সেই আলোকে স্নান করিয়া হৃদয়ের সকল পাপ-তাপ-জ্বালা জুড়াইয়াছে। রঘুপতি অপর্ণাকে বলিয়াছে—

"পাষাণ ভাঙিয়া গেল —জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃত ময়ী।

———

জয়সিংহ রঘুপতির পালিত পুত্র। পুরোহিত ব্রাহ্মণের স্নেহে হিন্দু দেবী মন্দিরের পরিবেশে এবং উহারই বিচিত্র সংস্কারের মধ্যে তাহার শৈশব, কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়াছে। জয়সিংহ এখন তরুণ যুবক। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবী ও সাধারণ শাস্ত্র বিধি সম্পর্কে যে প্রচলিত বিশ্বাস তাহা যে জয়সিংহের মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে তাহা একপ্রকার অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। তবে ওই সংস্কারের মধ্যে তাহার তরুণ প্রাণ তখনও আত্মহত্যা করিয়া মরে নাই, তখনও কিছু অবশেষ ছিল। তাই শাস্ত্র বিধানের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া উহার সকল আচার আচরণ, পূজা-বিধি পালন করিয়াও তাহার অন্তরের মধ্যে নিয়ত কী-যেন-এক অভাব বোধ জাগিত, এক শূন্যতা বোধের নিত্য পীড়া। ইহাকেই অধ্যাত্ম শূন্যতা বোধ বলা যাইতে পারে। ইহাই সেই অধ্যাত্ম বোধের গভীর গোপন প্রেরণা। জয়সিংহ ইহার কারণ

বুঝিত না সত্য, কিন্তু এই অনুপ্রেরণায় মাঝে মাঝে এই সমস্ত আচার-আচরণ পূজা-পদ্ধতি নিরর্থক, একান্ত পাষাণ ভার বলিয়া বোধ হইত। মাঝে মাঝে মনে হইত ইহা যেন সত্যের স্পর্শ বঞ্চিত, সত্য আর কোথাও আছে। এমন করিয়া তাই তাহাকে লাভ করিতে পারা যায় না।

অপর্ণার স্নেহ ব্যাকুলতা, তাহার ব্যথা কাতরতা, তাহার অশ্রু-সজলতার ভিতর দিয়া জয়সিংহ জীবনে' সেই প্রথম আর একটি জগতের সন্ধান লাভ করিয়াছে। ইহা যেন একটি নূতন সুর, নবীন ছন্দ, অন্তর বীণার সকল তন্ত্রী ইহার স্পর্শ লাভ মুহূর্ত্তে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে। জয়সিংহের ওই প্রথম বিস্ময় বোধ হইতেই বুঝিতে পারা যায় তাহার সমস্ত সত্তা উৎকর্ণ হইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছে। তাহার কত, কত দীর্ঘ দিনের পিপাসিত চিত্তের উপর শ্যামল মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া অকস্মাৎ আজ ধারা বহাইয়া দিল। ইহার কোন আস্বাদ তাহার ইতিপূর্ব্বের জীবনে ছিল না। এই উপলব্ধির সহিত বিজড়িত হইয়া তাহার জীবনে প্রথম জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

> "আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
> বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
> মানবের, দয়া নাই বিশ্ব জননীর।"

কি-বা

> "তোমার মন্দিরে একী নূতন সঙ্গীত
> ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরি নন্দিনী
> করুণা কাতর কণ্ঠস্বরে! ভক্ত হৃদি
> অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।"

জয়সিংহের প্রাণের যে শূন্যতা দেবী পূর্ণ করিতে পারে নাই, ওই সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার ও বিশ্বাস, সকল পূজা ও আরাধনা তাহার হৃদয়ের যে শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারে নাই তাহা কোন্ রহস্যের বশে অপর্ণার কণ্ঠস্বরে তাহার মাধুর্য্য ভরা আসঙ্গে ধীরে পূর্ণ

হইয়া উঠে। জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে, "মা গো, একী মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয় মানবের প্রাণ!" মানবিক প্রেমের এই রহস্য জয়সিংহকে মুগ্ধ করিয়াছে। একদিকে জয়সিংহের তথাকথিত ধর্ম্মবোধ, আজন্মের ধর্ম্ম সংস্কার অন্যদিকে এই মানবিক প্রেম। জয়সিংহের মধ্যে এই দুই সংগ্রাম ক্রমাগত তীব্র হইয়া তাহাকে ওই পরিণামের দিকে দ্রুত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রকৃত ধর্ম্ম বলিতে কী বুঝায় তাহা জয়সিংহ বুঝে নাই, ওই জাতীয় কোন সত্য অনুভূতি লাভও তাহার জীবনে ঘটে নাই, ওই জীবন ছিল তাহার নিকট কেবল অন্ধ বিশ্বাস, নিষ্প্রাণ কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, তাই তাহার হৃদয়কে উহা শীঘ্রই এমন শূন্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্মে অতি মানবিক অনুভূতির আশ্রয় তাহার ছিল না অথচ মানবিক প্রেমে মানুষ যে চরিতার্থতার সন্ধান পায় তাহা হইতেও তাহার জীবন বঞ্চিত। ওই আস্বাদটা জীবনে ঘটিতে তাহার ইতিপূর্ব্বের আচার-সর্ব্বস্ব জীবন মুহূর্ত্তে বেদনা-বন্ধন হইয়া উঠিয়াছে। জয়সিংহ যে প্রকৃতির মানুষ তাহাতে তাহার পক্ষে মানবিক প্রেমের এই পথটাই শ্রেয়। অথচ ধর্ম্মে সার্থকতা লাভের সে শক্তি জয়সিংহের ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না, কারণ সে যে গুরুর আশ্রয় লইয়াছে, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত হইয়া তাহাকে বারবার যাহার স্মরণাপন্ন হইতে হইয়াছে, সেই গুরুরই অধ্যাত্ম অনুভূতি বলিয়া কিছু ছিল না। তাহার নিজেরই অন্তরে কোন আলোক ছিল না বলিয়া জয়সিংহের অন্তরে সে আলোক জ্বালাইতে পারে নাই।

তথাকথিত ধর্ম্মের সকল আশ্রয় বঞ্চিত জয়সিংহ পরিশেষে যে জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করিব। তাহার পূর্ব্বে জয়সিংহের চরিত্রের ধীর পরিণামটিকে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে অপর্ণা জয়সিংহকে একটি পথের সন্ধান দিয়াছে। তাহার সেই গান—

"আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমায় পথের সন্ধান কে কবে ?
ভয় নেই, ভয় নেই যাও আপন মনেই
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।"

সত্য লাভের জন্য মানুষকে বাহিরে কোথাও নয় কোন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও নয়, কেবল অন্তরের মধ্যে একাকী পথ সন্ধান করিয়া ফিরিতে হয়। সে পথ কেবল আপনার একার পথ বলিয়া কোন গুরুও তাহার সন্ধান বলিতে পারেন না। বহুদূর হইতে পাতার আড়াল ঢাকা কুসুমের অতি মৃদু গন্ধ ভাসিয়া আসে। মৌমাছি সেই গন্ধ-পথ ধরিয়া একাকী উড়িয়া চলে নিঃসংশয় বিশ্বাস বুকে করিয়া। পরিশেষে সেই গোপন ফুলটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সকল মধু মত্ত হইয়া লুটিয়া লয়। অন্তরের পথে তেমনি পথ চলার অদৃশ্য ইশারা আসে। সেই ইশারায় বিশ্বাস বুকে করিয়া নিঃসংশয়ে পথ চলিতে হয়। বহু ক্লান্ত যাত্রা শেষে মানুষ তাহার পরম ধনটিকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য জন্মের ইহা সর্ব্বশেষ কৃতার্থতা।

অন্তরময় সে সাধনার আদি ও অন্ত কথা হইল প্রেম। এই প্রেমের আলোকে অন্ধকারে পথ চিনিয়া চলিতে হয়। অন্তর্জগতে পথ চলার ওই একমাত্র আলোক। জয়সিংহ আজও সেই আলোর সন্ধান পায় নাই, তাহার অন্তর তাই এমন অন্ধকারময়। বাহিরের জগৎ সম্পর্কে জয়সিংহের সন্দেহ জাগিয়াছে, অথচ অন্তর জগতে পথের সন্ধান সে আজও লাভ করিতে পারে নাই। জয়সিংহকে তাই অসহনীয় শূন্যতার পীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে। জয়সিংহ সে কথা অপর্ণাকেও বলিয়াছে—

"কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি

দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ ? জান কি একেলা
কারে বলে ?"

অর্পনা তাহার উত্তরে বলিয়াছে—"জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।"

অপর্ণা একান্ত স্পষ্ট করিয়া তাহার প্রেম ও মাধুর্য্য-লোকে জয়সিংহকে আহ্বান করিয়াছে। নারীর প্রেম ও মাধুর্য্য পুরুষের অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম আলোক বর্ত্তিকা।

অপর্ণা যে সাধন-পথের ইঙ্গিত দিয়াছে জয়সিংহ হয় তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে পারে নাই, কিংবা পারিয়াও তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। কারণ জয়সিংহ এখনও সম্পূর্ণ রূপে পূর্ব্বের সংস্কার মুক্ত হইতে পারে নাই, এখনও প্রেমের নিঃসংশয় প্রত্যয় তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই।

প্রেমকে আপনার মধ্যে নিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়া জয়সিংহ এখনও পর্য্যন্ত জীব বলির অসারতা, রাজার যুক্তি বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সংস্কার তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে সরল বিশ্বাসের জোরে, উহাকে সে রঘুপতির মত স্বার্থ সিদ্ধির উপায় রূপে আশ্রয় করে নাই। সংস্কারের পরীক্ষা তাহার জীবনে এই প্রথম সুরু হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া ইহার মূল্য বোধ সম্পর্কে যখন সে নিঃসংশয় হইবে, তখন ইহাকে পরিহার করিতে (দীর্ঘকালের বিশ্বাস বলিয়া বেদনা বোধ জাগিলেও) তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা জাগিবে না। ধর্ম্মবোধ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা না থাকিবার জন্যই জয়সিংহ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কোন হীন পথ অবলম্বন করিতে পারে নাই। ওই সংস্কারের মধ্যে আশৈশব বাস করিয়াও যতটুকু নৈতিকবোধ থাকিতে পারে অন্ততঃ ততটুকু নৈতিক বোধকে জয়সিংহ আপনার জীবনে কোথাও ক্ষুণ্ন হইতে দেয় নাই। রঘুপতি নয়নরায়কে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার পরামর্শ দিলে নয়নরায় অশ্রদ্ধায় তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ধর্ম্ম ও

অধর্ম্মের কোন কথা নয়, রাজার অমন বিশ্বাস সে কেমন করিয়া ভঙ্গ করিবে। নয়নরায়ের এই মহত্ত্বের পরিচয়ে উৎফুল্ল হইয়া জয়সিংহ রঘুপতিকে বলিয়াছে—

"এমনি বিশ্বাস বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু!
সৈন্য বলে কোন্ কা য। অস্ত্র কোন ছার!
যার 'পরে রয়েছে যে ভার; বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মার পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।"

এই গভীর বিশ্বাস রঘুপতির ছিল না রঘুপতির লক্ষ্য তো ধর্ম্ম নয়, তাহা হইল ক্ষমতাধিকার। একটি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আপন শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে যে বিচিত্র ছলনা-জাল বিস্তার করিতে হয়, যে কূট কৌশল অবলম্বন করিতে হয় রঘুপতি তাহাই করিয়াছে।

দেবী মন্দিরের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিতে রঘুপতি যেখানে প্রজাদের অস্ত্র দিয়া রাজার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছে জয়সিংহ সেখানে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিতে চাহিয়াছে। জীব বলি যদি দিব্য-অভিপ্রায় হইয়া থাকে তবে তাঁহার শক্তিই মনুষ্য দেহাধারে অমোঘ শক্তি রূপে লীলা করিয়া বিরুদ্ধ শক্তিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। এই ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল বলিয়া জয়সিংহ গোবিন্দ-মাণিক্যকে এমন অনুরোধ করিয়াছে। এই অনুরোধের ভিতর দিয়া রঘুপতির মত অহঙ্কার, তীব্র আক্রোশ ফাটিয়া বাহির হয় নাই।

"প্রভু, ফিরে লও
তব গর্ব্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—"

জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যকে দিব্য-ইচ্ছার কথাই বলিয়াছে, পৌরহিত্য বা ব্রাহ্মণত্বের কথা বলে নাই।

জয়সিংহের অন্তরে ধর্ম্মের সকল বোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রঘুপতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রঘুপতি তাহার নিকট যতই শ্রদ্ধা হারাইতেছে তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস ততই শিথিল হইয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে জীবনের আর একটি সত্য-বোধ ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনের প্রলোভন দেখাইয়া রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিয়াছে। যে-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্যত্বের সকল মূল্য বোধ বিসর্জ্জন দিতে হয় সে-ধর্ম্মে মানুষের কতটুকু প্রয়োজন। একদিকে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য, মহৎ গুণাবলী আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে ধর্ম্ম মানুষের এই সমস্ত সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে! মনুষ্যত্ব সাধনা ও ধর্ম্ম সাধনা কি তবে পরস্পর বিপরীত! যদি তাহাই হয় তবে বিশ্ব হইতে ধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহাতে মনুষ্য জাতির কল্যাণ। মনে রাখিতে হইবে জয়সিংহের ধর্ম্মের আদর্শ রঘুপতি। জয়সিংহ তাই ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিয়াছে—

> "জননী, তোমার
> হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
> নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
> খুঁড়িছে সুড়ঙ্গ পথ চোরের মতন
> রসাতল গামী? এ কি পাপ!"

আশৈশব যে বোধ আশ্রয় করিয়া জয়সিংহের ভাব-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মুখে। অন্ততঃ যুক্তি বিচার দিয়া জয়সিংহ এখন ইহার অসারবত্তা বোধ করিতে পারে। তাই যুক্তি বিচার নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া জয়সিংহ তাহার পূর্ব্বের বোধ ও বিশ্বাসকে প্রাণপন বলে জড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে। কারণ ওই ভাব-জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িলে সে-যে কোন্ মহাশূন্যতার মধ্যে চিরকালের জন্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। তাই ভক্তির নাম দিয়া জয়সিংহ এমন

একটি সাধন তত্ত্ব আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে যেখানে মানুষের যুক্তি নাই, বিচার নাই, চিরন্তন নৈতিক বোধটাও যদি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় তবে তাহার জন্য কোন সংশয়-জিজ্ঞাসা নাই, কেবল গুরুর নির্দ্দেশ মানিয়া চলা। জয়সিংহ পরিশেষে তাহাই করিতে চাহিয়াছে।

"সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্র বিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায় আলোক আকাশ হতে
আসে।"

কিন্তু এই চেষ্টায় জয়সিংহের ভাব-জীবনটা সম্পূর্ণ রূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। একদিকে অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তি এবং অন্যদিকে বিচিত্র নৈতিক জিজ্ঞাসা এখানে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব-পরিণাম লাভ করিয়াছে। উহারই অসহনীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়সিংহ আপনার ভিতর হইতেই জীবনের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছে। জীবনের ভিত্তি-ভূমি বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ যে মূল্য বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষের সমগ্র প্রয়াস রূপ লাভ করে জয়সিংহের জীবনে সেই আশ্রয়-ভূমিটা সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

"তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্য পথ তোমারি ইঙ্গিত মুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃ হত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজ হত্যা! সেই সত্য, সেই সত্য!
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য! "

এই উপলব্ধিটাই ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া তাহার নিকট নিঃসংশয় হইয়াছে, সংশয় জাগাইয়া রাখিবার ক্ষীণতম অন্তরাল পর্য্যন্ত আজ কোথাও এতটুকু নাই। ব্যর্থ জীবনের পরিতাপ ও গ্লানি ভরা জয়সিংহের সেই উক্তি—

"এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ !সব ফেলে দিলি সত্য শূন্য
দয়া শূন্য মাতৃ শূন্য সর্ব্ব শূন্য মাঝে !"

ধর্ম্ম সম্পর্কে তাহার ইতিপূর্ব্বের সকল সংস্কার যেমন ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে অন্য দিকে তেমনি তাহার জীবনে আর একটি সত্যবোধ ধীরে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা হইল সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ। এই জীবন ও জগৎ যে কত দুর্লভ, কত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যভরা, আর সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে ছাড়াইয়া যায় নর-নারীর যে-প্রেম তাহা জয়সিংহ যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে প্রথম উপলব্ধি করিয়াছে তেমনি ওই জীবনকে ফিরিয়া লাভ করিবার জন্য তাহার অন্তস্তল ব্যাপ্ত করিয়া হাহাকার জাগিয়াছে। কিন্তু উহাকে ফিরিয়া লাভ করিবার লগ্ন তাহার জীবনে চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। জয়সিংহের বেদনা এইখানেই সর্ব্বাধিক গভীরতা লাভ করিয়াছে। জয়সিংহের অজ্ঞানতা যদি না ঘুচিত এবং উহারই জন্য সে যদি জীবন বিসর্জ্জন দিত তবে তাহাতে জয়সিংহের মনে ক্ষোভ তো জাগিতই না পরন্তু মৃত্যুতে সে গৌরব বহন করিয়া লইয়া যাইত। আত্ম বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে জয়সিংহের এই অজ্ঞানতা সম্পূর্ণ রূপে ঘুচিয়া যায়। কেবল তাহাই নয় তাহার জীবনের সত্য পথটিকেও সে নিঃসংশয়ে বোধ করিতে পারে। একান্ত অনিচ্ছায় তাহার পূর্ব্ব-জীবনের ঋণ শোধ করিবার জন্য সে এই সুন্দরী ধরণী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে।

এই দীর্ঘকাল সে যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহারই বিচিত্র পাপকে সে আপনার বক্ষ রক্ত দিয়া ধুইয়া দিতে চাহিয়াছে; রঘুপতি উপলক্ষ্য মাত্র। আত্ম-বিসর্জ্জনের ইচ্ছা জয়সিংহ স্বয়ং মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। রঘুপতি সেই ইচ্ছাকে ভুল বুঝিয়া তাহাকে দিয়া আপনার স্বার্থ সিদ্ধি করাইয়া লইতে চাহিয়াছে।

জয়সিংহ অপর্ণাকে তাহার কর্ত্তব্য-বন্ধনের কথা যতবার করিয়া যেমন করিয়া বলুক-না-কেন, সে-বন্ধন সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে,

রঘুপতি সে-বন্ধনে তাহাকে বাঁধিতে চায় নাই। রঘুপতির পাপ প্রয়াসকে সে অমন করিয়া নিরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। আপনার প্রেম দিয়া সংস্কার-মুক্ত-দৃষ্টি দিয়া জয়সিংহ এখন গোবিন্দ মাণিক্যের পর্ব্বততুল্য মহিমার পরিচয় পাইয়াছে। সে জানে রঘুপতির অতি ক্রূর দংশন হইতে রাজাকে রক্ষা করিতে হইলে এই পথ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। রঘুপতিকে প্রেম বঞ্চিত করিয়া যদি প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করাইতে পারা যায়।

এমনি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের জন্য জয়সিংহ আপনার মধ্যে আপনি যতই প্রস্তুত হইয়াছে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাহার নিকট তত অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়সিংহের এ প্রেমে প্রত্যাশা নাই, মানবিক প্রেমের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এ প্রেম তাই জীবনের উত্তাপ বঞ্চিত। বিশ্ব-প্রাণ-লোক হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা যেন বিশ্বের জন্য ব্যাকুলতা। এ প্রেমে মাধুর্য্য আছে কিন্তু প্রাণের সাড়া নাই। মৃত প্রিয়জনের জন্য আমাদের যে প্রেম ইহার স্বরূপও কতকটা তেমনি। জয়সিংহ তাই শুধু ব্যাকুল অশ্রুবাষ্পভরা দুটি চোখ মেলিয়া অপর্ণার ও বিশ্বের সকল প্রেম ও মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

জয়সিংহ যে জীবন ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে সেই জীবনের স্বরূপ কি?

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ অনুভূত জীবনকে সেই দৃষ্ট ও অনুভূত জীবন স্বরূপে গ্রহণ করা যদি কোন জীবন-দর্শন হইয়া থাকে তবে তাহাকে জয়সিংহের জীবন-দর্শন বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা জীবনের গভীরতর সত্য সন্ধানের কোন আকাঙ্ক্ষা নয়, কোন বৃহত্তর আদর্শ প্রেরণা নয়, সকল তত্ত্ব ও আদর্শ প্রেরণা মুক্ত করিয়া জীবনকে কেবল জীবন মাত্র রূপে মানিয়া লওয়া। জীবনের পরিণাম রহস্যকে জয়সিংহ স্বাভাবিক ভাবে মানিয়া লইয়াছে। তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটনের কোন চেষ্টাই আজ তাহার মধ্যে নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় ও বোধের দ্বারা সীমিত যে-জীবন, যাহা জন্ম-

মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কাল পরিমাণ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই কি জীবনের আদি ও অন্ত, না মানুষ্য বোধের অতীত তাহার সীমাহীন কোন সত্তা রহিয়াছে। জীবনকে সেই অসীম সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে গড়িয়া তুলিতে হয়, না জীবনকে মানিয়াই জীবনকে গড়িয়া তোলা। জয়সিংহ জীবনের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে—

"কে বলিল, এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নর জন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দুই চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুল ভ্রান্তি ভয় দুঃখ সুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্ব্বলতা-বশে
ভ্রষ্ট লগ্ন এ জীবন ভার, ফিরে দিয়ে
অনন্ত কালের হাতে, গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি
কী কাজ গুরুতে!"

মৃত্যুতেই যখন জীবনের সকল সমাপ্তি তখন নানা তত্ত্ব, আদর্শ ও যুক্তি বিচার দিয়া জীবনের ভার বাড়াইয়া লাভ কি। এই যে সুনীল আকাশ ও শ্যামল বসুন্ধরা পরিব্যাপ্ত করিয়া সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে তাহাকে হৃদয় ভরিয়া পান করিয়া লওয়া তাহার পর মৃত্যুতে চিরবিশ্রাম লাভ। একদিকে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এই সৌন্দর্য্য-লোক, অন্য দিকে বিশ্বের নর-নারীর অন্তরের অপার স্নেহ প্রেম ও করুণা। এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম তরঙ্গিণীতে অবগাহন করিয়া তাহার আনন্দ-বেদনার বিচিত্র বিচি বিক্ষেপ বুক পাতিয়া গ্রহণ করা। ইহ-জীবনে ইহ-লোকে ইহার অধিক ফল লাভ আর কী আছে।

জয়সিংহ ধর্ম্ম সাধনার যে স্বরূপ রঘুপতির জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাতে সে ধর্ম্ম বলিতে বুঝে মানবিক বোধের, মানুষের সৌন্দর্য্য ও প্রেম, তাহার সকল মহত্ত্ব বোধের নিষ্ঠুর হত্যা। তবে এই ধর্ম্ম লইয়া মানুষের কী স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। মনুষ্যত্ব সাধনায় উহাকে যত শীঘ্র পরিহার করিতে পারা যায় মনুষ্য-সমাজের ততই মঙ্গল। জয়সিংহ সে কথাও বলিয়াছে।

"তার কাছে ক্ষুদ্র বটে,
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃ ধরা,
তার কাছে কীটবৎ তবু তো আমার
ভাই; অবহেলে অন্ধ রথ চক্র তলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত,
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।"

মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য, প্রেম ও মাধুর্য্যের মধ্যে জয়সিংহ তাই জীবনের সর্ব্বশেষ সার্থকতা অন্বেষণ করিয়াছে।

"অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধু কণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখ পানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্ব জগতের
নিদ্রামাঝে বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
স্তব্ধ রাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধ সম।"

গ্রীক জীবন-দর্শনকে আশ্রয় করিয়া Hellenism বলিয়া একটি মতবাদ আছে। তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—

"To get rid of one's ignorance, to see things as they are, and by seeing things as they are to see them in their

beauty, is the simple and attractive ideal which Hellenism holds out" (M. Arnold)

অর্থাৎ সকল সংস্কার মুক্ত হইয়া জীবন ও জগৎকে কেবল উহাদের স্বরূপে দেখা, উহাদের কেবল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ভাগটিকে স্বীকার করা ইহাই হেলেনিজ্‌ম্। জয়সিংহ যে জীবন-দর্শনটিকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সহিত এই মতবাদের যে আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। জয়সিংহের নিম্নের এই উক্তিটির মধ্যে ইহার নিঃসংশয় পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দ সুখে নৃত্য করে
নারী দল মধুর অঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায়—চারিদিক হতে উঠে গীতগান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে।"

কোন দেশের বিশিষ্ট কোন জীবন-দর্শনের সহিত জয়সিংহের জীবন-দর্শনের কোথাও কোন স্বারূপ্য আছে কিনা সে বিচার তুলিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। যে বিশিষ্ট মানসিক অবস্থায় এক একটি জীবন-দর্শন রূপ লাভ করিয়া ফুটিয়া উঠে, জয়সিংহের এই জীবন-দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে তাহার সেই মানসিক অবস্থাটিকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

জয়সিংহ আশৈশব যে সংস্কার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার অনুকূল করিয়া আপনার যে-জীবন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল সেই সমগ্র বোধ ও বিশ্বাসের জগৎটাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই সঙ্গে তাহার জীবনের ভিত্তি-ভূমিটাও। মহৎ জীবন মাত্রেই কোন-একটা আদর্শ বা সত্যবোধ আশ্রয় করিয়া সকল প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হয়, কিংবা বলা যায় জীবনের

সকল প্রয়াস একটি আদর্শমুখীনতা লাভ করে। সেই মহৎ জীবন জয়সিংহের ছিল। ওই আশ্রয়-ভূমিটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে জয়সিংহের প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জয়সিংহের মৃত্যু ঘটিয়াছে এইখানে, দেবী প্রতিমার পদতলে আত্মবিসর্জ্জন বাহুল্য মাত্র। ওই শূন্যময় জীবনকে নূতন কোন বোধাশ্রয়ী করিয়া পুনরায় গড়িয়া তোলা অসম্ভব। প্রাণ-মনের সে-শক্তি জয়সিংহের জীবনে ইতিপূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। জয়সিংহের এই জীবন-দর্শন তাহার এই মানসিক অবস্থার অনুকূল। হৃদয়-মন-মণীষার যে শক্তি অন্তর্মুখীন হইয়া মানুষকে ধ্যান-তন্ময় করে, আপাত দৃষ্ট জগৎকে অনুবিদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিক্ষত জয়সিংহের জীবনে সে শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

যে অজ্ঞানতা আশ্রয় করিয়া উহারই সঙ্ঘাতে চরিত্রের ধীর বিকাশ ঘটে, তাহা মুক্ত মহাজীবন লাভ অথবা মহৎ বিনষ্টি যাহাই হোক-না-কেন, গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রে সেই জাতীয় কোন সঙ্ঘাত এবং ওই সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া চরিত্রের যে ধীর পরিণাম লাভ, তাহা ঘটিতে পায় নাই।

মানুষ যতদিন মানবিক বোধ অর্থাৎ যুক্তি বিচার মাত্রকে আশ্রয় করে ততদিন তাহাকে সংশয়ের পীড়া কোন-না-কোন রূপে ভোগ করিতে হয়। মানুষ্য চেতনা যখন মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া অধ্যাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মানুষের জীবনে আর কোন সংশয় থাকে না। এই অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য স্থিত-প্রজ্ঞ, নির্দ্বন্দ্ব। গোবিন্দ মাণিক্য গুণবতীকে সে কথা বলিয়াছে—

> "ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
> অন্ধকার; সব পারে আপনার ছায়া
> কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
> বুদ্ধি দীপ সম, যত আলো করে দান
> তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া। স্বর্গ

হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।"

গোবিন্দমাণিক্যকে বাহিরের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়াছে কিন্তু অন্তর্জগতে তাঁহাকে কোন সংগ্রাম করিতে হয় নাই। বাহিরের কর্ম্ম অন্তর-রূপের প্রকাশ। অন্তরের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কর্ম্মের স্বরূপও রূপান্তরিত হইয়া যায়। তাই বাহিরের বিচিত্র কর্ম্ম প্রয়াসের স্বরূপ বিচার করিয়া অন্তরের স্বরূপ বিচার খুবই সম্ভবপর। গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্র যেমন তাহার কর্ম্ম-চেষ্টাও তেমনি কোন রূপান্তরের ভিতর দিয়া পরিণামমুখী হয় নাই। তাহার চরিত্রের যেখন তাহার কর্ম্ম প্রচেষ্টারও তেমনি স্বরূপ এক।

মানবিক বোধের বিপরীত ও বিরুদ্ধ যদি কোন তত্ত্ব থাকে জয়সিংহ তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিয়াছে। এই ধর্ম্মের বিপরীত ও বিরুদ্ধ তত্ত্ব হইল মৈত্রী ও করুণা, মানবিক সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ। অপর্ণার মধ্যে নাট্যকার এই বোধটিকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। অপর্ণা মানবিক প্রেম ও করুণার বিগ্রহ স্বরূপিণী। তাহার ব্যাকুল ক্রন্দনে তাহার স্নেহ কাতরতায় রাজার অন্তর হইতে সংশয় চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছে। জয়সিংহের অন্তরে এই মানবিক বোধটিকেই সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে অপর্ণা। তাহার মধ্যে এই বোধটিকেই অপর্ণা গভীর হইতে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের ওই মিথ্যা বন্ধন হইতে মানবিক প্রেম ও মাধুর্য্য-লোকে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অপর্ণা বারংবার জয়সিংহকে আহ্বান করিয়াছে। ইহার জন্য কত বিতাড়ন কত লাঞ্ছনাই না তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। রঘুপতি ধর্ম্মের সকল সংস্কার মুক্ত হইয়া এই মানবিক প্রেমে ধন্য হইয়াছে। ধর্ম্ম-তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব রূপে নাট্যকার যে অপর্ণা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষের ধর্ম্ম বলিতে

তিনি যাহা বুঝিতেন তাহাকেই যে সামগ্রিক রূপে অপর্ণার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

অপর্ণা নির্ব্বিশেষ মানবিক প্রেমের প্রতীক হইলেও তাহা একটি বিশেষ রূপ আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে, অপর্ণার তাই মানবী স্বভাবটি সম্পূর্ণ রূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহা এইরূপে একটি নারী চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

মানবিক প্রেমের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রূপাশ্রয়তা তাহা অপর্ণার মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অপর্ণার এই প্রেম একমাত্র জয়সিংহকে আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু এই প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাহাকে অন্য প্রেম সম্পর্কে অন্ধ করিয়া দেয় নাই। অপর্ণার প্রেমের বৈশিষ্ট্য এইখানে। এই রূপাশ্রয়তার জন্য অপর্ণার প্রেম কোন আইডিয়া বা তত্ত্বের প্রতীক হইয়া পড়ে নাই।

নারীর প্রেম ও মাধুর্য্য-লোকে পুরুষ যে মুক্তি লাভ করিতে পারে ইহা যে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সাধন সম্পদ তাহা অপর্ণা বুঝে। অপর্ণা আরও বুঝে যে নারীর প্রেম ও মাধুর্য্যের সার্থকতা একমাত্র পুরুষের প্রেম লাভে। পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রেমে ও আত্মত্যাগে মর্ত্ত্যে স্বর্গ-লোক রচনা করে।

অপর্ণা জয়সিংহকে আপনার প্রেম ও মাধুর্য্য-লোকে বারংবার আহ্বান করিয়াছে, কেবল জয়সিংহকে মুক্তি দিবার জন্য নয় আপনার মুক্তি লাভের জন্যও বটে। উভয়ে উভয়ের মুক্তি-লোকটিকে জানে, সাধন পথটিকেও চিনে। উভয়ে উভয়ের এত নিকটে অথচ তাহাদের উভয়ের মাঝখানে যে অ-দৃষ্ট দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রচিত হইয়াছে তাহা অতিক্রম করিয়া পরস্পরকে নিকটে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। তাই উভয়ের প্রেম ও মাধুর্য্য-লোক বেষ্টন করিয়া বেদনার অথৈ সমুদ্র।

অপর্ণা আপনার সকল মাধুর্য্য অর্ঘ্যরূপে সাজাইয়া জয়সিংহের চরণে সমর্পণ করিবার জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, কিন্তু বেদনায় বুক ফাটিয়া গেলেও জয়সিংহের তাহা বুকে তুলিয়া লইবার কোন উপায়

নাই। অপর্ণা ও জয়সিংহের তাই এমন অধ্যাত্ম শূন্যতা বোধ তাহাদের হৃদয় তাই এমন নিয়ত অশ্রুমুখীন। অপর্ণার নিঃসঙ্কোচ ও মুগ্ধ প্রেম বারংবার জয়সিংহের নিকট সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

"জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।"

প্রেমে নারী আত্মসমর্পণের জন্য অধীর হইয়া উঠে। ঐশ্বর্য্যের দান ভারে পীড়িত চিত্ত নিঃশেষ সমর্পণে মুক্তি লাভ করিয়া বাঁচে, নহিলে আপনার ঐশ্বর্য্য ভারে নারীর হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যাইবে। পুরুষের নিকট নারীর প্রেম ও মাধুর্য্যের মূল্য কতখানি এবং তাহা যে ইহ-জীবনে আর কোন কিছুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে পারা যায় না তাহা অপর্ণা নিঃসংশয়ে বুঝে।

"জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে, প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চির রাত্রি দিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত।—ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?"

নাটকটির মধ্যে নাট্যকার যে জীবন-দর্শনটিকে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, পরিশেষে তাহারও সামান্য পরিচয় দান প্রয়োজন। তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তি কয়েকটির মধ্যে তাঁহার ওই জীবন দর্শনটির বীজ-রূপ লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য গুণবতীকে বলিয়াছে—

"জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন।"

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য প্রজাদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছল ছল
নেত্রে তাঁর ॥"

গুণবতীর প্রেম ফিরিয়া লাভ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য বলিয়াছেন—

"গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।"

মোহ ভঙ্গ শেষে রঘুপতি অপর্ণাকে বলিয়াছে—

"পাষাণ ভাঙিয়া গেল—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী।"

ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম ও করুণাই মানুষের হৃদয়ে স্নেহ ও প্রেম রূপে প্রকাশ লাভ করে। সেই এক প্রেম বিশ্বের প্রত্যেকটি জীবকে শুশ্রূষা করিতেছে, সকলের প্রাণে প্রাণ রূপে, সকলের প্রেমে প্রেম রূপে লীলা করিতেছে। নর-নারীর হৃদয়ে তাহারই প্রকাশ। নর-নারীর স্নেহ ও প্রেমের মধ্য দিয়া যে সেই অনন্ত স্নেহ ও প্রেমের পরিচয় লাভ করিয়াছে, অসীমের স্নেহ ও প্রেমকেই যে নর-নারীর স্নেহ ও প্রেমের মধ্যে মূর্ত্ত হইতে দেখিয়াছে সেই সৃষ্টির পরম তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছে।

ঈশ্বরীয় বোধ লাভ করিতে যেখানে মানবিক বোধকে অস্বীকার করিতে হয়, যেখানে সে প্রয়াস এমনকি মানবিক বোধ বিরুদ্ধ তাহা রবীন্দ্রনাথের মতে শূন্যতার সাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জাতীয় সাধনার আশ্রয়ে মানুষের অনেক পাপ প্রবৃত্তি অনেক হীন স্বার্থ পরিপুষ্টি লাভ করে।

উন্নততর পরিণাম লাভে মানবিক এই স্নেহ ও প্রেমের সামর্থ্য ও

ঐশ্বর্য্য ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতে থাকে, তাহা যে-কোন পরিণামে ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে না।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার স্নেহ ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া তাহাকে অনুবিদ্ধ করিয়া বিশ্বের স্নেহ ও প্রেম ব্যাকুলতার আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। নর-নারীর প্রেম মাত্রেরই মধ্যে তাঁহার প্রকাশ। প্রেমের প্রকাশ যেখানে সেইখানেই তো তাঁহার প্রতিমা। এই বিশ্ব-প্রেমকেই ব্যক্ত করিতেছে নর-নারীর প্রেম। তাঁহারই প্রেমে সঞ্জীবিত এই বিশ্ব, বিশ্বের সকল রূপ। বিশ্বের প্রত্যেকটি নর-নারী এই সাক্ষাৎকারে পরমেশ্বরের প্রতিমা বা প্রতীক্ হইয়া উঠিয়াছে। এই সাক্ষাৎকার কেবল রাজা লাভ করে নাই, পরিণামে রঘুপতিও লাভ করিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা

সৌন্দর্য্য-সাধনা, তজ্জনিত সংগ্রাম ও সিদ্ধির বিচিত্র রূপের পরিচয় লাভ করা যায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে। সৌন্দর্য্য-বোধের এই সমস্যা, যাহা দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য সাধনের, উভয়ের মধ্যে একটি সংযোগ সেতু আবিষ্কারের সংগ্রামও বটে, রবীন্দ্রনাথের একেবারে মর্ম্মমূলের সহিত বিজড়িত এবং সমগ্র কবি-জীবন ব্যাপিয়া যে তাঁহাকে ইহার একপ্রকার মীমাংসা অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে হইয়াছিল তাহাও প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই সমস্যা ও সমাধানের একটি রূপ লক্ষ্য করা যায় চিত্রাঙ্গদা নাটকে।

প্রারম্ভে তাই রবীন্দ্রনাথের সেই সৌন্দর্য্য-সাধনা এবং ওই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া কবিকে যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার পরিচয় লাভ প্রয়োজন। পরে যে উপায়ে তিনি ওই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

সৌন্দর্য্য বোধাশ্রয়ী এই জীবনবোধটিকে এককালে কবি স্বয়ং আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে যে তিনি কত সত্য, কত গভীর করিয়া আপনার জীবনে আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন।

"যেন আমি ধরাতলে
একদিন উঠেছি ফুটিয়া অরণ্যের
পিতৃমাতৃ হীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু; তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমর গুঞ্জন গীতি; বন বনান্তের
আনন্দ মর্ম্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ু স্পর্শ ভরে
ক্রন্দন বিহীন মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুম কাহিনী খানি আদি অন্তহারা।"

ধরাতলে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় একটির পর একটি দল উন্মোচন করিয়া, অন্তর্লীন সমস্ত সৌন্দর্য্য-সৌরভ ও মাধুর্য্য ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া। কুসুম এমনি করিয়া বিশ্বের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আপনার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিস্তার করে। বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের যোগে কুসুম এমনি করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে সার্থক করিয়া তুলে। কুসুমের জীবন যত ক্ষণকালের হোক-না-কেন, বিশ্বের আনন্দ ও মাধুর্য্যের যোগে আপনার সীমাহীন সত্তাকে উপলব্ধি করে বলিয়া সে সার্থক। তাহার পর দিনাবসানে একটির পর একটি দল ঝরাইয়া আপনাকে নিঃশেষিত করিয়া দেয়।

মানুষও যদি বিশ্ব-প্রাণের য়োগে আপন প্রাণের সকল ঐশ্বর্য্যকে এমনি করিয়া ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে, এমনি করিয়া বিশ্বের আনন্দ ও মাধুর্য্যের মাঝখানে আপনার আনন্দ ও মাধুর্য্য বিস্তার করিতে পারে, এমনি করিয়া এই জীবনে যদি আপনার সীমাহীন সত্তাকে মুহূর্ত্তের জন্যও উপলব্ধি করিয়া লইতে পারে তবে মর্ত্ত্য-লোকে তাহার জন্ম সার্থক। এই সার্থকতা বোধে জীবনের আর সকল জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই পরিপূর্ণতা বোধে মানুষ জীবনে আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃত্যুতে কোন ক্ষোভ না রাখিয়া অবসানকে স্বীকার করিয়া লয়।

নাটকটি হইতে এই জাতীয় আরও দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

> "অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
> মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লব রাশি,
> ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুম দল,
> ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
> প্রতি পলে পলে ; দিনান্তে আমার খেলা
> সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
> শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
> খেদ রহিবে না কারো মনে।"

কবির নিকট জীবন এই স্বরূপ লইয়াই প্রতিভাত হয়। জীবনের এই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া জীবন ও জগতের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-ধ্যানের মধ্যে কবি আপনাকে নিমগ্ন করেন। বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই ছবিটিই তো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্ব প্রাণের যোগে অনন্ত কোটি রূপ নিত্য বিকাশ লাভ করিতেছে, আবার প্রাণেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। মানুষের জীবনও এমনি বিশ্ব-প্রাণের যোগে বিকাশ লাভ করিয়া আবার ওই প্রাণের মধ্যেই হারাইয়া যায়। এই যখন জগৎ ও জীবনের একমাত্র স্বরূপ তখন জীবনের সার্থকতা কোথায়, উদ্দেশ্য কি, না প্রাণকে নিঃসঙ্কোচে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া। জীবনে প্রাণের অনুভূতি ঘটে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভূতি রূপে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে তাই জীবন ভোর আস্বাদ করিয়া লওয়া, আপনার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকে বিকশিত করা, তাহার পর কোন আসক্তি না রাখিয়া মর্ত্ত্যভূমি হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাওয়া।

প্রাণতত্ত্বকে জীবনে একমাত্র তত্ত্বরূপে স্বীকার করিলে জীবনও জগতের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সেই স্বরূপটিকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন এই জীবন বোধটিকেই আদর্শ জীবন বোধরূপে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে। ওই চেতনা-লোকে অধিষ্ঠিত হইলে জীবন ও জগতের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় তাহার আরও একটি সুন্দর পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

"তোমাতে আমাতে নাথ,
সেই মতো খেলা, আজি বরষার দিনে ;
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি, যত শর যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহ ভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টি বরিষণ, কভু দীপ্ত বজ্র জ্বালা।

মায়া মৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে বাধাহীন চিরদিন।"

ইহাও আমরা জানি যে অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটে একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া এবং ওই বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়াই বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভূত হয়। বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে এই-যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রকাশ ঘটে উহা প্রাণের অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে ক্রমাগত ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করিতে থাকে। অন্তরের এই সৌন্দর্য্য-লোকটি ধীরে ধীরে এমন অপরূপতা লাভ করে, এমন অপার্থিব প্রভা বিজড়িত হইয়া যায় যে মানুষ আপনার এই ধ্যানের রূপটিকে বাহিরে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এমন এক একটি অবস্থা জীবনে আসে যখন মানুষ অনুভূতির তীব্রতায় আপন অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকটিকে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে আপনার বাহু বেষ্টনে লাভ করিবার জন্য উৎসুক, অধীর হইয়া পড়ে। এই সৌন্দর্য্য-লোকটিই তো "মায়া মৃগী"। ইহার প্রতিষ্ঠা বাহিরে কোথাও নাই, ইহা সম্পূর্ণ মনোময়, প্রাণের বোধ আশ্রয় করিয়া ইহার প্রকাশ, প্রাণের মধ্যে ইহার মূল নিবদ্ধ।

মন কতকটা শান্ত না হইলে সৌন্দর্য্য স্পষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে না একথা সত্য, কিন্তু মানুষের মন নিয়ত বিক্ষুব্ধ। মনের মধ্যে ভাবের নিত্য উঠা-পড়া চলিতে থাকে। আর ওই সৌন্দর্য্য-লোকটিও এই বিচিত্র ভাব-তরঙ্গে নিত্য উঠা-পড়া করিতে থাকে, বিচিত্র ভাব-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। সমুদ্র তরঙ্গ বক্ষে প্রভাত সূর্য্য যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তরঙ্গের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তরঙ্গ বক্ষে দুলিতে থাকে ইহাও কতকটা তেমনি।

প্রাণের বোধ আশ্রয় করিয়া যে সৌন্দর্য্য বোধের প্রকাশ এবং মনের মধ্যে তাহার যে বিচিত্র লীলা উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে তাহারই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-লোকটিকে তো বাহিরে কোথাও লাভ

করিতে পারা যায় না। তাই ওই জাতীয় চেষ্টার ভিতর দিয়া পুরুষের সমস্ত শক্তি ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

অর্জ্জুন তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকটিকে বাহিরে চিত্রাঙ্গদার উপর প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য-লোকটিও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে চিত্রাঙ্গদার অ-লোক সামান্য রূপ মাধুরী আশ্রয় করিয়া অর্জ্জুন তাই চিত্রাঙ্গদাকে বাহুবেষ্টনে লাভ করিবার জন্য চিত্রাঙ্গদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে।

এই যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-সাধনা তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয়ের উপর বলিয়া তাহার একটি বিশিষ্ট প্রেরণা হইল বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য শোভাকে একটি রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা। এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-প্রেরণা মানুষের মনকে বিশ্বমুখীন করে না, সকল বিশ্ব হইতে সংবৃত করিয়া আনিয়া একটি রূপের মধ্যে নিবদ্ধ করিতে চায়! নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের অন্তরে একটি করিয়া সৌন্দর্য্য-লোক রচনা করিয়া তাহাকেই নানা ভাবে নিয়ত সম্ভোগ করিতে চায়। এই সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষায় জীবনের আর সকল আকাঙ্ক্ষা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

"ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে।"

অন্তরে ইন্দ্রিয় ও প্রাণাশ্রয়ী এই যে সৌন্দর্য্য-লোক তাহার স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে জীবনে তাহা আদৌ ইন্দ্রিয় পিপাসা। কিন্তু ইহার ফল লাভটি কি?

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদিন এইজাতীয় সৌন্দর্য্য-সাধনাকে জীবনে একান্তরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, ইহার ভিতর দিয়া তিনি একদিন যে ফললাভ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন এক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদার নিকট সেই ফল লাভের কথাই বলিয়াছে।

বিশ্ব-সৌন্দর্য্য তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিয়া (এই সঞ্চয় ক্রিয়াটাও চলে একটি বিশিষ্ট রূপাশ্রয়ী হইয়া) মানুষ অন্তরের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া তুলে, অনুভূতির তীব্রতায়, নিবিড় আসঙ্গে, আন্তর সম্ভোগের উল্লাসে চেতনার এমন এক প্রসার বোধ করে যে মানুষ ইহাকেই অনন্ত বা অসীম বলিয়া বোধ করে। এই সৌন্দর্য্য-লোক মানবাত্মার স্থলাভিষিক্ত হইয়া দেখা দেয়।

ইহার উন্নততর কোন সত্তা এবং কোন ফল লাভের কথা মানুষ তখন কল্পনাও করিতে পারে না। সৌন্দর্য্য-সাধনার এই যে বিশিষ্ট ফল লাভ রবীন্দ্রনাথ যে একদিন ইহাকেও লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্র-কাব্য পাঠক মাত্রেই জানেন। সেই সমস্ত উপলব্ধির সহিত অর্জ্জুনের এই বিশিষ্ট উপলব্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন
হে সুন্দরী।"

কিংবা

"সঙ্গীত যেমন ক্ষণিকের
তানে গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা। "

বিশিষ্ট রূপ মানুষের মনে উন্নততর ভাবের সঞ্চার করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা আত্মোপলব্ধি নয়, যাহাকে 'অনন্ত জীবন' 'অন্তহীন কথা' বলা যাইতে পারে।

এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-সাধনা একদিন রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বলিয়া কতদিক দিয়াই না তিনি ইহার ফল লাভ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কত ভাবেই না তিনি ইহাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার নানা রূপের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় অর্জ্জুনের বিচিত্র অধ্যাত্ম সংগ্রামের মধ্যে।

ইহার একটি উত্তর হইল জীবনকে জীবনের স্বরূপে স্বীকার করিয়া লও, কুসুমকে যেমন আমরা কুসুমরূপে স্বীকার করিয়া লই তেমনি ভাবে। কুসুমের মাধুর্য্য পরিপূর্ণ রূপে আস্বাদ কর তাহার সৌরভ বুক ভরিয়া আঘ্রাণ কর, তাহার মধু পান কর, তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হও, তাহার গভীর কোন অর্থ নিহিত কোন পরিচয় জানিবার চেষ্টা নিরর্থক শুধু নয়, সেই চেষ্টায় আর সকল ফল লাভ নষ্ট হইয়া যায়। জীবনের গভীরতর অর্থ কোথাও আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে কি জীবনটাকেই বিনষ্ট করিয়া দিয়া ?

অর্জ্জুন এমনি একটি উত্তর লাভের ভিতর দিয়া জীবনের গভীরতর আর সকল অনুপ্রেরণাকে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

"প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব প্রান্ত ভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নাম ধাম
আছে ? এর কি শুধায় কেহ পরিচয় ?"

কিন্তু এই জাতীয় জীবন-দর্শনে (যদি আদৌ ইহা কোন জীবন-দর্শন হয়), অর্থাৎ যে সাক্ষাৎকার মানুষের গভীরতর আর সকল প্রেরণা নিরুদ্ধ করিয়া কেবল সৌন্দর্য্য-সম্ভোগকেই একান্ত করিয়া তুলে তাহাতে মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটে না। মানুষ এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া গভীরতর অধ্যাত্ম-প্রেরণাগুলিকে দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-ধ্যান মনুষ্য সত্তার বহিরঙ্গিক অনুপ্রেরণা বলিয়া যেমন তেমনি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল, বিনাশী বলিয়া মন অশান্ত হইয়া শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে; মন তখন স্থায়ী কোন বোধের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সৌন্দর্য্যবোধকে জাগ্রত রাখিতে তাহাকে অটুট করিয়া রাখিতে এবং উহাকেই জীবনে সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতে অর্জ্জুন কত-না-চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ব্যর্থ হইয়া ওই সৌন্দর্য্য-ধ্যান পরিহার করিয়াছে। অর্জ্জুন বলিয়াছে,—

"তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি মানি।"

অর্জ্জুনকে পরিশেষে ইহা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে প্রকৃতি ও নারীর যৌবন-লাবণ্য একান্ত ক্ষণিক, শুধু ক্ষণিক বলিয়া নয় জীবনে উহাকে স্থায়ীরূপে লাভ করিবার যে-কোন প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। সৌন্দর্য্যবোধ যে মানসিক অবস্থা সঞ্জাত তাহা সত্তার এমনি বহিরঙ্গিক এবং এত দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যে তাহাকে যেমন স্থিরভাবে লাভ করিতে পারা যায় না, তেমনি মানুষের সামগ্রিক সত্তার তুলনায় তাহা একান্ত তুচ্ছ। তাহাতে জীবনের কতটুকু প্রয়োজন!

—"নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখন সে বন্ধন মানে নি। সে কেবল
মেঘের স্বর্ণ ছটা, গন্ধ কুসুমের
তরঙ্গের গতি।"

অর্জ্জুনের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-পিপাসা তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম যে তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয়ের উপর, এবং ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্য বোধের যে ধর্ম্ম অর্থাৎ তাহা যে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যকে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া একটি রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে চায় তাহা আমরা অর্জ্জুনের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জাতীয় প্রেরণা মনকে বিশ্বমুখীন করে না, তাহাকে বিশ্ববিমুখী করিয়া তুলে। ইন্দ্রিয় প্রেরণার ধর্ম্ম হইল ক্রম সঙ্কোচন। মানুষ আপনার গভীরতর সত্তা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিস্তৃততর সত্তার পরিচয় লাভ করে। ইন্দ্রিয়-প্রেরণা ইহার ঠিক বিপরীত। ইহা মানুষকে ক্রমাগত বহির্মুখী করিয়া মানুষের পরিচয়কে ক্রমাগত ক্ষুদ্র করিয়া আনে। এই ধর্ম্মকেই সাধারণ ভাবে বলা হয় আসক্তি। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে অর্জ্জুনের জীবনে সেই অতি প্রবল আসক্তির পরিচয় দান করা হইয়াছে। ইহাতে অর্জ্জুনের পরিচয় সর্ব্বাধিক ক্ষুদ্র।

"খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোর

সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রাম রূপিণী।"

এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-পিপাসার স্বরূপ শুধু নয়, জীবনে উহার মূল্য কতখানি, কোন্ সীমা পর্য্যন্ত জীবনে ইহাকে স্বীকার করা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহাও নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে সত্তার দুই বিপরীত প্রেরণার সন্ধান লাভ করেন। একটিকে বলা যায় আত্মিক প্রেরণা, অর্থাৎ যাহা সকল প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ বিমুখ, বিশ্বমুখান; আর একটিকে বলা যায় ইন্দ্রিয় প্রেরণা, ইহার সূক্ষ্মতম পরিণাম মন পর্য্যন্ত। আত্মিক প্রেরণা যে-কোন আদর্শ প্রেরণা আশ্রয় করিয়া লীলায়িত হোক-না-কেন, তাহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম এক। ইন্দ্রিয় প্রেরণা এক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যরূপে প্রকাশ লাভ করিলেও তাহা যে-কোন বোধ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারে, তবে তাহার ধর্ম বা স্বরূপ হইবে ব্যক্তিমুখান, বিশ্বকে পরিহার করিয়া একটি বোধের মধ্যে চরিতার্থতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। ইন্দ্রিয় ও তাহার সূক্ষ্মতর বৃত্তি প্রাণ ও মনের তত্ত্ব হইল বিয়োগ, আত্মিক প্রেরণার তত্ত্ব হইল যোগ। অর্জ্জুনের চিত্রাঙ্গদার প্রতি আকর্ষণের স্বরূপ যে কী তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না। এই আকর্ষণ তাহাকে বৃহত্তর সকল জগৎ হইতে সরাইয়া আনিয়া একটি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে সার্থকতা লাভে প্রেরণা দান করিয়াছে। এই প্রেরণা ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া আত্মিক সকল প্রেরণাকে সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এমনি দুটি সত্তার পরিচয় দান করিয়াছেন। একটি তাহার বাহিরের রূপ-লাবণ্য তাহার প্রাণ-

মনের অন্তহীন ঐশ্বর্য্য, আর একটি তাহার বৃহৎ বিশ্বে সার্থকতা লাভের জন্য কল্যাণবোধ।

সৌন্দর্য্য ও ভাব সম্ভোগে অর্জুন শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্জুনের মত যাহাদের অন্তর আত্মার ঐশ্বর্য্যে, উন্নততর জীবনবোধে পরিপূর্ণ তাহারা ইন্দ্রিয়োপভোগে দীর্ঘকাল তৃপ্ত থাকিতে পারে না, উন্নততর জীবনের প্রেরণা তাহাদের শীঘ্রই বিগত নিদ্র করিয়া তুলে। অর্জ্জুনের তাই শীঘ্রই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

বিশ্ব জগতে মহান কর্ম্মক্ষেত্রে অর্জ্জুন আপনার স্থান পুনরায় অধিকার করিতে চায়, কিন্তু ওই আকাঙ্ক্ষার সহিত এই জীবনের সম্পর্ক কি?—ইহা তো কেবল মোহময় একপ্রকার সুপ্তি। অর্জ্জুন তখন চিত্রাঙ্গদার নিকট হইতে এমন কিছু লাভ করিতে চাহিয়াছে যাহা তাহাকে মহত্তর জীবনবোধাশ্রয়ী হইতে প্রতিবন্ধকতা তো করেই না পরন্তু সহায়তাই করে। সেই বোধের নাম প্রেম। বীর্য্যবান পুরুষ নারীর নিকট এই প্রেম যাঞ্চা করে। এই প্রেম পুরুষ ও নারীর আত্মিক বন্ধনের প্রকাশ। এই প্রেমে পুরুষ ও নারী বিশ্ব যোগে আপনাদের হৃদয়ের যোগ অনুভব করে। অর্জ্জুনকে একদিন একথা বুঝিতে হইয়াছে। অর্জ্জুন আজ তাই চিত্রাঙ্গদার প্রেম লাভ করিতে চায়। এই প্রেমের বোধ একান্ত অন্তরময়, তাহার প্রতিষ্ঠা ইন্দ্রিয়ের উপর নয়, ভাবের উপর। এই ভাবোপলব্ধিতে এই ভাবৈক বোধে অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার অ-লোক সামান্য রূপ পর্য্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকের ভূমিকায় এ কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

"এ যে তার বাইরের জিনিষ। এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর। ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে পরম লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলি প্রলেপে

উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্র শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল। নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয় অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।"

চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে আপনার অপূর্ব্ব লাবণ্য পুঞ্জিত দেহ দিয়া আপনপার্শ্বে আকর্ষণ করিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা এই জন্যই তো দেবতার নিকট রূপ যৌবন প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিল। অর্জ্জুনও এই দুর্ব্বার সৌন্দর্য্য আকর্ষণকে অস্বীকার করিতে পারে নাই, চিত্রাঙ্গদার বাহুপাশে আপনাকে ধরা দিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের যে সত্তাকে চঞ্চল করিয়াছে, এবং অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার যে সত্তাকে লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'প্রাকৃতিক' তাহাতে পুরুষ ও নারীর জৈব উদ্দেশ্য কোথাও একান্ত কাম মাত্র চরিতার্থ হয়। চিত্রাঙ্গদা তাহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দিয়া অর্জ্জুনের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছে, অর্জ্জুনও তাহার নিকট আসিয়াছে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে।

পুরুষের কেবল কামনা পাশে ধরা দিয়া নারী কোন দিন শান্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার একটি স্থূল কারণ যেমন আছে তেমনি একটি সূক্ষ্ম কারণও আছে। স্থূল কারণ এই যে এই জাতীয় পুরুষের যে একমাত্র আকর্ষণের সামগ্রী অর্থাৎ নারীর রূপযৌবন তাহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, ওই সম্পদ হারাইয়া গেলে পুরুষের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, এবং ওই অনিবার্য্য কারণে পুরুষের মন অন্য রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের কামনা স্থলকে পুরুষ তখন দুই পায়ে দলিত করিয়া চলিয়া যায়।

নারীর জীবনে পুরুষের এই বীত রাগ ও লাঞ্ছন টাই একমাত্র নয়, বড় কথাও নয়। একান্ত প্রেম শূণ্য পুরুষের নিকট নারী যে আপনার দেহভার সমর্পণ করিতে পারে না তাহার গভীরতর আধ্যাত্মিক কারণ আছে।

নর-নারীর প্রেমে যে মিলন তাহা কোনদিন সম্ভোগ মাত্র হইতে পারে না। প্রেমে আত্মিক যে সমর্পণের ব্যাকুলতা তাহা দেহের

দুয়ারে চরিতার্থতা অন্বেষণ করে। একের দেহ অন্যের নিকট রূপকত্ব লাভ করে, অর্থাৎ তাহা হয় আত্মার প্রতীক, একের দেহ অন্যের নিকট সেইজন্য পূজার উপকরণ মাত্রে পরিণত হয়।

দেহ সম্ভোগের যে অগ্নি তাহা যদি যজ্ঞাগ্নি না হয়, অর্থাৎ তাহা যদি আত্মিক মিলনের প্রতীক না হয় তবে ওই আগুনে পুরুষ ও নারী উভয়েই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। নারীর ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি সত্য। নারীর নিকট দেহের মূল্য এতখানি। নারী প্রেমের একটি বৈশিষ্ট্য হইল তাহা 'রূপ'কে বা রূপককে আশ্রয় করিয়া সঞ্জীবিত হয়। নির্ব্বিশেষ প্রেমের সাধনা নারীর জীবনে কোথাও সত্য হইলেও তাহা নারীর স্বভাব অনুকূল নয়। তাই নারী আত্মার আশ্রয় স্থল রূপে দেহের শুচিতা অমন করিয়া রক্ষা করে তাই তাহার অমন নিত্য মার্জ্জনা। তাহার প্রেমের পূজায় দেহ-মন প্রস্ফুটিত কুসুম ভারকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়া নারী একদিন ধন্য হয়।

অর্জ্জুনকে যে-লোকে চিত্রাঙ্গদা আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়ের ধর্ম্ম লাঞ্ছিত হয়। অর্জ্জুনের ক্ষেত্রে তাহা তাই নিছক কামোপভোগের বাসনা। প্রেম শূন্য পুরুষের বাহুপাশে বাঁধা পড়িয়া চিত্রাঙ্গদার যে ইহকাল পরকালের সকল ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুনকে আকর্ষণ করিয়াই চিত্রাঙ্গদা একথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা তাই অর্জ্জুনকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

"কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত। মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নবনী নিন্দিত বাহু পাশে সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছ আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল

প্রেমের মর্য্যাদা ? কোথাও রহিল পড়ে
নারীর সম্মান ?”

কিংবা—

“আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়
কোন দেবের ছলনা। যাও যাও ফিরে
যাও ফিরে যাও ধীরে। মিথ্যারে করো না
উপাসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে।”

অর্জ্জুনের উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রেরণাকে চিত্রাঙ্গদা সংযত করিতে পারে নাই, ওই স্রোতে পরিশেষে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। এই আত্ম সমর্পণের ফলে অর্জ্জুন যেমন চিত্রাঙ্গদাও তেমনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে।

প্রেম বোধে স্খলন আছে। তাহাতে পুরুষ ও নারী স্খলিত হইলেও আবার আপনাদের চরিত্র মহিমায় যতই উন্নত হইতে উন্নততর লোক লাভ করিতে থাকে, চিত্ত যতই পরিশুদ্ধ হয় ততই ওই বোধটা বিনষ্ট হয় না ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করিতে থাকে, ততই উহা বিশ্বমুখী হইয়া যায়। প্রবৃত্তি তখন বন্ধন না হইয়া মুক্তি সাধনায় সহায়তা করে, আত্মার ঐশ্বর্য্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে পঞ্চপ্রদীপরূপে পরিণত করে। এই সাধনায় প্রবৃত্তি-চেতনা হইতে সর্ব্বোত্তম আত্মোবোধ পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই একটি পরিপূর্ণ ছন্দশ্রী লাভ করে।

নর-নারীর সাধনা এই সামঞ্জস্য লাভের সাধনা। মানুষের সাধনা প্রবৃত্তিকে জয় করা, অস্বীকার করা বা গীতোক্ত নিয়ন্ত্রণ করাও নয়, মানুষের সাধনা প্রবৃত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে আত্মবোধ মুখীন করিয়া তোলা। আত্মার অধিষ্ঠান ভূমি যে এই দেহ, আত্মা দেহের প্রত্যেকটি বোধ আশ্রয় করিয়া যে লালায়িত হয় এই বোধটিকে সার্থক করিয়া তোলা।

নর নারীর সত্তাকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়া, দুইয়ের মধ্যে

চিরন্তন বিরোধ স্বীকার করিয়া লইবার ফলে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিয়াছে।

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা একবার অনাত্ম লোকে স্খলিত হইয়াছে, একবার আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেহের গ্লানিবোধ (সমাজ, ধর্ম্ম ও সংস্কারের সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত নিছক কামোপভোগ) আত্মবোধে, গীতায় যাহাকে ব্রহ্মস্থিতি বলিয়াছে তাহা না হইলেও, কোন অত্যুচ্চ নৈতিক বা আদর্শ প্রেরণায় পুরুষ ওই গ্লানিবোধ কোন পরিণামে যদি জয় করিয়া উঠিতে পারেও নারীর পক্ষে এই গ্লানিবোধ জয় করিয়া উঠা যে একপ্রকার অসাধ্য তাহা বলা যাইতে পারে। চিত্রাঙ্গদা তাহার একবর্ষব্যাপী জীবন পর্য্যায়ের গ্লানি কেমন করিয়া কোন বোধে ভুলিতে পারিবে। অর্জ্জুনের প্রেম শূন্যতা সম্পর্কে চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বদাই সচেতন। চিত্রাঙ্গদার মধ্যেও প্রেম কোথায়! সেও তো অর্জ্জুনকে আপনার রূপ-যৌবন দিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। উভয়ের জৈব-সম্পর্ক কোন একটা বোধের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়।

দেহের অশুচিতা বোধের জন্য নারীর অন্তরে যে নিত্য গ্লানি অনিবার্য্য রূপে জাগে চিত্রাঙ্গদার মধ্যেও সেই গ্লানি বোধ জাগ্রত হইয়াছে দেখিতে পাই—

"বিদ্যুৎ বেদনা সম হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা তীর্থ
বাসর শয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন পাপ
নর-লোকে কে পেয়েছে আর।"

এই সর্ব্ববন্ধন মুক্ত কামোপভোগে দুটি বিক্রিয়া দেখা দিতে পারে (অবশ্য বিনষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলে)। প্রথমতঃ পুরুষ উন্নততর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ওই জীবন-পর্য্যায়কে সম্পূর্ণ রূপে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই কাম-পঙ্কের মধ্যে প্রেম-পদ্ম ফুটিতে পারে।

অর্জ্জুনের মধ্যে কি পরিশেষে এই প্রেম উপজাত হইয়াছে (ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি)? তাহা নহে, অর্জ্জুন এক উন্নততর জীবন বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই জীবন-পর্য্যায়কে নিঃশেষে পরিহার করিয়াছে। ওই জীবন-পর্য্যায়ের গ্লানিকে অর্জ্জুন হয়ত এমনি করিয়া একদিন ভুলিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অত্যুচ্চ আদর্শ-প্রেরণায় নারী কোন দিন দেহের গ্লানি বিস্মৃত হইতে পারে না। তাহার অভিশাপ ভারে নারী চিরকালের জন্য বিকৃত হইয়া যায়। নারীর জীবনে কামোপভোগে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রেমকে সত্য হইতেই হইবে। নারীর জীবনে প্রেম শূন্য ও প্রেমপূর্ণ ইন্দ্রিয় সেবা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। নারীর জীবনে এই দ্বিধা করণ অসম্ভব। একটা অনাচারই আর একটা প্রেম। চিত্রাঙ্গদার একটা জীবন-পর্য্যায় ভ্রষ্টতা, আর একটা জীবন-পর্য্যায় তাহার অভিশাপ ভার বহন। অমন করিয়া সত্তার দ্বিধা করণে নারীর ওই জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কোন প্রকারেই সার্থক হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয় এবং তদাশ্রয়ী সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রেরণা একটা জীবন পর্য্যায়ে শুধু সত্য নয় (রবীন্দ্রনাথ এই পর্য্যায়ে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন) তাহা জীবনের সকল পর্য্যায়েই সত্য। মানুষ যতই উন্নততর চেতনা লাভ করিতে থাকে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ততই গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে, ততই তাহার স্বরূপগত পার্থক্য দেখা দেয়। চেতনার এমন এক পরিণাম আছে যখন মানুষ বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে অপরূপকে প্রত্যক্ষ করে। ইন্দ্রিয় তখন হয় আত্মার লীলা স্থল। কামই তখন পূজা স্বরূপতা লাভ করে।

মানুষের মধ্যে যে সকল নিম্নতর প্রেরণা এবং এই সমস্ত নিম্নতর প্রেরণা সঞ্চার করিতে জাগ্রত করিয়া রাখিতে বিশ্বে যে সমস্ত উপকরণ খ্রীষ্টধর্ম্মের শয়তান সেই সমস্ত কিছুর প্রতীক।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার জীবনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন যে জীবন ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসতের নিয়ত সংগ্রামের প্রকাশ। ভাল বোধ বলিতে তিনি সেই বোধটির কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যাহা মানুষের মধ্যে উন্নততর বোধ, তীব্র নৈতিক প্রেরণা, মহৎ আদর্শ ও ভাব সঞ্চার করে। ইহার বিপরীত যে-কোন প্রেরণাকে মন্দ বলা হয়।

জীবন ও জগৎ জুড়িয়া ভালো ও মন্দের এই নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে। ইহাই যদি জীবনের স্বরূপ হয় তবে জীবনের লক্ষ্য কি, পরমার্থ কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়। খ্রীষ্টান শাস্ত্রের মত শাস্ত্র মাত্রেই কোথাও প্রত্যক্ষে কোথাও বা পরোক্ষে দেহ বা শয়তানকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া (এই শয়তানের বিচিত্র সংজ্ঞা এবং তাহাকে জয় করিয়া উঠিবার বিচিত্র চেষ্টার ভিতর দিয়া যে এক একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে।) উঠিবার কথা বলা হইয়াছে।

মন পর্য্যন্ত দেহকে জয় করিয়া উঠিতে মানুষকে পরিণামে মন ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। শয়তানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা যে কোথাও করা হয় নাই তাহা নহে, তবে তাহাকে ঠিক সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা বলে না, তাহাকে ভুলাইয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য কিছু দিয়া আপনার পরমার্থ সিদ্ধি করিয়া লইবার চেষ্টা বলা যাইতে পারে। শত্রুতাটা কোথাও প্রকাশ্য কোথাও বা সংগোপনে ভুলাইয়া মিত্রের বেশ ধরিয়া। কিন্তু মনোভাব সর্ব্বত্র একই। দেহ বা শয়তানের ক্রুশ বিদ্ধতার কথা সর্ব্বত্রই কোন-না-কোন ভাবে বলা হইয়াছে। এই ক্রুশ বিদ্ধ দেহের জয়গান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে সর্ব্বত্রই।

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে আমরা এই বিশ্লিষ্ট সত্তার সংগ্রামই প্রত্যক্ষ করি। সেখানে একটি সত্তা আর একটি সত্তাকে জয় করিয়া

উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে যে চিত্রাঙ্গদার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সত্তার এই চিরন্তন বিরোধ ও সংগ্রামকে একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইলেও উভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগের রহস্য রহিয়াছে তাহা আপনার বোধির সহায়তায় উপলব্ধি করেন। এই উভয় সত্তাকে স্বীকার করিয়া লইয়া উভয়ের সেই যোগের রহস্য অনুসন্ধানের চেষ্টা তিনি তাই সমগ্র জীবন ধরিয়া করিয়াছেন। এই নিঃসংশয় বোধ না থাকিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি অমন মরণান্তিক সংগ্রাম কিছুতেই করিতে পারিতেন না, চিরাচরিত ভাবে কোন একটিকে মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

এই সংগ্রামের বিচিত্র রূপের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে। এই সংগ্রামে কোথাও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কোথাও বা প্রাণ তত্ত্ব ঐকান্তিকতা লাভ করিয়াছে। কোথাও বা এই উভয় তত্ত্বই সমান শক্তি লইয়া সমান ঐকান্তিকতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, আর বৈজ্ঞানিক যেমন করিয়া স্থির দৃষ্টি মেলিয়া গবেষণাগারে তাঁহার রসায়ন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন কবি তেমনি স্থির দৃষ্টি মেলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পূর্ণ জীবনাদর্শ বা মানব ধর্ম্মে শয়তানের আর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যাইবে। সমগ্র ধর্ম্ম ও দর্শন ভবিষ্যতে ওই সামঞ্জস্য বা অন্তর্ভুক্তির মধ্যে পূর্ণ পরিণাম লাভ করিবে। বর্ত্তমান যুগে কোন মহামানবের জীবনে এই পরিণত সাধন রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারা গিয়াছে কি-না আমি তাহা বলিতে চাহি না, তবে সেই পূর্ণ আদর্শের জন্য সমগ্র মনুষ্য সমাজ যে অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

জার্ম্মান মনোবিদ্যাবিদ্ ও দার্শনিক Jung এর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করিতে গিয়া Hans Schaer একস্থলে যে মন্তব্য করেন আমি নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"It is a pet idea of Jung's that the Christian Trinity

is really an imperfect Quaternity. The fourth person is Satan, who has so far been denied by our rigid adherence to the trinitarian dogma—of which the result is that the wholeness of personality has remained a closed book to the Western Christendom. The pact with Mephistopheles in Goethe's Faust is symbolic, for Jung, of the spiritual problem of modern man, which is to make a Quaternity of the Trinity, or, in psychological terms, to become whole by recognizing a psychic complex that has so for been denied. To day many persons are struggling for the wholeness." (Religion and the cure of souls in Jung's psychology. Hans Schaer).

সেখানে এমন কথাও বলা হইয়া থাকে, যে জীবনে যদি সঙ্ঘাত না থাকে, সংগ্রাম যদি শেষ হইয়া যায় তবে জীবন তো চিরকালের জন্য গতিহীন হইয়া পড়িবে। তাহাই তো এক প্রকার মৃত্যু। তাহা রূপ শূন্য বৈচিত্র্যহীন এক প্রকার অস্তিত্ব মাত্র। ইহাকেই না রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন অস্তিত্বের মহৎ শোক। ('অস্তিত্বের এতবড় শোক…')।

কিন্তু এ সংশয় অমূলক। এই পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনের সমস্যার সমাধান ঘটিলে জীবনে যে মুক্তির আস্বাদ ঘটিবে তাহাতে জীবন বিকাশের একটা পর্য্যায়ের নিঃশেষ অবসান হইবে মাত্র। নূতনতর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন নূতন নাটক যে অভিনীত হইবে না, তাহা এই সঙ্ঘাতময় জীবনে মানুষ কেমন করিয়া বলিতে পারিবে। সেই মুক্ত জীবন-লীলার কোন স্বরূপ উপলব্ধি বর্ত্তমান জীবনে অসম্ভব।

জীবনের নিম্নতর বিচিত্র প্রেরণাকে একত্রীভূত করিয়া মহাকবি মিল্টন তাঁহার শয়তান চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন, মহাকবি গেটের মেফিস্টোফিলিশ চরিত্র সৃষ্টি, মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকে ইহার কত-না পরিচয় আছে। কিন্তু মানুষের এই নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলিকে এমন একান্ত করিয়া বিশিষ্ট করিয়া দেখিবার চেষ্টা ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও নাই। অথচ আশ্চর্য্য ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের মত জীবন ও জগৎকে

এমন অ-সত্য বলিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা পাশ্চাত্যে নাই। জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিবার এই চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি এই শ্রদ্ধায় (যাহার ফলে এমন শয়তান চরিত্র সৃষ্টি কোথাও সার্থক হয় নাই) বিস্মিত হইতে হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেহ বা শয়তানের প্রতি বিদ্বেষ প্রবল বলিয়া তাহার প্রতি আকর্ষণও বোধহয় সেই জন্যই এমন একান্ত। দেহের সৌন্দর্য্য ও রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে তাহারা দেহকে যে ভাবে তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতীয় তান্ত্রিকও একজন শিশু মাত্র। অথচ দেহের প্রতি কি প্রবল বিতৃষ্ণা, কি ধিক্কার, কি মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। ইহা যেন তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছে। এমন গৌরব ও লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যে একান্ত সুলভ।

খ্রীষ্টধর্ম্মে শয়তান চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কোন পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যাইবে না। রামায়ণ মহাভারতের রাবণ দুর্য্যোধনও নয়। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা মাত্রই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কাহার নাম করিব, ঘরে-বাইরের সন্দীপ, তপতীর রাজা ? —ইহাদের নামোল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

তাই বলিতে চাহিয়াছিলাম সাহিত্যে জীবনের প্রতি এই শ্রদ্ধার পশ্চাতে এমনি একটি বোধি ক্রিয়া করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে এমনি একটি বোধি সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিয়াছে। তবে এই সামঞ্জস্য সাধনে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অবশ্য বিচার সাপেক্ষ। আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা উল্লেখ করিব।

রাজা

(১)

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রতীক সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করিয়া লইলে সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে তাই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতেছি।

মনস্তাত্ত্বিকগণ মানব মনের মোটামুটি তিনটি পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে মনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—একটি সচেতন মন, অপরটি অবচেতন বা নির্জ্জান মন। নির্জ্জান বা অবচেতন মনকে তাঁহারা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটিকে তাঁহারা বলিয়াছেন ব্যষ্টি অবচেতনা এবং অপরটিকে তাঁহারা বলিয়াছেন গোষ্ঠী বা সমষ্টি অবচেতনা। ব্যক্তির ইহ জীবনেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে আহৃত যে সমস্ত উপলব্ধি বিস্মৃতির তলে লীন হইয়া গিয়াছে, তাহাই ব্যক্তির ব্যষ্টি অবচেতনা। মানুষ ব্যক্তিগত কোন মানুষের নয় সাধারণ মানব সমাজের ঐতিহাসিক ভাব-ভাবনার যে উত্তরাধিকার লাভ করে সেই উত্তরাধিকার সত্তাটিকে বলা হয় গোষ্ঠী বা সমষ্টি অবচেতনা ; কারণ বর্ত্তমান মনুষ্য-চেতনা বিচ্ছিন্ন আকস্মিক কোন প্রকাশ তো নয়, তাহা বিস্মৃত কোন্ সুদূর অতীত যুগের মনুষ্য-চেতনার ভিতর দিয়া ধীরে বর্ত্তমান চেতনা রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। অন্তহীন অতীত জীবন-পর্য্যায় হইতে অন্তহীন ভবিষ্যত জীবনের দিকে মনুষ্য-চেতনা ক্রম প্রসারিত।

চেতনার অভিব্যক্তির ক্রমে মনের এই তিনটি পর্য্যায়ই ক্রমিক সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। বস্তুর যোগে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমরা যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন জ্ঞানলাভ করিতেছি, আমাদের মন সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকে একটি ভাব-সূত্রে গ্রথিত করিতেছে। এইরূপে আমাদের ভাবের জগৎও সমৃদ্ধ হইতেছে। আবার ভাবের যোগে ভাবের সহিত ভাবের সঙ্ঘাতে ভাব সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সচেতন

ও অবচেতন যে জ্ঞানই হোক-না কেন, তাহার মূল আশ্রয় দেখিতেছি বস্তুজগৎ ও ইন্দ্রিয়।

কিন্তু এই সমষ্টি বা গোষ্ঠী অবচেতনার উপরেও একটি চেতনা-লোক আছে তাহাকে বলা যায় অতি-মানস-চেতনা, তাহা নির্ব্বিশেষ ও অরূপ। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মানুষের অধ্যাত্ম জগৎ।

আত্মার অনুপ্রেরণা মানুষের সমষ্টি অবচেতন-লোক আশ্রয় করিয়া আরও নিম্নে ব্যষ্টি অবচেতন-লোক আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করে। ইহা অজ্ঞাতে কোথাও বা সচেতন অবস্থায় মানুষের জীবনে সচেতন মানস-লোকে প্রকাশ লাভ করিয়া তাহাকে মূঢ় বিহ্বল করিয়া দেয়। কারণ সচেতন মনোজগতের সহিত এই জগতের রীতি-নীতির কোথাও কোন মিল নাই। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই। যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই যে বস্তুজগৎ ও ইন্দ্রিয় চেতনা আশ্রয় করিয়া সচেতন ও অবচেতন মন যেমন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে, আত্মার প্রেরণাও তেমনি বিপরীত দিক হইতে অবচেতন ও সচেতন মনের নিত্য সমৃদ্ধি ও প্রসারতা ঘটাইতেছে। চূড়ান্তবাদীরা কেহ একমাত্র বস্তু ও ইন্দ্রিয়কে কেহ বা একমাত্র আত্মাকে জ্ঞানের আশ্রয়-স্থল বলিয়া বিশ্বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথ কোন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন পূর্ণ মানুষ একই জন্মে তিনটি চেতনা লোকে জন্মগ্রহণ করেন। এই মানুষকে তিনি বলিয়াছেন ত্রিজ। একান্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ যে মানুষ সে মানুষ সর্ব্বাধিক ক্ষুদ্র। ইহা মানুষের প্রথম চেতনা-লোক। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-ভাবনা, তাহার অতীত-ভবিষ্যতকে মানুষ যখন ব্যক্তি-স্বার্থ ছাড়াইয়া একান্ত আপনার রূপে বোধ করে, তাহার দ্বারাই যখন তাহার সকল প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত হয় তখন মানুষ হয় দ্বিজ। ইহা মানুষের দ্বিতীয় জন্ম। মানুষের আর একটি জন্ম হইল বিশ্ব-মানব-মনে। সমগ্র বিশ্বের চিন্তাধারা তখন তাহার চিন্তাধারায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার উর্দ্ধতর চেতনায় যে বিশ্বাসী ছিলেন তাহার উল্লেখও বাহুল্য। তবে তিনি মানব মনের

ধর্ম্মকে চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে নির্ব্বিশেষ চেতনা এবং বিশ্ব-মন দুইটি চিরন্তন যুগ্ম তত্ত্ব। চেতনা-বিকাশের কোন পর্য্যায়ে এই দুই কখন এক হইয়া যাইবে না। যাহাই হোক, মানব-মনের গঠন-রূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মনস্তাত্ত্বিকগণ যে তিনটি পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই ত্রিজত্ববাদের মিল রহিয়াছে দেখিতে পাই।

উর্দ্ধতর চেতনা-লাভের জন্য চিরকাল মানুষ সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল ধরিয়া এই সংগ্রাম করিবে। এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাহা গভীর হইতে গভীরতর, বিরাট হইতে বিরাটতর হইয়া উঠিতেছে।

ব্যষ্টি জীবনে শক্তি বা চেতনাকে উর্দ্ধায়িত করিবার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া মানুষ তাহার নিম্নতর প্রেরণাকে উর্দ্ধায়িত করিতে সমর্থ হয় সেই প্রক্রিয়াকে সিম্বল বা প্রতীক বলা যাইতে পারে। উর্দ্ধতর চেতনার সহিত ইহার ঠিক অব্যবহিত নিম্নতর প্রেরণার অলৌকিক সামঞ্জস্যের ফলে এই প্রতীকের উদ্ভব ঘটে। আর কোন উপায়ে তাহা সম্ভব হয় না বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন চিন্তার সহায়তায় এই দ্বন্দ্ব জয় করিয়া উঠা অসম্ভব। মানুষ যতই উন্নততর চেতনা লাভ করে ততই এই প্রতীকও ভিন্ন স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নব-লব্ধ চেতনার সহিত নিম্নতর সকল চেতনা-লোকের সামঞ্জস্য এই প্রতীকের মধ্যে ঘটে বলিয়া প্রতীকের স্বরূপগত পরিবর্ত্তন ঘটিতে বাধ্য। প্রতীকগুলি হইল উর্দ্ধতর চেতনা লাভের পথে বা অধ্যাত্ম-চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এক একটি পথ নির্দ্দেশক স্বরূপ। এই প্রতীকের চিহ্ন-পথ ধরিয়া ব্যক্তির জীবনে চেতনার প্রসারতা পরিমাপ করা তাই দুঃসাধ্য নয়।

ব্যষ্টির জীবনে একথা যেমন সত্য সমষ্টির জীবনেও একথা তেমনি সত্য। পৌরাণিক দেব-দেবীগুলি সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম সংগ্রামের এইরূপ প্রতীক। প্রতীকের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার অনুক্রম বিচার-

করিয়া কিংবা একই প্রতীকের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার অনুক্রম অনুসরণ করিয়া সাধনার ক্রম-প্রসার নিরূপণ সম্ভব।

একথাও সত্য যে উর্দ্ধতর জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা সচেতন মানস-লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত না হইলেও সমরূপ যে নয় তাহা বলা যাইতে পারে। জীবনে উর্দ্ধতর জগতের যে বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক, বিপর্য্যয়কর, অভিভূতকারী, কোথাও একান্ত অদ্ভুত ও ভীতিপ্রদ উপলব্ধি ঘটে সেই উপলব্ধিগুলিকে প্রকাশ করিতে মানুষ তাই নানা প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে। অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সহিত প্রতীক অনিবার্য্যরূপে মনের মধ্যে জন্মলাভ করে। ধর্ম্মজগতে বা অধ্যাত্ম জগতে একথা যেমন সত্য, যে-কোন সৃষ্টির মত সাহিত্য ক্ষেত্রেও একথা তেমনি সত্য। পার্থক্য কেবল প্রকাশ রূপের, ভাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

এক্ষেত্রে কেবল এইটুকুই বুঝিলে চলিবে যে সচেতন মনের উর্দ্ধতর জগতের কোন উপলব্ধির সহিত সচেতন মনের সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস এবং এইরূপে চেতনাকে ক্রম প্রসারিত করিবার চেষ্টার সহিত প্রতীক তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

বলিয়াছি, বিপরীত, বিরুদ্ধ বা অসম চেতনার সামঞ্জস্য বোধের ভিতর দিয়া প্রতীক জন্মলাভ করে। এইরূপে একটি তত্ত্ব অনিবার্য্য-রূপে স্বীকৃত হইয়া পড়ে যে প্রতীকের এমন একটি পরিণাম আছে যে পরিণামে বিশ্ব ও মানবের বিরুদ্ধ সমস্ত চেতনা, উর্দ্ধতম হইতে নিম্নতম সকল বোধ সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়। ইহাকেই বলা যায় ঈশ্বরীয় তত্ত্ব। এই সম্পর্কে Jung-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঈশ্বর কেবল অভিব্যক্তি বৃক্ষের সর্ব্বশেষ পুষ্পরূপ, অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য মুক্তি (যাঁহার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি অবসান লাভ করে) রূপ, পরিণাম ও উদ্দেশ্য রূপ দিব্য আলোক মাত্র নহেন, তিনি প্রকৃতির কৃষ্ণতম গভীরতা সমূহের মুখ্যতম আদি কারণ স্বরূপও। এই ভয়ঙ্কর বিরোধাভাসের সহিত গভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্যের স্বারূপ্য আছে। ইহা একই সত্তার মধ্যে আবশ্যকীয় বৈপরীত্য স্বীকার করে। সত্তার গভীরতম প্রকৃতির মধ্যে বিপরীতের সামঞ্জস্য আছে। এই সত্তাকে

বিজ্ঞান শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছে, কারণ ইহা বৈপরীত্যের মধ্যবর্ত্তী সচল সাম্য। এইজন্য ঈশ্বরীয় উপলব্ধি মাত্রেই আশ্চর্য্যজনক ভাবে বিরোধাভাস পূর্ণ এবং ইহা মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এতদূর পরিতৃপ্ত করে, যে কোন যুক্তি-বিজ্ঞান তাহা যতই যুক্তিযুক্ত হোক-না-কেন, ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে গভীরতম চিন্তাও এই আন্তর উপলব্ধির মূল বিষয়ের অধিকতর উপযোগী কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই।"

প্রতীক সম্পর্কে পরিশেষে Jungএর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। এই সম্পর্কে তুলনা মূলক বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, তবে তাহা যথার্থ সাহিত্য আলোচনার বিষয়ভুক্ত নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের রস উপলব্ধি করিতে ভূমিকা স্বরূপ Jungএর এই কয়েকটি উক্তিই যথেষ্ট।

"যে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া শক্তি রূপান্তরিত হয় তাহাকেই বলে প্রতীক।"

"আমাদের প্রকাশ শক্তি তখন অন্য উপায় অনুসন্ধান করে: এইরূপে প্রতীকের সৃষ্টি। প্রতীক বলিতে আমি রূপক বা নিছক কোন চিহ্ন বুঝি না, ইহা পরন্তু একটি মূর্ত্তি। ইহা অধ্যাত্ম চেতনার অস্পষ্ট গোচর প্রকৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সর্ব্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়। প্রতীক কখন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ অথবা ব্যাখ্যা করে না, ইহা আপনাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের উপলব্ধির বহির্ভূত কোন জগতের অন্তর্ভুক্ত তমসাবৃত দিব্য অর্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। ইহাকে আমাদের প্রচলিত ভাষায় সম্যক রূপে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। যে অধ্যাত্ম-চেতনাকে একটি প্রত্যয়ের মধ্যে রূপায়িত করিতে পারা যায়, তাহা আমাদের অহং-বোধের সীমার মধ্যবর্ত্তী মানসিক গূঢ়ৈষা মাত্র। ইহা কিছুই আনয়ন করিবে না, আমরা ইহার উপর যাহা আরোপ করিয়াছি তাহার অতিরিক্ত ইহা কিছুই লাভ করিবে না। যে অধ্যাত্ম-চেতনা আপনাকে প্রকাশ করিতে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা

এমন একটি মানসিক গূঢ়েষা যাহার মধ্যে অন্তহীন সম্ভাবনার সৃষ্টি-বীজ নিহিত থাকে।”

“প্রতীক আমাদের পরবর্ত্তী চিন্তা ও অনুভূতির চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি রূপে বিরাজ করে। ইহার ভিতর দিয়া ইহা নিশ্চিত-রূপে প্রমাণিত হয় যে প্রতীক সৃষ্টি অধিকতর উদ্দীপনাময়, ইহা যেন আমাদের অনেক গভীরে টানিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার ফলে ইহার ভিতর দিয়া আমরা কদাচিৎ নিছক সৌন্দর্য্যতত্ত্বাশ্রয়ী আনন্দ উপভোগ করিতে পারি।”

(২)

আমাদের মন ও বুদ্ধির অতীত একটি সীমাহীন জগৎ আছে সিম্বলিক বা রূপক নাটকের অর্থ হইল তাহারই কিছু আভাস দান, তাহারই কিছু রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে রূপক নাটকে কয়েকটি ধর্ম্ম অনিবার্য্য রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। নাটকে যে জগতের সন্ধান লাভের চেষ্টা আছে তাহা যুক্তি-বিচার ও কার্য্য-কারণ তত্ত্বের উর্দ্ধতর জগৎ। মনের যে বিশিষ্ট কয়েকটি ধর্ম্ম আছে তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ধর্ম্ম হইল কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাবিকারের প্রতি প্রবণতা। মনের এই ধর্ম্মটিকে ভুলাইয়া দিবার তাহাকে আচ্ছন্ন করিবার একটি সচেতন প্রয়াস তাই নাটকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কারণ মনের এই ক্রিয়াটিকে নিরুদ্ধ না করিতে পারিলে নাটকের মূল যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ উর্দ্ধতর জগতের আভাস দানের চেষ্টা ব্যাহত হয়। এই এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাট্যকারকে এই জাতীয় নাটকে সুপরিকল্পিত কাহিনী ও ঘটনা-বিন্যাস করিবার চেষ্টা যতদূর সম্ভব পরিহার করিতে হয়। আমাদের মনটাই আশ্রয় লাভের আশায় এমনি এক একটি কাহিনী আশ্রয় না করিয়া পারে না। কাহিনীর রস যতদূর সিদ্ধ হয় রূপক নাটকের রস যে ততদূর ক্ষুণ্ণ হয় তাহা বলা যাইতে পারে। ইহার বিপরীতটা অবশ্য সকল সময় সত্য হয় না। মনের যে অবস্থায় উর্দ্ধতর জগতের আভাস

আসিয়া পৌঁছায় তাহা শান্ত, তন্ময়, অতিমাত্র স্পর্শ কাতর। অতিরিক্ত ঘটনা বাহুল্যে ও সঙ্ঘাতে তন্ময়তা লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। এক কথায় মনের ধর্ম্মটাকে বাস্তব মুখীন না করিয়া তাহাকে নানা কৌশলে বাস্তববিমুখীন করিয়া তুলিতে হয়।

জার্ম্মান মহাকবি গেটের ফাউস্টের উল্লেখ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। ইহাতে এই বিষয়টি কতকটা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারা যাইবে।

ফাউস্টের প্রথম খণ্ডে একটি সুপরিকল্পিত কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে যে বিচার বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা মানবিক বোধের কার্য্য-কারণ তত্ত্বের সহিত অনিবার্য্যভাবে বিজড়িত।

ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ কোন কাহিনী পরিকল্পনা নাই; কোন কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাও নাই। তাহাতে আছে অপরোক্ষ অনু-ভূতির কতকগুলি বিদ্যুচ্চমক, অলৌকিক রূপ সাক্ষাৎকারের পর সাক্ষাৎকার অন্তহীন। ফাউস্টের প্রথম খণ্ডে কবি মানস-লোকে সম্পূর্ণ-রূপে অধিষ্ঠিত। ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডে কবি মানস-লোকের সীমা ছাড়াইয়া উর্দ্ধ হইতে ক্রমাগত উর্দ্ধে অভিসার করিয়া চলিয়াছেন। এখানে যে যোগসূত্র তাহা কাহিনী, ঘটনা বা চরিত্র বিকাশের যোগ সূত্র নয়, সে যোগ সূত্র রহিয়াছে কোন অতীন্দ্রিয় বোধের জগতে।

এই কয়েকটি দিক হইতে রাজা নাটকটিকেও আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ রাজা নাটকটিও রূপক আশ্রয়ী। ইহার মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং রূপক নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। একদিক দিয়া বিচার করিলে রাজা নাটকে কয়েকটি ত্রুটি একান্ত হইয়া দৃষ্টি গোচর হয়।

প্রথমতঃ নাটকের ওই কাহিনী। এই কাহিনীটি সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। ইহার সহিত ঘটনা বাহুল্য বিজড়িত হইয়া এই জাতীয় নাটকে তাহা একান্ত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে। গুরুভার অর্থে নাটকে কাহিনী বা বস্তুরস একান্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রত্যেকটি ঘটনার রূপক ব্যাখ্যা হয়ত করিতে পারা যায় কিন্তু সে

ব্যাখ্যাও উর্দ্ধতর জগতের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভে কোন সহায়তা করে না। রাণী সুদর্শনা চরিত্রের ধীর আনুক্রমিক পরিণাম ধারা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যে বিচার-বোধটিকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ লৌকিক বিচার বোধ।

বিদেশী দল, নাগরিকদল, পদাতিকদল, রাজবেশীর শোভাযাত্রা, নারীদল এই সমস্ত কিছু কোন-না-কোন প্রয়োজনকে সিদ্ধ করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য্য কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাকে আরও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইহার বস্তু-ভারকে আরও লঘু করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। মনে হয় এই বস্তু-ভার সম্পর্কে নাট্যকার স্বয়ং সচেতন ছিলেন তাই তিনি ইহাকে লঘু করিয়া তুলিবার জন্য বহুল সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল সঙ্গীতের পর সঙ্গীতে, সুরের পর সুরের জাল বিস্তারে কাহিনীর বিপুল ভার কতকটা হ্রাস পাইয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উর্দ্ধলোকে বিহার করিতে পারিবে। একটি নাটকের মধ্যেই গানের সংখ্যা তাই ছাব্বিশটি। সেখানে ওই গানগুলির সার্থকতাও বিচার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ওই গানগুলিকে আশ্রয় করিয়া কবির সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া বলিতে পারা যায় রাজার মুখের গানগুলি এই দিক দিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বসন্ত-বন্দনার কয়েকটি গান গান হিসাবে যত উৎকৃষ্ট হোক তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম অনুভূতির অলৌকিক বেদনা অপেক্ষা লৌকিক বেদনাবোধের অংশটাই অধিক। ঠাকুরদা, বাউল, পাগল ও সুরঙ্গমার মুখে যে কয়েকটি গান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মাত্র কয়েকটির মধ্যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির গভীরতা লক্ষ্য করা যায়।

সমগ্র নাট্য কাহিনীর মধ্যে উর্দ্ধতর জগৎলাভের জন্য গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার এই জাতীয় নাটকের ভিতর দিয়া পাঠক চিত্তে সেই ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঠাকুরদা সম্পর্কে সুরঙ্গমা বলিয়াছে অধ্যাত্ম জগতের সকল পথই তাঁহার জানা, কিন্তু সে

অধ্যাত্ম জগতের উর্দ্ধতর সৌন্দর্য্য-লোকের কোন অপরোক্ষ অনুভূতি তাঁহার কোন সঙ্গীত কোন উক্তির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায় না। বাউল ও পাগলের সঙ্গীতের মধ্যে সেই রূপের চকিত আভাস হয়ত লাভ করা যায় কিন্তু কোন স্থির উপলব্ধি নয়। স্থির উপলব্ধি লাভের জন্য তাহারা সকলেই অধীর। ঠাকুরদাও এপারের জগতের মানুষ। বাহির অঙ্গনে সঙ্গীদের লইয়া তাঁহারও বেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে হয়ত কোন দুর্লভ মুহূর্তে চকিতে তাহার আভাস আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তাহাকে স্থায়ী-ভাবে লাভ করিতে পারেন নাই। ক্লান্ত অবসন্ন দেহভার লইয়া তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। রাণী নৈতিক বোধটিকে (অধ্যাত্ম-বোধের যাহা গোড়ার কথা) যেখানে ফিরিয়া লাভ করিয়াছেন, ত্যাগ ও বৈরাগ্য তাঁহার জীবনে যেখানে সত্য হইয়াছে সেখানে নাট্যকাহিনীরও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহার পর তিনি যে কোন্ দুর্লভ রূপের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইলেন তাহার কোন পরিচয় নাট্য কাহিনীর মধ্যে নাই।

রাজা নাটকটিকে তাই তাহার ফল পরিণামের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় তাহা নৈতিক বোধের জগৎ। এই বোধের জগৎটিকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম জগতের কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যায়। এই জগতে তাই অধ্যাত্মবোধ লাভের ব্যাকুলতা আছে কিন্তু অধ্যাত্ম পরিতৃপ্তি নাই।

(৩)

যে দিব্য সমাজের ধ্যান রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল তাহার পূর্ণাঙ্গ কোন পরিকল্পনা নয়, কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের পরিচয়ও নাটকটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা মানবীয় চেতনা বিকাশের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে দান করা একপ্রকার অসম্ভব। সমাজের সেই ধ্যান-রূপ রহিয়াছে পূর্ণ সত্তা ঈশ্বরের অন্তরে। মানুষের হৃদয়-লোক আশ্রয় করিয়া সেই রূপ-ধ্যান বহির্জগতে রূপ লাভ করিতে চায়। ঈশ্বরীয় এই ইচ্ছার প্রকাশে বাধা মানুষের অহংকার বোধ জাত বুদ্ধি।

বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ যতটুকু এই অহংকার ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছে ততটুকুই ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে। এই অভিপ্রায়ের সহিত মিশিয়া আছে মানুষের বিচিত্র মানুষী বুদ্ধির বিকার। এই অসামর্থ্য বা অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে মানুষ যে সচেতন তাহাও নহে; সেই জন্য উহা দূর করিতে মানুষী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিত্য নূতন পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ চালাইতেছে।—অর্থাৎ তাহার ওই নিত্য নূতন সমাজ-রূপের সৃষ্টি। কিন্তু ওই বুদ্ধিটাই সীমাবদ্ধ বলিয়া অসামর্থ্য বা অসম্পূর্ণতা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্ম প্রকাশ করিতেছে মাত্র।

সংস্কার তাই বাহিরে কোথাও করিয়া লাভ হইবে না সংস্কার করিতে হইবে অন্তরের মধ্যে। সে সংস্কারের স্বরূপ হইবে মানবিক বিচার ও বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া উঠা, অহংকার বোধের সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়া। মানবিক সত্তার এই রূপান্তর সাধনের ভিতর দিয়া মানুষ হইবে সম্পূর্ণ-রূপে ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় সাধনের যন্ত্র স্বরূপ। ইহার ভিতর দিয়া এই সমাজ যে পরিণামে কোন রূপ লাভ করিবে তাহার অনুমান মনুষ্য সাধ্যাতীত।

এই সমাজের যিনি নিয়ন্তা তিনি অরূপ, তিনি ঈশ্বর বা রাজা। মানুষ সম্পূর্ণরূপে এই চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই সে সমাজ গড়িয়া তুলিবে। তাই মানুষে মানুষে যেমন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেও তেমনি যে সম্পর্ক যে মিলন তাহা মুক্ত স্বরূপে পূর্ণ স্বরূপে। সে সম্পর্ক ও মিলন কোন স্বার্থ প্রণোদিত নয়। কারণ ওই বোধে ব্যক্তি স্বার্থ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। ওই স্বরূপে পার্থক্য ও ভেদের বোধটাও থাকে না।

স্বধর্ম্মের বৈচিত্র্য থাকিবে, কিন্তু সেই সকল স্বধর্ম্মের পশ্চাতে একমাত্র দিব্য-অভিপ্রায় সক্রিয় বলিয়া তাহা একে অন্যকে হেয় বা নষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবে না। আপন আপন স্বধর্ম্মের ভিতর দিয়া সকলে সম্মিলিত ভাবে এক দিব্য-পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিয়া চলিবে। এই কর্ম্ম তাই বাহিরের সকল শাসন ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। অথচ ইহা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। কারণ ইহার মূল প্রেরণা রহিয়াছে সেই একের হৃদয়ের মধ্যে। কবি শেখরের যে

গানটি ঠাকুরদা গাহিয়া শুনাইয়াছে সেই গানটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। গানটির মধ্যে সেই দিব্য-সমাজের এক প্রকার আভাস দানের চেষ্টা আছে। গানটি গভীর ভাবদ্যোতক।

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে

* * *

আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,

* * *

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে।
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্ত্তে"

আত্মনির্ভরতা ও মানসিক শক্তি যতই হ্রাস পাইতে থাকে আন্তর উপলব্ধির যতই অভাব ঘটিতে থাকে মানুষ ততই বাহিরের সংস্কার বিচিত্র বিধি-নিষেধ ও শাসন-তন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। বিপরীত দিক হইতে বলা যায় মানুষ যতই আন্তর উপলব্ধি সমৃদ্ধ হয় অন্তরের মধ্যে যতই বন্ধন মুক্তি ঘটে ততই বাহিরের উপর নির্ভরতা হ্রাস পায়। আন্তর উপলব্ধিকে বাহিরে বাস্তব রূপ দানের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিচিত্র সংস্কার জন্ম লাভ করে, (আন্তর উপলব্ধির রূপায়ন বলিয়া এই গুলি বস্তুতঃ প্রতীক স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়), বস্তুজীবনের রূপান্তরের সঙ্গে উপলব্ধির উপায়ের মধ্যেও পরিবর্ত্তন ঘটে সুতরাং সেই সঙ্গে বাহিরের সংস্কার ও বিধি নিষেধের মধ্যে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। যেখানে এই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে না পরন্তু পূর্ব্বের সংস্কারের মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের তিল মাত্র বিচ্যুতিকে সর্ব্বনাশ কর বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং তাহা লইয়া বিবাদ বিসংবাদের অন্ত থাকে না তখন বুঝিতে হইবে জাতির প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার আন্তর উপলব্ধি

নিঃশেষিত। মন যেখানে গতিশীল নিত্য নূতন সৃষ্টি ও উপলব্ধির আনন্দে পরিপূর্ণ সেখানে বাহিরের সংস্কার, আচার ও বিধি-নিষেধের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া চলে।

কিন্তু মনুষ্য-সমাজের এমন একটা পরিণাম অধ্যাত্মবাদীরা চিন্তা করেন যেখানে স্থিতি বা গতিশীল যে-কোন সংস্কার নিরর্থক হইয়া যাইবে, যেখানে বাহিরের উপর নির্ভরতা কিছুমাত্র থাকিবে না। মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে সংস্কার মুক্ত আত্মস্থিত হইয়াই দিব্য-প্রেরণা লাভ করে বলিয়া বাহিরের উপর নির্ভরতা অসম্ভব হইয়া উঠে। বিধি বা নিষেধ যাহা কিছু আসিবে তাহা ওই দিব্য-চেতনা হইতে। তাহাই একমাত্র চূড়ান্ত অলিখিত শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রই হইবে মনুষ্য-সমাজের একমাত্র নিয়ামক। ইহারই একটা আভাস এই সমস্ত উক্তির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

"প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছাবে। সামনে চলে যাও।"

কিন্তু কতকগুলি মনআছে যাহারা বাহিরের সহস্র বন্ধনের মধ্যেই একপ্রকার নির্ভরতা লাভ করে, কারণ তাহাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে নির্ভরতা বলিয়া কিছু নাই।

"ভবদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা ঘিন ঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম।"

বস্তুতঃ যাহারা বাহিরের সহস্র সংস্কার, বিধি-নিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে এবং ওইগুলিকে জীবন বলিয়া বোধ করে তাহাদের নিকট হইতে ওই আশ্রয় ছিনাইয়া লইলে কিংবা তাহাদের ওই আশ্রয়ে আঘাত করিলে সে আঘাত তাহাদের একেবারে মর্ম্মে গিয়া লাগে হৃদয় মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া যায়। তাই এই আশ্রয় রক্ষার আশায় জীবন পণ করিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করে না।

মানুষকে সমাজে রাখা যায় বাহিরে নানা বন্ধন সৃষ্টি করিয়া। উহা বাহির হইতে মনুষ্য স্বভাবের উপর অত্যাচার। তাই বন্ধন কোন

মুহূর্ত্তে কিছুমাত্র শিথিল হইলে মানুষের নানা অপরাধ বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে, সে অপরাধ ঘন মশি মাখা। যদি বন্ধনের যোগ থাকে অন্তরে, মানবিক শুদ্ধ সত্তায়, তাহারও উপরে দিব্য-চেতনায় তবে সমাজ-বিশৃঙ্খলার কোন প্রশ্ন উঠে না; বাহিরের বিধি-নিষেধ তত নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। ব্যষ্টি জীবনে একথা যেমন সত্য, সমষ্টি জীবনেও একথা তেমনি সত্য। আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই পরম যোগের সন্ধান করিতে হইবে। সেই সঙ্গে সকলের জীবনে তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। এই রূপে বাহিরের বিধি-নিষেধ ক্রমে হ্রাস পাইয়া যাইবে।

"তা ভাই রাগ করিস কেন। যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়—বাঁকা চোরা গলি সে তো গোলক ধাঁধাঁ। আমাদের রাজা বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো। রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ দেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।"

বাহিরের শাসন ও বিধি-নিষেধের প্রয়োজন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্য। সাধারণ মনুষ্য-সত্তায় এই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্য্য বলিয়া আমরা শাসন ও বিধি-নিষেধকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছি। মনুষ্য-সমাজের ইহাই যেন একমাত্র নিয়তি। অর্থাৎ তাহার অপরাধ থাকিবে, সেই সঙ্গে তাহাকে দমন করিবার জন্য বিধি-নিষেধও অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু ইহা মনুষ্য-সমাজের একমাত্র নিয়তি নয়। অর্থাৎ মনুষ্য-সত্তার সম্পূর্ণ রূপান্তর যে ঘটিবে একথা সত্য। তাহাতে এই ঊর্দ্ধতর ও নিম্নতর সত্তার সহিত দ্বন্দ্ব থাকিবে না। মানুষ এই দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠিবে। তাই প্রয়োজন ওই রূপান্তর ক্রিয়াকে দ্রুত করিয়া তোলা, সমগ্র প্রয়াসকে ওই কার্য্যে নিয়োজিত করা। বিধি-নিষেধের প্রয়োজনীয়তা সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া যাইবে। নিম্নে একটি কথোপকথন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

তাহাতে এই ভাবটিকে পরিস্ফুট করিবার সুন্দর চেষ্টা করা হইয়াছে।

"জনার্দ্দন। কিন্তু এ রাজ্যে আগা গোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

"ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হোল তোমার। নিয়মিই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী।

"জনার্দ্দন। এই দেখো-না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

"ভবদত্ত। ওহে জনার্দ্দন আসল কথাটাই তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোন গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

"জনার্দ্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোন পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্ত্তন—কিন্তু এখানে দেখো।"

(৪)

সমাজ জীবনে ও ব্যষ্টি জীবনে ঈশ্বরীয় ইচ্ছা ও বিচার কেমন করিয়া লীলায়িত হয়? বর্ত্তমান নাটকে তাহার যে পরিচয় রহিয়াছে এক্ষেত্রে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রন্থে ঈশ্বরীয় বিচারে চিরন্তন স্বর্গবাস ও চিরন্তন নরক বাসের পরিচয় লাভ করা যায়। অর্থাৎ স্খলিত জীবাত্মা এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে পারে যাহা ঈশ্বরীয় করুণার সীমা ছাড়াইয়া যায়। সে ক্ষেত্রে এমন একটি জগতের পরিকল্পনা করা হইয়াছে যাহা ঈশ্বরীয় নয়। তাহা শয়তান অধিকৃত জগৎ। শয়তান ও ঈশ্বরের জগৎ ভিন্ন।

ঔপনিষদিক জীবন-দর্শনে মানবাত্মার এমন কোন পরিণাম কল্পনা করা হয় নাই যাহা ঈশ্বরীয় বোধের সীমা ছাড়াইয়া যায়। সেইরূপ কোন জগতের অস্তিত্ব এই জীবন-দর্শনে নাই। এই জীবন-দর্শন সেই জাতীয় কোন জগতের অস্তিত্ব কল্পনাকে নাস্তিক্য বলে। এই ধর্ম্ম বলে যে তাঁহার অধিকার-লোকের বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই। মানুষের পাপের সীমা পুণ্যের সীমা যতদূর বিস্তৃত হোক-না-কেন তাঁহার জগৎকে ছড়াইয়া যায় না। তিনি সর্ব্বব্যাপ্ত, বিশ্বমূর্ত্তি। তাঁহার অধিকার লোকের মধ্যে সমস্ত কিছু বলিয়া মানবাত্মার শাশ্বত স্খলন বলিয়া কিছু নাই। মানবাত্মার গাঢ়তম তমিস্রার মধ্যেও তাঁহার করুণার বাঁশি বাজে। একদিন-না-একদিন তাহার অন্তরের মধ্যে ওই সুর ধ্বনিত হইবেই। একদিন-না-একদিন সে ওই অন্ধকার-লোক পার হইয়া আলোকে আসিয়া বাঁচিবেই।

"সুদর্শনা। না না, তিনি আসবেন না। তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন! অপরাধ তো কম করি নি।

"সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহলে তাঁকে আর দরকার নেই, তাহলে তিনি নেই।"

রাণীর জীবনে ঈশ্বরীয় করুণা ও বিচারের অভিব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় রাণীর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে দান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহারই বিশিষ্ট একটি দিক উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাণী সুদর্শনা যখন আপনারই বাসনার আগুনে রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালাইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ছুটিয়াছে তখন তাহার জীবনে ঈশ্বরের অপার করুণা নামিয়া আসিয়াছে। রাণীকে রাজা সেদিন তাহার ব্যাপ্ত অগ্নির লেলিহান শিখার মাঝখান হইতে তুলিয়া আনিয়াছে। মানুষের জীবনে এমনি অযাচিত করুণা আসে, কে যেন পাপ পঙ্ক হইতে নির্ম্মম বলে তাহাকে তুলিয়া লইয়া আসে। ঈশ্বরীয় এই জাতীয় করুণায় মানুষ সাময়িক

ভাবে হয়ত স্খলন হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনটিকে অমন করিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। অধ্যাত্ম জীবন বলিতে ঈশ্বরীয় বোধে মানুষের সমগ্র সত্তার ধীর রূপান্তর বুঝায়, একমাত্র ঈশ্বরীয় ভাবানুগত জীবন। ইহার জন্য সুদীর্ঘকালের অনুশীলন প্রয়োজন। এই অনুশীলনের ভিতর দিয়া এই দেহ-প্রাণ-মন দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। জীবনের সমগ্র প্রয়াস যে ভাব-ভূমি আশ্রয় করিয়া আছে, এই অনুশীলনে সেই ভাব-ভূমিটা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তখন জীবনের সকল কর্ম্মের একমাত্র প্রেরণা আসে ঈশ্বরীয় বোধ হইতে।

জীবনে এই ধীর অনুশীলন যদি না থাকে, দিব্য-অভিপ্রায়ের অনুকূল করিয়া যদি জীবন না গড়িয়া তোলা হয় তবে কোন অলৌকিক কারণে জীবনে দিব্য-শক্তির স্ফুরণ ঘটিলে তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর, অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়; কোথাও প্রাণ-মনের আধার পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

সুদর্শনার জীবনেও এই উপলব্ধি ঘটিয়াছিল। সুদর্শনার উক্তির মধ্যে সে পরিচয় লাভ করা যায়।

"সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার নাম স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল, ধুমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। আগেই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না—ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূল শূন্য সমুদ্রের মতো কালো,—তারই তুফানের উপর সন্ধ্যার রক্তিমা।"

রাজা ইহার কারণও রাণীকে বলিয়াছে—

"আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে তখন সইতে পারে না; আমাকে বিপদ বলে মনে ক'রে আমার কাছ থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাতে চায়।"

ঈশ্বরীয় বিচার বোধের মধ্যে একটি লৌকিকতার এবং একটি অলৌকিকতার দিক আছে। লৌকিকতার দিক বলিতে সেই দিকটির কথা বুঝাইতে চাহিয়াছি যাহাকে এমনকি মানবিক যুক্তি ও বিচার বোধ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। আর অলৌকিক দিকটি মানবিক বোধ ও বুদ্ধির বহির্ভূত সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান নাটকে সেই অলৌকিক দিকটির পরিচয় যেমন দান করিয়াছেন তেমনি উহাকে যতদূর সাধ্য লৌকিক বিচার বোধ দিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরীয় বিচারে যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা এই দিকটিকে আকস্মিক বা দৈবাৎ বলিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে। নিম্নে সুবর্ণ ও কাঞ্চীর মহারাজার একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি।

"সুবর্ণ। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যে কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

"কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

"সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বলছন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম। কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।"

অপরাধ চেষ্টার মধ্যে এমনি ত্রুটি অনিবার্য্যরূপে রহিয়া যায়। এই ত্রুটির ভিতর দিয়াই সমস্ত চেষ্টা ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া দিব্য-বিচার মানুষের স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়। তাহা এমন আশ্চর্য্য যোগাযোগের ভিতর দিয়া আপাত আকস্মিকতার ভিতর দিয়া এমন অননুভূত ভাবে সক্রিয় হইয়া ভয়ঙ্কর পরিণাম দান করে যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা যদি আবিষ্কার করিতে পারা যায়ও তাহা ফল লাভের পর। ফল লাভের পূর্ব্বে জীবনে ঈশ্বরীয় বিচারের আশ্চর্য্য গতি নির্দ্ধারণ করা কিংবা তাহার পূর্ব্ব উপলব্ধি সাধারণ

মানুষের জীবনে অসম্ভব। যাঁহারা সাধারণ মানুষ তাঁহারা কেবল সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন ও পরিশুদ্ধ বুদ্ধির সহায়তায় ইহার পূর্ব্বাভাস কতকটা লাভ করিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও তাঁহারা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার পরিচয় পান। এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অনিবার্য্য যোগ আছে বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে ভবিষ্যদ্ উক্তি সম্ভব। বস্তুতঃ জীবনে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে একটি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া। সে ক্ষেত্রে অলৌকিকত্ব বলিয়া কিছু নাই। তবে মানুষ কোথাও ইহার নির্দ্দেশ লাভ করিতে পারে কোথাও বা অসমর্থ হয়। যেখানে অসমর্থ হয় সেখানে মানুষ অলৌকিকত্ব আরোপ করে। তবে মানুষের বিচারবোধ যতই পরিশুদ্ধ হয়, যতই তাহার সকল প্রেরণা স্বার্থ বোধ শূন্য হইতে থাকে ততই তাহার নিকট ঈশ্বরীয় অভিপ্রায়ের লীলা স্পষ্ট হইতে থাকে।

ব্যক্তিও সমাজের মধ্যে একটা ভাগ আছে যাহা তাহার ধর্ম্ম বোধের দিক। আর একটি দিক আছে যাহা তাহার অধর্ম্মের দিক। এই দুই শক্তির মধ্যে নিয়ত সঙ্ঘাত চলিতেছে। এই সঙ্ঘাতের রূপ বিচিত্র। কোন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কখন একটি দিক কখন অপর দিক সমাজে অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠে। এই প্রকটত্ব লাভের মধ্যে তাই অলৌকিকত্ব কিছু নাই। ইহার রহস্য ইহার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা এই জীবন ও সমাজ বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে। মোট কথা ব্যক্তি জীবনে হোক অথবা সমাজ-জীবনে হোক ঈশ্বরীয় ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে বিশ্ব-নিয়মের ভিতর দিয়া।

এই বিচার বোধই ধর্ম্মের বোধ, আর কয়জন মানুষের সে ধর্ম্মবোধ আছে। বস্তুতঃ অধিকাংশ নর-নারী এত দূর অন্ধ যে ওই বিচারবোধটিকে বিচার বলিয়াও বোধ করিতে পারে না, কারণ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার পূর্ব্বাপর ধারা নির্ণয়ে তাহারা অসমর্থ। তাহারা তাই এই বিচারকে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বোধ করে।

যাহাদের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ধারা নির্ণয়ে কিছু সামর্থ্য আছে তাহারাও ফল লাভের পূর্ব্বে উহার আশ্চর্য্য গতি নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাহারা তাই ঈশ্বরীয় বিচারের উপর অভিযোগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। রাণী সুদর্শনা তাই সুরঙ্গমাকে বলিয়াছে—

—"তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন।"

উত্তরে সুরঙ্গমা বলিয়াছে—

"মা আমাকে কেন বলছ। আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে। উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে, কারও বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তা হলে সকলকেই নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছুই বুঝিনে জানি, সেই জন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।"

সুরঙ্গমা ঈশ্বরীয় ইচ্ছার মধ্যে আপনার ইচ্ছাকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাই তাহার মধ্যে কোন বিচার নাই রাণীর মধ্যে অহংকার বোধ এখনও অত্যন্ত প্রবল। তাহার বুদ্ধি এই অহংকার প্রসূত মানবিক বুদ্ধি বলিয়া একদিকে সে যেমন অতি রহস্যময় দিব্য অভিপ্রায়ের লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরীয় বিচার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে।

সমাজে ধর্ম্মবোধের যে চেতনা বর্ত্তমান নাটকে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে বিশেষ করিয়া ঠাকুরদার মধ্য দিয়া। ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ বা অবতরণ বলিতে এই ধরণের ব্যক্তিত্বকে বোঝায়। তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে কোন অলৌকিকত্ব নাই। অবশ্য তাঁহাদের অলৌকিক জন্ম ও মৃত্যুতে কেহ কেহ যে বিশ্বাস করেন না তা নহে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের এইরূপ কোন বিশ্বাস ছিল না। তিনি বিশ্বাস করিতেন ঈশ্বরীয় বিচার যেমন কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া উহাকে আশ্রয় করিয়াই অভিব্যক্ত হয় তেমনি উহার জন্য নানা ব্যক্তিত্বের

আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা ব্যক্তি আশ্রয়ী প্রকাশে বিশ্বাস করিলেও সে প্রকাশ যে নৈর্ব্যক্তিক হইতে পারে এমন বিশ্বাসও পোষণ করেন। সমাজে এই ধর্ম্ম-বিচারের অভিব্যক্তির কালে সমসাময়িক জনগণের মনে একটি ব্যক্তিত্বের প্রতীতি জন্মে মাত্র বস্তুতঃ এইরূপ কোন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব নাই। এই সম্পর্কে গিরীন্দ্র শেখর বসুর গীতাভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভগবান নিজে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। তিনি কি করিয়া বদ্ধ জীবের আকার ধরিয়া নিজেকে বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে পারেন এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, তিনি মায়া প্রভাবে যেন দেহবান হন, যেন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, যেন তিনি লোক নিবহের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন এই রূপে লোকে তাঁহাকে বুঝিয়া থাকে। প্রমথ নাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক অনূদিত॥ শঙ্কর ব্যাখ্যাই অবতার বাদের সাধারণ প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা মানিলে বলিতে হয় তুমি আমি যে ভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে জন্মেন নাই। বাস্তবিক তাঁহার জন্মই হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ ছিলেন না। ভগবানের বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাবে মহাভারতের যুগের ব্যক্তিগণের মনে হইত যেন বা শ্রীকৃষ্ণ আছেন যেন বা তিনি অর্জ্জুনের রথ চালাইতেছেন যেন বা তিনি গীতার উপদেশ দিতেছেন; ইত্যাদি।"

বলাবাহুল্য গিরীন্দ্রশেখর বসু অবতার বাদের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। উপরে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাখ্যায় ইহার একপ্রকার সমর্থন লাভ করিতে পারা যায়।

সাত জন রাজা মিলিয়া তখন স্বয়ংবর সভার আয়োজন করিয়াছে, সাত জনের লোলুপতার সাতটি লেলিহান শিখা রাণীকে সাতদিক হইতে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই রাজার অতি-ভয়ঙ্কর বজ্রগম্ভীর স্বর ধ্বনিত হইয়াছে! সে বজ্র গর্জ্জনে রাজপ্রাসাদ সহ সমগ্র ধরিত্রী টলমল করিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরদা কেমন করিয়া এই আসন্ন সঙ্কট জানিতে পারিলেন, রাণীকে উদ্ধার করিবার জন্য কেমন

করিয়া সেনাদল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরিচালিত করিয়া আপনি সেনাপতির বেশে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেমন করিয়া আপন অন্তরের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এই সমস্ত দিক সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। ইহার কোন ব্যাখ্যা নাটকের মধ্যে কোথাও দান করা হয় নাই।

কিন্তু সামান্য সেনাদল লইয়া ঠাকুরদা কেমন করিয়া যুদ্ধে সাতজন রাজাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন তাহার একটা যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দান করিয়াছেন। ঈশ্বরের বিচারের একটা দিক বুদ্ধিগম্য, আর একটা দিক মানুষের বুদ্ধি-বিচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। একটি দিক লৌকিক আর একটি দিক অলৌকিক। বস্তুতঃ এই অলৌকিক জগতেরও একটা বিধি আছে তবে তাহা লৌকিক জগতের অনুরূপ নয়। সেই জন্য ইহা আমাদের নিকট অলৌকিক বলিয়া বোধ হইলেও অধ্যাত্মবাদীদের নিকট সম্পূর্ণ বিধি সম্মত বলিয়া বোধ হয়। লৌকিক দিকটির ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে দান করিয়াছেন—

"প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, ভালো বোঝাই গেল না।

"দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল—কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

"তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায়, কেউ পিছোতে চায়; কেউ এদিকে যায়, কেউ ওদিকে যায়। একে কি আর যুদ্ধ বলে।

"প্রথম। ওরা তো লড়ায়ের দিকে চোখ রাখে নি—ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

"দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল—লড়াই করে মরব আমি, আর তার ফল ভোগ করবে আর কেউ।"

যুদ্ধে পরাজয়ের এই যেমন একটি কারণ, অর্থাৎ তাহাদের কামনা

কলুষিত প্রয়াস এবং কাম ও ক্রোধের দ্বারা আচ্ছন্নবুদ্ধি,—তেমনি অন্যদিকে ঠাকুরদা ও তাহার শম্ভু-স্বধনের দলের ছিল নিষ্কাম কর্ম্মপ্রেরণা, কাম-মুক্ত পরিশুদ্ধ বুদ্ধি, সম্পূর্ণ পার্থিব ভয় মুক্তি। ঠাকুরদা সে পরিচয়ও দিয়াছে—

"ঠাকুরদা। তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি। আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।"

৫

একমাত্র অন্তরের পথে দিব্য-চেতনার আভাস লাভ করিতে হয়। বাহিরের জগতে ইন্দ্রিয়-মন ও বুদ্ধির সহায়তায় তাহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। অবিক্ষুব্ধ অন্তরে অচঞ্চল জল বিস্তারে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের মত তাহার চকিত আভাস নামে। অন্তরের পথে দিব্য-চেতনার এই যে আভাস তাহার উপলব্ধি এবং তাহার বোধ বর্হিজগতের বোধ ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। সেই ভিন্নতর বোধের সহায়তায় তাহার আভাস লাভ করা যায়। এই ভিন্নতর বোধের স্বরূপ যাহাই হোক-না-কেন তাহা যে ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মানস প্রত্যয় নয় তাহা অন্ততঃ বলিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয় ও মনের উর্দ্ধতর এই যে বোধ উপলব্ধি ব্যতিরেকে এই কারণে তাহার বিশ্লেষণ অসম্ভব।

দিব্য-চেতনার আভাস বিশ্রান্ত মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে আসিয়া পৌঁছায় না তাহা নহে কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, জীবনে সে প্রেরণার প্রয়োজন কি, তাহার সহিত সাধারণ মানবিক বোধের সম্পর্ক কি তাহা মানুষ বোধ করিতে পারে না। কেবল তাহাই নয় তাহাকে এমন বিপরীত এতদূর অস্বভাবী বলিয়া বোধ হয় যে মানুষ তাহাকে প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়। ওই চেতনা লাভের জন্য তাই সচেতন অনুশীলন ও সুদীর্ঘ প্রস্তুতি প্রয়োজন।

তাহা ছাড়া রূপের পিপাসা না মিটিলে, ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হইলে, উহার তল পর্য্যন্ত আলোড়ন করিয়া উহার অসামর্থ্য না বোধ করিলে মানুষ অন্তরের পথ আশ্রয় করিতে পারে না। তাহা না হইলে একটা সংশয় ও অতৃপ্তির পীড়া কোন-না-কোন রূপে থাকিয়া যাইবেই। এই সংশয় ও অতৃপ্তির পীড়া যতদিন থাকে ততদিন মানুষ অধ্যাত্ম জীবনটিকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না রূপের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ভিতর দিয়া উহারই তাপের দ্বারা তপ্ত হইয়া সমগ্র ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের মধ্যে যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় তাহাতে পরিণামে উহা দিব্য-চেতনার সার্থক আধার হইয়া উঠে। রূপের ভিতর দিয়াই রূপকে পরিশেষে পরিহার করিতে হয়।

রাণী-সুদর্শনা অন্তরে ধ্যানের মধ্যে অরূপের স্পর্শ লাভ করিতে পারিত, কিন্তু রূপের ওই পিপাসার জন্য তাহাকে রূপের জগতে ইন্দ্রিয়ের সামগ্রী করিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে। তাহার ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটে নাই সেইজন্য অন্তরের পথকে সে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিতে পারে নাই। এই কারণে অন্তর্জগতের উপলব্ধির জন্য যে বিশিষ্ট বোধের বিকাশ তাহা তাহার জীবনে ঘটিতে পারে নাই।

তাহার পর রূপের জগতে রাণীর ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ঘিরিয়া যে নিরতিশয় নিষ্ঠুর মন্থন ক্রিয়া চলিয়াছে তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। ইহার অসামর্থ্য রাণী তখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছে। জীবনে ইহার ফল লাভ কতটুকু তাহা রাণী এই জগতের সর্ব্বশেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। রাণীর দেহ-প্রাণ-মন তখন ক্লান্ত অবসন্ন। অশুচিতার গ্লানিবোধ ও মনস্তাপে রাণীর হৃদয় তখন নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, তখনই অন্তরের মধ্যে রাণী আর এক সুর শুনিতে পাইয়াছে—অতি করুণ, মিনতি বিজড়িত আহ্বান ধ্বনি। তাহার সমগ্র সত্তা এতদিনে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখীন হইয়া উঠিতেছে। ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ শান্ত হইয়া গেলে মানুষ তাহার অধ্যাত্ম-সত্তার ধীর আভাস লাভ করিতে থাকে।

রাণী সুদর্শনা তাহার এই উপলব্ধির কথা সুরঙ্গমাকে বলিয়াছে।

"সুদর্শনা। দেখ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে, আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

"সুরঙ্গমা। তা হ'বে। কেউ হয়ত বাজায়।"

"সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার; মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

"সুরঙ্গমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে আর বাজায়।"

"সুদর্শনা। তা হবে। কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়িত। সেই গানই তো কোন অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।"

এই বিস্তারিত উদ্ধৃতির ভিতর দিয়া আমি সেই কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে রাণীর অন্তরে অধ্যাত্ম প্রেরণা তখনই অনুভূত হইয়াছে যখনই রাণীর জীবনে ইন্দ্রিয়াশ্রয় লুপ্ত হইয়াছে: যে সুর শুনিয়া রাণী উন্মনা তাহা বাহিরের কোথাও হইতে ভাসিয়া আসে নাই তাহা আসিয়াছে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে।

অন্তরের যে-লোকে দিব্য-চেতনার আভাস আসিয়া পৌঁছায় তাহাই মানুষের অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক। ইন্দ্রিয় মনের কোন মালিন্য তাহা যতই গভীর হোক-না-কেন অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকটিকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ তাই গভীরতম পাপ পঙ্ক হইতে ওই অধ্যাত্ম-সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া আসিতে পারে। রাণী সুদর্শনাও এই কথাটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে।

"দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি—বুক

চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না। তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু।''

সত্তার এই অন্তর্মুখীনতার সহিত আর একটি কথা আছে যাহাকে বলা যায় আত্ম-বোধ বা অহংকারের বিসর্জ্জন। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মনের প্রেরণা যে কেবল বিষয় বাসনা বা কামোপভোগরূপে প্রকাশ লাভ করে তাহা নহে, তাহা বহুবিধ সূক্ষ্ম অহংকারবোধ রূপেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। অধ্যাত্ম জীবন লাভের পথে এই বহুবিচিত্র অহংকার বোধের বাধাই সর্ব্বাধিক বাধা। ইহার গতি এত বিচিত্র, এত সূক্ষ্ম এবং এত মহত্ত্বের ছদ্মবেশে ইহা আত্ম প্রকাশ করিতে পারে যে উহার অহংকারের স্বরূপ নির্ণয় কোথাও একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিবোধ আশ্রয় করিয়া যে-কোন মহত্ত্ব ও আদর্শের প্রেরণা অহংকারের প্রেরণা। আবার ভক্তির অহংকারও অহংকার। পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন লাভে এই সকলই অহংকার। ব্যক্তি আশ্রয়ী যে-কোন প্রেরণা, বলিয়াছি তাহা যত উন্নত, যত মহৎ এবং যত সাত্ত্বিক হোক-না-কেন, বন্ধন মাত্র। এই সকল বন্ধন ছিন্ন না করিলে পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে পারা যায় না। অধ্যাত্ম জীবন বলিতে সত্তার ঈশ্বরীয় বোধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং একমাত্র ঈশ্বরীয় বোধ নিয়ন্ত্রিত জীবন বুঝায়। আর যে-কোন বোধের প্রেরণা অহংকারের প্রেরণা।

রাণীর সকল গর্ব্ব ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। রাণীর এখন এক মাত্র এবং সর্ব্বাধিক গর্ব্বের স্থল তাহার ভক্তির গর্ব্ব, প্রেমের গর্ব্ব। রাণীকে এই সর্ব্বশেষ গর্ব্বের আশ্রয় স্থলটুকুকেও হারাইতে হইয়াছে।

"সুদর্শনা। তার পণটাই রইল, পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে আমি এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এসেছি। এ গর্ব্ব আমি ছাড়ব না।

"সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্ব্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।''

অধ্যাত্ম সাধনার আদি ও অন্তকথা হইল অহংকার বোধের বিসর্জ্জন। জীবনকে আমার দিক হইতে না দেখিয়া ঈশ্বরের দিক হইতে দেখা। ইহারই নিয়ত অনুশীলনের ভিতর দিয়া জীবনের সমগ্র অর্থ টার ধীর পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, সমগ্র সত্তার মধ্যে ধীর রূপান্তর সাধিত হয়। এই বোধের আরম্ভ হইতে অধ্যাত্মবোধের প্রকাশের আরম্ভ, ইহার পূর্ণতার মধ্যে অধ্যাত্মবোধের পূর্ণতা। এই বোধের আরম্ভ হইতেই রসবোধ ও আনন্দবোধের আরম্ভ, ইহার পূর্ণতার মধ্যে রসবোধ ও আনন্দবোধের পূর্ণতা। এই আনন্দবোধ প্রাপ্তি জীবনের কোন বিশেষ পরিণামের মধ্যে নাই। এই সাধনার আদিতেও আনন্দ অন্তেও আনন্দ। এই সাধনায় জীবনের আদি ও অন্ত আনন্দময় হইয়া উঠে। সুদর্শনা এই উপলব্ধির পরিচয় দিয়াছে।

"সুদর্শনা। অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হ'ল—সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া সুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ, এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠেছে। এ-যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে, এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন, আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেই রকম।"

রাণীর অহংকার যখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে তখনই রাণী রাজার সত্য পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছে। রূপের মধ্যে উপমা আছে। তিনি অরূপ, সকলগুণের অতীত তাই তাঁহার কোন উপমা নাই। রাণীর ভাষায়—"তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও। তুমি অনুপম।" উত্তরে রাজা বলিয়াছেন—"তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।" অর্থাৎ সৃষ্ট রূপের মধ্যেই অরূপের উপমা আছে।

"সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে

তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।"

নিঃশেষ আত্ম সমর্পণের ভিতর দিয়া রাণীর অধ্যাত্মবোধ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই পরিণামে রাণী বোধ করিয়াছে যে যিনি অরূপ তিনিই রূপে রূপে বহুরূপে প্রকাশমান। মানুষ তখন আত্মস্থিত হয়। তখন বৈচিত্র্য বা রূপ যে এক একাকারত্বের মধ্যে চিরকালের জন্য হারাইয়া যায় তাহা সত্য নহে তখনও রূপ বা বৈচিত্র্য থাকে কিন্তু তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তখন তাহা অরূপের যোগে পূর্ণ সত্য হইয়া উঠে। এই রূপই তখন অরূপের যোগে অনন্ত সৌন্দর্য্যও রহস্য পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

রূপ বা সীমার মধ্যে যে অপার বিস্ময় আছে তাহা কেমন করিয়া কোন্ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, রাণী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে রাজা বলিয়াছিলেন—"নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে, সে কতোবড়ো!"

অর্থাৎ আপনার সীমিত বোধের দিক হইতে নয়, রূপকে দেখিতে হইবে অরূপ বা অসীমের দিক হইতে তাহা হইলে রূপের আর অন্ত থাকিবে না। অসীম বা অরূপের দিক হইতে দেখিতে হইলে আপনার সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে। রাণী আপনার অহংকারের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া অরূপের যোগে রূপকে সত্য করিয়া জানিতে পারিয়াছে।

তিনি প্রেমে আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্তহীন রূপ-দর্পনে তিনি আপনার রূপকে আপনি অনন্তকাল ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে তিনি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

এই সম্পর্কে আরও একটি কথা আছে। রাণী যখন এই উপলব্ধি লাভ করিয়াছে তখন রাজা তাহাকে বলিয়াছেন—"আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো আলোয়।"

ইতিপূর্ব্বে রাণী একমাত্র রূপ বা বৈচিত্র্যকেই সত্য বলিয়া বোধ করিয়াছে। ইহারই জন্য তাহার মন কেবল রূপ হইতে রূপে বিচরণ করিয়াছে। এই রূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নিয়ত বিনাশের ভিতর দিয়া হারাইয়া যাইতেছে। এখানে শুধু গতি। জীবনের এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নহে বলিয়া সত্য সাক্ষাৎকার নহে। জীবনের আর একটি দিক আছে যাহা অসীম বা অরূপ যাহা শাশ্বত, চিরস্থির। সকল রূপ-বৈচিত্র্যকে পরিহার করিয়া কেবল অরূপের সাধনাও সত্য সাধনা নয়।

সত্য সাক্ষাৎকার হইল রূপকে অরূপের সহিত যুক্ত করিয়া দেখা। অরূপের লীলা রূপে রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

শুধু রূপ মহৎ বিনষ্টির, শুধু রূপ মহৎ ভয়ের। দুইয়ের যোগে আনন্দ অপার হইয়া উঠে।

রাণী যখন কেবল রূপের জগৎ আশ্রয় করিয়াছিলেন তখন তিনি মৃত্যু তাড়িত। রাণী যখন কেবল অরূপকে লাভ করিয়াছেন তখনও অন্ধকার, তখনও তিনি আনন্দের সন্ধান পান নাই। তাহার পর অরূপের যোগে যখন তিনি পুনরায় রূপের জগৎটিকে লাভ করিয়াছেন তখনই তিনি পূর্ণ সত্য ও আনন্দ লাভে সমর্থ হইয়াছেন।
উপনিষদেও একথা বলা হইয়াছে।

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ (ঈশোপনিষদ)

অর্থাৎ—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে ডুবে এবং যাহারা বিদ্যার উপাসনা করে তাহারা ততোধিক অন্ধকারে ডুবে।

> বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
> অবিদ্যাং মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ (ঈশোপনিষদ)

অর্থাৎ—যাহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে একত্র করিয়া জানে তাহারা অবিদ্যার ভিতর দিয়া মৃত্যু পার হইয়া বিদ্যার ভিতর দিয়া

অমৃত লাভ করে। এই ভাবটিকেই অন্য ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ (ঈশোপনিষদ)

অর্থাৎ—যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে নিমগ্ন হয় এবং যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করে তাহারা ততোধিক অন্ধকারে নিমগ্ন হয়।

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ (ঈশোপনিষদ)

অর্থাৎ যাহারা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয়কে একত্র করিয়া জানে তাহারা অসম্ভূতির ভিতর দিয়া মৃত্যু পার হইয়া সম্ভূতির ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করে।

সামগ্রিক দর্শনে শুধু রূপ সত্য নয়, শুধু অরূপও সত্য নয়। এই উভয়ের শাশ্বত যোগে দৃষ্টির সমগ্রতা।

৬

রাণী সুদর্শনার চরিত্রের উন্মেষ ধারাটিকে দুই দিক হইতে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একটি মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সমগ্র কাহিনীটিকে রূপক রূপে ব্যাখ্যা করা। একটি ব্যাখ্যা মুখ্যতঃ লৌকিক, অর্থাৎ সমগ্র কাহিনীকে কেবল মাত্র কাহিনী রূপে ব্যাখ্যা করা। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই তিনি রাজাকে নাটকের মধ্যে সকল সময় লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন। তিনি সকল রূপের অতীত, অরূপ। সেই এক অরূপই আবার সকল রূপের মধ্যে প্রকাশমান। আবার কাহিনীটির মধ্যে একটি সুপরিকল্পনা আছে, একটি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা আছে বলিয়া ইহার একটি লৌকিক ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

রাণীর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ। সেই সৌন্দর্য্যবোধ কেবল

জগতের যাহা কিছু সুকুমার, যাহা কিছু পেলব, যাহা কিছু স্নিগ্ধ, সুকোমল, রঞ্জিত তাহাকেই জগতের আর সমস্ত কিছু হইতে পৃথক করিয়া লাভ করিতে চায়। ঈশ্বর বলিতে এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্য-সাধক মনে মনে ইহারই তিলোত্তমা রচনা করিয়া তাহারই ধ্যান নিমগ্ন হয়। নিম্নে একটি বিস্তারিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তিটির মধ্যে রাণীর এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-পিপাসা যেমন তেমনি ঈশ্বরীয় বোধ বলিতে তিনি ইহারই যে সমগ্রতা বোধ করিতেন তাহা বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

"নব বর্ষার দিনে জল-ভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি, আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়া-মাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার, শরৎকালে আকাশের পর্দ্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয়, তুমি স্নান করে তোমার শেফালি বনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দ ফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত-চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্কা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহ দ্বার খুলে যাবে; শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথ শ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্ত কালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তোনে তোমার বীণার সব কটি সোনার তার উতলা।"

রাণীর এই যে সৌন্দর্য্য-সাক্ষাৎকার তাহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী। কিন্তু সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার ক্রমিক উন্নততর চেতনায়—মনে, বুদ্ধিতে

বা জ্ঞানে এবং অধ্যাত্মবোধে আছে। কেবল ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী যে সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার তাহাতে রূপের জগৎ একান্ত সীমিত হইয়া যায়, তাহার বাহিরের বিরাট বিশ্বকে অসুন্দর বলিয়া বোধ হয়। মানবীয় চেতনা যতই গভীর হইতে গভীরতর সত্তা লাভ করিতে থাকে সৌন্দর্য্যের জগৎ ততই বিস্তৃত হইয়া যায়, আপাত অসুন্দর বা বিরূপের মধ্যে ততই সে সৌন্দর্য্যের সন্ধান লাভ করে। চেতনার এমন একটা পরিণাম আছে যাহাকে অধ্যাত্ম পরিণাম বলে সেই দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত কিছুই সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চেতনার উন্নততর পরিণাম বলিতে ইহা বোঝায় না যে উহা এমন এক প্রকার মানসিক গঠন লাভ যাহাতে কেবল মাত্র তথাকথিত রূপটাই দৃষ্টিগোচর হয় এবং অন্তরের ওই সৌন্দর্য্য-অভিক্ষেপ দ্বারা জগতের তথাকথিত অসুন্দর ভাগ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইহা কিন্তু আদৌ সেই জাতীয় কোন সাধনা নয়, অবশ্য এই জাতীয় বিশিষ্ট সাধনা যে নাই তাহাও নহে। ক্রমিক উন্নততর চেতনায় সৌন্দর্য্য-বোধ ও সৌন্দর্য্য-লোকের যে ক্রম প্রসার তাহাতে কিন্তু রূপের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় না। তবে ইহাতে সকল রূপের অন্তরালবর্ত্তী যে পরম সত্তার যোগ সূত্র আছে তাহারই ধীর উপলব্ধি বাড়িয়া চলে বলিয়া উহারই যোগে অনেক তথাকথিত বিরূপকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। (সুন্দর বলিলেও ঠিক বলা হয় না কোমল ও কঠোর, রূপ ও অরূপের যোগে তাহা এক অপূর্ব্বতার আস্বাদ)। মানুষের পক্ষে সেই পরম যোগতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব যে যোগে বিশ্বের সকল রূপ সকল বিরূপ, সকল কোমল ও সকল কঠোর বিধৃত হইয়া আছে। সেই পরম একের সহিত বিধৃত হইয়া রূপ অপরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহা রূপ নয়, অরূপও নয় তাহা রাণীর ভাষায় অনুপম অর্থাৎ তাহার আস্বাদের কোন তুলনা নাই।

রাণীর সৌন্দর্য্যবোধ এখন মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয় চেতনাশ্রয়ী। ইন্দ্রিয়জাত সৌন্দর্য্যবোধের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে তাহা এই সকল সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠভাগ সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে একটি তিলোত্তমা গড়িয়া তুলে। কেবল তাহাই নয় এই ইন্দ্রিয় পিপাসার অতি প্রবল

প্রেরণায় মানুষ তাহার ওই তিলোত্তমাকে বাহিরে একটি বিগ্রহের মধ্যে বাহু বেষ্টনে লাভ করিতে চায়। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী সৌন্দর্য্য-পিপাসার ইহাই চূড়ান্ত পরিণাম। ইহার জন্য নর-নারীর কান্নার অন্ত নাই। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী সৌন্দর্য্য-বোধ বলিয়া বাহিরের রূপ আশ্রয় করিয়া রাণীর অন্তরে সৌন্দর্য্যের যে ধ্যান-রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই রাণী সুবর্ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সুবর্ণ-ই তাহার এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-সাধনার আরাধ্য দেবতা। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী সাধনায় সুবর্ণের এই জাতীয় রূপ সাধ্য বস্তু হইয়া উঠে। ওই রূপটিকে লাভ করিবার জন্য রাণী তাই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই চেষ্টায় রাণী তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও নীতি বোধ, সামাজিক সংস্কারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে সমাজ ও সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত ধর্ম্ম ও নীতিবোধ মানুষের জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। যে-কোন বৃহৎ পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে ধর্ম্ম ও নীতিবোধ আপনার জীবনে গভীর দুঃখভোগের ভিতর দিয়া উপলব্ধ নয় জীবনে তাহার আধ্যাত্মিক ফল লাভ বিশেষ কিছু নাই। এই সমস্ত বোধের আধ্যাত্মিক ফল লাভ বিশেষ কিছু না থাকিলেও জীবনকে ধারণ করিয়া রাখিতে যে এই সমস্ত বোধ কতকটা সহায়তা করে তাহা অনস্বীকার্য্য।

যাহাই হোক, ইন্দ্রিয়-পিপাসায় রাণীর অন্তর ও বাহিরের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয় নিপীড়নের অহর্নিশ সুতীব্র বিষজ্বালা, চিত্তবিক্ষোভ, অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া রাণী এই জীবনে কিছুকালের মধ্যে যেমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অন্যদিকে রাণী তাহার সাধ্য রূপের অসামর্থ্যের পরিচয় দিনের পর দিন লাভ করিয়াছে। সে রূপের মধ্যে কোন চরিত্র নাই, পৌরুষ ও বীর্য্য নাই, জীবনের কোন সংগ্রামে তাহা মানুষকে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে না, মানুষের কোন গভীর দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহার সম্বল শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-লালসা ; তাহা একান্ত ভীরু, পাপাচারী, নানা হীন পন্থা অনুসরণ করিয়া কেবল আপনার স্থূল কামনা চরিতার্থ করিতে চায়। ইন্দ্রিয় বৃত্তি সম্পূর্ণ শিথিল করিয়া দিয়া কামনা-পঙ্কের মাঝখানে

দাঁড়াইয়া রাণী এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-সাধনার অসারতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে।

এই আগুনে জ্বলিয়া সেই সন্তাপ দূর করিবার জন্য রাণীর অন্তরে উন্নততর বোধ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ইন্দ্রিয়-পিপাসায় এই যে স্খলন তাহাতে বিবেকের সহিত মানুষকে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রামে একদিকে বিবেকবোধ যতই দুর্ব্বল হইতে থাকে অন্যদিকে প্রবৃত্তি-প্রেরণা তত প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিক হইতে বলিতে পারা যায় যে প্রবৃত্তি প্রেরণা যতই প্রবল হইতে থাকে নৈতিক প্রেরণা মানুষের জীবনে ততই দুর্ব্বল হইতে থাকে। কিংবা উভয় প্রেরণাই একযোগে প্রবল হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের আধারটিকে শতধা করিয়া দেয়।

রাণীর জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায় তাহার স্খলনের প্রতি পদক্ষেপে নীতি বোধের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিস্তারিত পরিচয় দানের কোন প্রয়োজন নাই। তবে রাণী পাপের অনেক গভীরে নিমগ্ন হইয়াই ইন্দ্রিয়বোধের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছে। এই উপলব্ধির ভিতর দিয়া তাহার নীতিবোধ ধীরে ধীরে যেমন গভীর হইয়াছে তেমনি অন্যদিকে ইন্দ্রিয়-নিপীড়ন তাহার জীবনে ক্রমে হ্রাস পাইয়া পরিণামে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়াছে।

জীবনের যে-কোন পরিণামে মানুষের অধ্যাত্ম সত্তা অটুট থাকে. বাহিরের কোন পাপ-পুণ্য তাহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। উহাকে লাভ করিবার ব্যাকুলতা জীবনে যত গভীর হয় তাহার সকল ইন্দ্রিয় যতই অন্তর্মুখীন হইতে থাকে ততই তাহার ওই অধ্যাত্ম-সত্তা সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে, তাহার চেতনা ততই উন্নততর পরিণাম লাভ করে।

অধ্যাত্ম-সাধনার এই পর্য্যায়ের বিস্তারিত পরিচয় অন্যত্র দান করিয়াছি। সে সাধনার মূল কথাটি কি, না চিত্ত-বৃত্তির অন্তর্মুখীনতা এবং অহংকার বা আত্মবোধের বিসর্জ্জন। পরম সত্তাটিকে লাভ করিতে মানুষকে একমাত্র অন্তরের পথটিকে আশ্রয় করিতে হয়। বাহিরে

রূপের জগৎ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে সংহত করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধায়িত করা। এই সঙ্গে আর একটি বোধের চর্চ্চাও করিতে হয়। তাহা হইল অহংকার বা আমিত্ববোধের বিসর্জ্জন। অবশ্য চিত্তবৃত্তির অন্তর্মুখীনতা ও অহংকার বোধের বিসর্জ্জন এই দুই বোধই অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। একটি ব্যতিরেকে অপরটির সাধনা অসম্ভব। কারণ অহংকারের যে-কোন বোধ মানুষের চিত্তবৃত্তিকে বহির্মুখীন করে। অবশ্য ইহাও আমাদের জানা প্রয়োজন যে অহংকার বা আমিত্ববোধ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়োপভোগের আকাঙ্ক্ষা রূপে প্রকাশ লাভ করে না। ব্যক্তিবোধাশ্রয়ী যে-কোন প্রেরণা অহংকারের প্রেরণা। তাহা সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষারূপেও প্রকাশ লাভ করিতে পারে। ওই বোধাশ্রয়ী লোক-হিতকর ও সমাজহিতকর যে-কোন প্রেরণাও অহংকারের প্রেরণা। একমাত্র দিব্য-প্রেরণা অহংকারের সকল বোধ মুক্ত। বস্তুতঃ মানুষ ঈশ্বরীয় বোধের মধ্যে আপনার সকল বোধ নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়া জীবনে দিব্য-প্রেরণা লাভ করে। তাই মানুষ যতদূর অহংকার বোধ মুক্ত হইতে পারে ততদূর সে দিব্য-ভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়।

রাণীকে সেই অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে অহংকারের সকল বোধ একের পর এক বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ভক্তি ও প্রেমের অহংকারও অহংকার। অধ্যাত্ম জীবনটিকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে এই অহংকারও রাণীর জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে রাণীর এই অহংকারও ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই অহংকার ত্যাগ তো সহজ নয়। অধ্যাত্ম জীবন লাভের এই ব্যাকুলতাও দুর্লভ। অমন দুঃখ-ভোগ না করিলে, অমন সন্তাপে সন্তপ্ত না হইলে নর-নারীর জীবনে অমন অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা বোধ হয় জাগে না।

এই অধ্যাত্ম সাধনার ভিতর দিয়া রাণী সেই পরম একের সন্ধান লাভ করিয়াছে, যে পরম একের সূত্রে নিখিল বিশ্বের সকল রূপ বিধৃত। রাণী বোধ করিয়াছে যিনি অসীম ও অরূপ তিনিই আবার দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে রূপে প্রকাশমান।

শুধু রূপের জগতে মানুষ মৃত্যু তাড়িত, শুধু অরূপ বন্ধ্যা। রূপকে অরূপের সহিত যুক্ত করিয়া যে দেখা তাহাই সম্পূর্ণ দেখা। ইন্দ্রিয় ও মনের ধর্ম্মকে চূড়ান্ত প্রসারিত করিয়াও এই যোগের দৃষ্টি লাভ অসম্ভব। ইহার জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্ম দৃষ্টি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মানস-চেতনার ঊর্দ্ধতর বোধ।

৭

অধ্যাত্ম সাধনার স্বরূপ এক কিন্তু ফল লাভের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুরঙ্গমা যে ভাবে রাজাকে লাভ করিয়াছে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির পরিশুদ্ধতা ও অন্তর্মুখীনতা, নিঃশেষ আত্মসমর্পণ, অহংকারের সকল বোধ বিসর্জ্জন, রাণী ও সেই একই পথ ধরিয়া একই ভাবে রাজাকে লাভ করিয়াছে, কিন্তু উভয়ের ফল পরিণামের মধ্যে পার্থক্য কী গভীর। ফল পরিণামের মধ্যে এই যে পার্থক্যই তাহাই স্বধর্ম্মের পার্থক্য। এই স্বধর্ম্ম ভেদের জন্য সুরঙ্গমা রাজাকে লাভ করিয়াছে আপনার প্রভুরূপে। সুরঙ্গমা রাজার পরিচারিকা। অন্যদিকে রাণী রাজাকে লাভ করিয়াছে প্রেমাস্পদ রূপে। রাণীর স্বভাব হইতে রাণী যেমন স্খলিত হইয়াছে তেমনি গভীর দুঃখভোগের ভিতর দিয়া রাণী তাহার রাণীর স্বভাবটিকে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে। রাণীর মধ্যে ছিল মাধুর্য্য-রস-সাধনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুরঙ্গমা তাহার দাসীর ধর্ম্ম হইতে যেমন স্খলিত হইয়াছে তেমনি দুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়া সে তাহার দাসী স্বভাবটিকে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে। সুরঙ্গমার মধ্যে ছিল দাস্য-রস-সাধনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুরঙ্গমা তাহার অধ্যাত্ম ফল লাভ সম্পর্কে রাণীকে বলিয়াছে।

"যখন সকাল বেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলায় মাটির দিকেই তাকাই আর মনে হয় এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়েছে।"

যে স্বভাব-স্থিত হইয়া সুরঙ্গমা রাজার নিত্য করুণা হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়াছে তাহার স্বরূপ কি, না ঈশ্বরের সেবা জ্ঞানে

বিশ্বের সকল পাপতাপ সকল গ্লানি ও আবর্জ্জনার নিয়ত মার্জ্জনা।

এই প্রেমের মধ্যে এমন এক অপার শক্তি নিহিত যাহার ফলে তাঁহারা বিশ্বের সকল নর-নারীর হীনতম ব্যক্তি হইতে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন মানুষ পর্য্যন্ত সকলের দুঃখভার সকলের অন্তরের গ্লানি, সকলের অপরাধ বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য নিত্য উৎসুক হইয়া থাকেন। এই মার্জ্জনা এই দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন। এইবিশ্বের সকল নর-নারী তো তাঁহারই প্রতিরূপ। স্বয়ং ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে পাপ-তাপে দগ্ধ হইতেছেন যেন এই শ্রেণীর সাধকদের সেবার সুযোগ দিয়া ধন্য করিবার জন্য। এই বোধ লাভে সমগ্র জগৎ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষি বদলাইয়া যায়। এই রস সাধনার সমগ্র স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে সুরঙ্গমার এই দুটি গানের মধ্যে—

> "আমি তোমার প্রেমে হব সবার
> কলঙ্কভাগী।
> আমি সকল দাগে হব দাগী।"

এবং

> "আমি কেবল তোমার দাসী।
> কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি।
> গুণ যদি মোর থাকত তবে
> অনেক আদর মিলত ভবে,
> বিনা মূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণ প্রয়াসী।"

অধ্যাত্ম সাধনার শেষে রাজা রাণীকে আলোকে আনিয়াছেন কিন্তু সুরঙ্গমা চিরকাল অন্ধকার-লোক মার্জ্জনার জন্য অন্ধকারেই রহিয়া গিয়াছে। তাহার স্বভাব অনুগ সাধনার ওই একমাত্র ফল লাভ। সাধনার শেষে রাণী রাজার চিরানন্দ-লোকটিকে লাভ করিয়াছে আর সুরঙ্গমা লাভ করিয়াছে, চিরবেদনার। বিশ্ব-বেদনার মর্ম্মস্থলটিতে রাজা

সুরঙ্গমার আসন নির্ব্বাচন করিয়াছেন, বিশ্বের আনন্দ-শতদলের মাঝখানটিতে সুদর্শনার প্রতিষ্ঠা।

সুরঙ্গমা তাহার স্বধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছে তাহার জন্য তাহার অন্তরে কোন ক্ষোভ জাগে নাই। বস্তুতঃ স্বধর্ম্মাশ্রয়ী এই জাতীয় যে-কোন সাধনা ও সাধন অনুগ ফল লাভে ক্ষোভ জাগা অসম্ভব। তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহার পূর্ব্বে সুরঙ্গমার ওই উক্তিটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন, 'সুরঙ্গমা এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ' তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—আমি মনে মনেও বলি নি, 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও।' তাই যে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না।"

অধ্যাত্ম সাধনার আদি ও অন্ত কথা হইল ঈশ্বরীয় বোধের মধ্যে আত্মবোধটিকে সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দেওয়া। জীবনের সকল প্রয়াস তখন একমাত্র ঈশ্বরীয় বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি জীবনাশ্রয়ী হইয়া ঈশ্বরীয় ইচ্ছার এই যে প্রকাশ তাহা ব্যক্তির স্বধর্ম্ম বা বিশিষ্ট স্বভাবটিকে আশ্রয় করে। অধ্যাত্ম সাধনার অর্থ স্বভাব বা স্বধর্ম্মের বিনাশ নয়, উহার অহংকারের সকল প্রেরণাকে কেবল ঈশ্বরমুখীন করিয়া দেওয়া, পরিণামে ওই স্বধর্ম্মাশ্রয়ী করিয়া ঈশ্বরীয় বোধের প্রকাশ ঘটান।

সুরঙ্গমার স্বভাব প্রেরণার কেন্দ্র-বিন্দু অধ্যাত্ম সাধনার সম্পূর্ণতা শেষে কেবল স্থানান্তরিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহা ব্যক্তি প্রেরণাশ্রয়ী না হইয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বর প্রেরণাশ্রয়ী হইয়াছে। নিঃশেষ আত্ম নিবেদন যেখানে সেখানে অন্য ধর্ম্মাশ্রয়ী সাধন ফল লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা জাগা অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি যে প্রশ্ন জাগে তাহা এই যে সুরঙ্গমার যেমন সাধনা তাহার ফল লাভও তেমনি অর্থাৎ তাহার সাধনা যেমন

সামান্য তাহার ফল লাভও তেমনি সামান্য, অন্যদিকে সুদর্শনার সাধনা যেমন গভীর দুঃসহ, তাহার ফল লাভও তেমনি পরিপূর্ণ। নাট্যকার একথা বুঝাইয়াছেন, সুরঙ্গমাও সে কথা বলিয়াছে। সুদর্শনা যখন সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—

'দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে। রাণী হয়ে আমার হয় না কেন।'

তখন তাহার উত্তরে সুরঙ্গমা বলিয়াছে—

"আমি যে দাসী সেই জন্যেই এত সহজ হল"

অধ্যাত্ম সাধনার ফল লাভের মধ্যে নাট্যকার এই রূপে মূল্যের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাণীর ও সুরঙ্গমার সাধন ফল লাভের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কেবল স্বধর্ম্মের নয় মূল্যবোধেরও বটে।

কিন্তু আমরা অধ্যাত্ম সাধনার যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাতে এই মূল্যভেদ অসম্ভব। সে সাধনায় একমাত্র ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় নানা ধর্ম্মের আধার আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে। সেই দিব্য-অভিপ্রায়ের মূল্য ভেদ নির্দ্দেশ তাই অসম্ভব। সাধনার ক্রম অনুসারে ফল লাভের যে তারতম্য তাহার কথা এখানে বোঝান হইতেছে না। এই তারতম্য কেবল এক-একটি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া। এখানে যে পার্থক্যের কথা বুঝান হইয়াছে তাহা পূর্ণ পরিণাম লাভের পর স্বধর্ম্মাশ্রয়ী দিব্য অভিপ্রায় প্রকাশের। বিশ্বের বস্তু রূপের মধ্যে যেমন কোন মূল্য ভেদ নাই, তাহার প্রকাশের মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক-না-কেন, তেমনি অধ্যাত্ম সাধনার দিক হইতে স্বধর্ম্ম ভেদের মধ্যে মূল্যের কোন পার্থক্য নাই

মানুষের মধ্যে যেখানে অহংকার প্রবল অর্থাৎ যেখানে এই জাতীয় কোন অধ্যাত্ম সাধনা বা অধ্যাত্ম কোন উপলব্ধি নাই, সেখানে মানুষ আপনার স্বধর্ম্মের পরিচয়ও যেমন ঠিকমত পায় না তেমনি বস্তুজগতে প্রাপ্তির তারতম্য লক্ষ্য করিয়া আপনার সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। ইহাতে স্বভাবকে যেমন হত্যা করা হয় তেমনি জীবন যে-কোন প্রকার অধ্যাত্ম ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

বস্তুজগৎ ও স্বধর্ম্মের সকল পার্থক্যকে যে আন্তর উপলব্ধি সমান

মূল্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করে সেই মূল্যবোধ তাহাদের জীবনে থাকে না বলিয়া ক্ষোভের কখন নিবৃত্তি ঘটে না।

৮

আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমগ্র নাটকটির মধ্যে ঠাকুরদাই একমাত্র অধ্যাত্ম বোধের সঞ্চার করিয়াছে। সমাজে যে প্রেরণা নিয়ত নিম্নতর প্রেরণাকে জয় করিয়া উঠিয়া উর্দ্ধতর সত্তার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করিতেছে নাটকের মধ্যে ঠাকুরদাকে কতকটা সেই প্রেরণার প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম জীবনের স্বরূপ বা লক্ষণ কি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, দিব্য-সমাজের স্বরূপ কি, জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক কি, কেমন করিয়া ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করিতে হয় এই সমস্ত কিছু ঠাকুরদা নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঠাকুরদা সকলের অন্তরে এই অধ্যাত্ম বোধটিকে যেমন সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তেমনি ধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সৈন্যদল পরিচালিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের সত্য-রূপটি গভীর করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সাধনার যে-কোন পথটিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিতে পারিতেন। তিনি জানিতেন সকল পথই সেই এক পথে গিয়া পৌঁছাইয়াছে। জীবনের যে-কোন পথ ও পর্য্যায়কে অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বর মুখীন করিয়া তোলা সম্ভব। তাই বালক দলের সঙ্গে তিনি বালক, জনসাধারণের সঙ্গে তিনি তাহাদের একজন, স্ত্রীদলের সঙ্গে তিনি তাহাদের একজন রসিক প্রিয়জন, নিঃস্বদের মধ্যে তিনি নিঃস্ব, নর্ত্তকদের সঙ্গে তিনি একজন নর্ত্তক। সকলের সব রূপের ভিতর দিয়া তিনি এক অপরূপের আভাস লাভ করিয়াছেন। তিনি তাই প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের মত হইয়া তাহার স্বধর্ম্ম অনুযায়ী প্রত্যেককে ধর্ম্ম সাধনার কথা বুঝাইতে পারিয়াছেন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক পর্য্যায়ে তিনি প্রত্যেকের সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন প্রত্যেকের, ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন।

ধার্ম্মিকের বাহিরের জীবনে এই যেমন একটি লীলা আছে তেমনি তাঁহার অন্তর্জীবনেও একটি লীলা আছে। ঠাকুরদার বাহিরে লীলা বহুর সঙ্গে বহুরূপে, ঠাকুরদার অন্তরে একের সঙ্গে কেবল একটি রূপে লীলা। অন্তরে এই লীলার যে পূর্ণ পরিণাম অর্থাৎ এই চেতনার সহিত স্থির চেতনাযুক্ত অবস্থা লাভ পরিণামে পূর্ণ স্বারূপ্য লাভ তাহা ঠাকুরদার জীবনে এখনও ঘটে নাই। ঠাকুরদার জীবনে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চকিত, চঞ্চল, আভাস রূপে লব্ধ। ঈশ্বরকে অপরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ না করিলে, ওই চেতনায় স্থায়ীরূপে অধিষ্ঠান লাভ না ঘটিলে বেদনা ঘোচে না, হৃদয় নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে। বিচ্ছেদের ক্ষীণতম আবরণও অধ্যাত্মজীবনে অসহনীয়-বোধের সঞ্চার করে।

বাহিরের জগতে ধর্ম্মের সকল ক্রিয়া কলাপের মাঝখানে থাকিয়াও ঠাকুরদার অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখীন। সকল রূপের অতীত সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলতা। ঠাকুরদার অন্তরের এই ব্যাকুলতাটিকে সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছে সুরঙ্গমা। দুঃসহ একাকীত্ব বোধের নিঃসহায়তা—

"পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতেরে কোন্ গহনে

* * *

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী সনে
উৎসব রাজ কোথায় বিরাজে—
কে লয়ে যাবে সে ভবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।"

ঈশ্বরের সহিত জীবের অরূপের সহিত রূপের যে নিত্য যোগের সম্পর্ক তাহাতে মানুষই নানা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নানা

অহংকারের বাধা। বাহিরে আমরা অহংকারের বিচিত্র রূপ দেখিতে পাই। অহংকারের এই বিচিত্র বাধা দূর করিয়া মানুষ ঈশ্বরের সহিত তাহার নিত্য যোগের সত্যও একমাত্র স্বরূপটি ফিরিয়া লাভ করে। অধ্যাত্ম জগতে বাহিরে অহংকারের বিচিত্র রূপ নষ্ট হয় বটে কিন্তু স্বধর্ম্মের বৈচিত্র্য থাকে। অধ্যাত্ম সাধনায় তাই রূপের জগতে একাকারীত্ব বোধ জাগে না।

পূর্ণতার সাধনা শুধু রূপটিকে অথবা শুধু অরূপটিকে লাভ করা নয়। এক অরূপের যোগে অনন্ত কোটি রূপের যে নিত্য যোগের লীলা সেই লীলা রস আস্বাদ করা। ঠাকুরদা সে কথা বলিয়াছেন—

"আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই, তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এইরূপই তো তার বক্ষের অলঙ্কার। সেই রূপ আপনার গর্ব্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে। আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।"

রূপ ও অরূপের নিত্য যোগের লীলায় যে আনন্দ তাহাই শ্রেষ্ঠ আনন্দতত্ত্ব। ঠাকুরদা তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ রূপে সেই আনন্দ তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ করিতে চান।

অচলায়তন

অচলায়তনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিচিত্র মিথ্যা সংস্কার এবং সেই সমস্ত সংস্কার ও আচার-বদ্ধ জীবনের ব্যর্থতা ও মহৎ বিনষ্টির যে নির্ম্মম ও অতিভয়াবহ পরিচয় দান করা হইয়াছে সে সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার কথা কিছু নাই।

'মালিনী' আলোচনা প্রসঙ্গেও এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। সেক্ষেত্রে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যে চিরন্তন সত্যবোধ ও শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকে জীবনে সকল দিক হইতে ফল প্রসূ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে জীবনে স্থায়ী রূপে লাভ করিতে হইলে সমাজের একটি সামগ্রিক রূপায়ন প্রয়োজন। সমাজের সামগ্রিক রূপায়ন বলিতে তাহার বিচিত্র সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানকেই বুঝায়। এই অর্থে সমগ্র সমাজের সঙ্গে সমাজের নর-নারী মাত্রেই তাহাদের বিচিত্র সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান লইয়া সেই মহান সত্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া উঠে।

সমাজে এই উপলব্ধি যদি অব্যাহত থাকে তবে জীব-জীবনের বিচিত্র অবস্থাকে ওই উপলব্ধির অনুকূল করিয়া গড়িয়া তোলা আদৌ দুঃসাধ্য হইবে না। এবং এই সমস্ত অবস্থা তখন ওই উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা তো করেই না পরন্তু সকল দিক হইতে সহায়তা করে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নানা কারণে নানা প্রয়োজনে। সামাজিক এই অবস্থান্তরের সঙ্গে নূতন সংস্কার নূতন আচার-আচরণ গড়িয়া উঠে। ইহা শুধু একটি কেন্দ্রমুখীন আবর্ত্তন নয় বিকাশও বটে, অর্থাৎ এইরূপে অধ্যাত্মবোধের ক্রমিক বিকাশ লাভ ঘটে।

সমাজে এমন এক একটি সময় আসে যখন এই উপলব্ধির দিকটি একান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে (কারণ মনুষ্য-সমাজ যে-কোন পরিণামে সম্পূর্ণ অধ্যাত্মবোধ শূন্য হইতে পারে না), তখন উহা আর নূতন কোন অবস্থার সহিত আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে না। আর

এই কারণেই সমাজের প্রতীক স্বরূপতা লাভ বলিতে ইতিপূর্ব্বে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছি, সেই অর্থ-রূপটিও নষ্ট হইয়া যায়। তখন সামাজিক সমস্ত সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যহীন, পরিণাম শূন্য হইয়া সমগ্র সমাজ-জীবনকে কেবল নিপীড়ন করে। এই অবস্থা সমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং সমাজের গভীরতর অন্তস্তল হইতে অধ্যাত্ম চেতনা যদি প্রতিকূল সমস্ত শক্তিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহাবলে আত্মপ্রকাশ না করিতে পারে তাহা হইলে ওই সমগ্র সমাজ-রূপটাই একদিন সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়া যায়। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

সমাজ-চৈতন্যের এই আচ্ছন্ন অবস্থা যদি সাময়িক হয় তবে নূতন অবস্থা আশ্রয় করিয়া নূতন সমাজ-রূপ গড়িয়া উঠে। নূতন রূপ বলিতে সকল সময়ই সামঞ্জস্য বুঝায়; কারণ ব্যষ্টির মন যেমন সমাজ-মনও তেমনি স্মরণাতীত কালের বিচিত্র ঘটনা প্রভাব, বিচিত্র সংস্কার, বিচিত্র বিশ্বাসের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জীবনের নূতন কোন অবস্থা এই সমস্ত স্থায়ী মূল্যবোধের একান্ত বিপ্রকৃতিক হইতে পারে না। কারণ এই মনটাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, তাহা মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাহিরে।

যেকথা মালিনীর মধ্যেও উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি, তাহা এই যে এই সমাজ-রূপটা কোন-না-কোন ভাবে চিরকাল থাকিবে, সমাজ-রূপ বলিতে তাহার বিচিত্র সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান বুঝায়, তাহা এক রূপে না হইয়া আর এক রূপে এক মূল্যবোধে না হইয়া আর এক মূল্যবোধে।

অচলায়তনে প্রাচীন অর্থহীন সমস্ত সংস্কারকে কেবল নির্ম্মূল করিয়া দিবার কথাই নাই, নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথাও আছে। এই গড়িয়া তোলাটাই হইল নূতন সংস্কার ও নূতন আচার-আচরণ গড়িয়া তোলা, জীবনে নূতন মূল্যবোধ আরোপ করা, কিংবা বলা যায় জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধকে ক্রমাগত প্রসারিত করা।

সমাজ যখন এই স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করে, সকল সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের যখন প্রতীক অর্থ বা প্রতীক স্বরূপতা নষ্ট হইয়া যায়, যখন এই সমস্ত কিছু অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়া-কলাপ সেই হেতু একান্ত পাষাণভার হইয়া উঠে তখন এমন এক একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যিনি সকল সংস্কার মুক্ত সত্যের দিব্য-রূপটিকে আপনার অন্তরে একেবারে অব্যবহিত রূপে লাভ করেন। আত্মার অন্তপ্রেরণা একান্ত প্রত্যক্ষভাবে যে-কোন অবলম্বন শূন্য হইয়া তাঁহাদের সমগ্র জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া থাকে।

অচলায়তনের মধ্যে সেই সকল সংস্কার ও বন্ধন, সকল আশ্রয় বা অবলম্বন মুক্ত শুদ্ধ উপলব্ধিটিকে ধারণ করিয়া আছেন দাদাঠাকুর। এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে নিম্নে নাটকটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরকালের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙ্গে যায়।

"পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর।

"দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয় নি।

"পঞ্চক। সে কী রকম।

"দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, আলো চাই, ছেলে বলে তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।"

মন একটা কিছু আশ্রয় করিয়া পরিণামে দিব্য-চেতনা অপরোক্ষ করে। দিব্য-প্রেরণাও ইহাকে আশ্রয় করিয়া নিম্নতর জগতে লীলায়িত হয়। এই একটা কিছুই বস্তুতঃ প্রতীক। উপলব্ধি যখন প্রত্যক্ষ

তখন এই প্রতীক উন্নততর চেতনার সহিত এমন একাত্ম হইয়া থাকে যে উহার বিশিষ্ট রূপটিকে পৃথক করিতে পারা যায় না, উহার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণও অসম্ভব।

যখনই কোন প্রতীককে বিশিষ্ট করিয়া উহার রূপের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় তখনই বোধ করিতে হইবে উহা ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনে নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। উহা তখন কেবল মৃণ্ময়, জড় কোন রূপ মাত্র।

ঊর্দ্ধতর চেতনা যে অধ্যাত্ম-মানস আশ্রয় করিয়া লীলায়িত হয় তাহার একটা রূপ থাকিতে বাধ্য। এই রূপটাই প্রতীক। বিপরীত দিক হইতে বলিতে পারা যায় মনের শক্তি যে তত্ত্ব বা যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধায়িত হয় তাহাই প্রতীক। প্রতীকের মধ্যে শক্তির রূপান্তর (তাহা ঊর্দ্ধ বা নিম্নদিকে হইতে পারে) রহস্য নিহিত আছে।

সমাজে এমন এক একটি অবস্থা আসে যখন প্রাচীন সমস্ত প্রতীক-রূপ নিষ্প্রাণ হইয়া যায়। তখন মানুষকে আপনার অন্তরে আপনার ভাবে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করিতে হয়। এমনি করিয়া কালে কালে নূতন প্রতীক গড়িয়া উঠে। এই সমস্ত প্রতীক যতদিন জীবন্ত থাকে ততদিন উহা অধ্যাত্ম চেতনা বিকাশ অথবা অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভের পথে বিঘ্ন তো সৃষ্টি করেই না বরং সহায়তাই করে।

দাদাঠাকুর 'সাহসের সহিত বুক বাড়াইয়া' দিয়া যে সত্য অপরোক্ষ করিয়াছেন, যে সত্য অপরোক্ষ করিয়া তাঁহার সকল বন্ধন, সকল ভয়, সকল সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে, মনোজগতে তাঁহার একটি প্রতীক-রূপ নিশ্চয়ই আছে, সে সম্পর্কে দাদাঠাকুর স্বয়ং সচেতন না হইতে পারেন। অধ্যাত্ম উপলব্ধি যেখানে অতি নিবিড়, একান্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত সক্রিয় সেখানে মানুষের নিকট এই প্রতীক রূপটি যথেষ্ট স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না, কোথাও সে সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ অচেতন থাকে। পরবর্ত্তী-কালে তাহা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। তখন ওই প্রতীক-রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভের পথে যে-কোন প্রতীকের

অপক্ষপাতী। তিনি আপনার অন্তরে আপনার ভাবে তাহা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার প্রাচীন সমস্ত প্রতীক তাঁহার নিকট নিষ্প্রাণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি এই বোধ অস্বাভাবিক নয়, এবং আরও বলিয়াছি এই বোধের ভিতর দিয়া নূতন অধ্যাত্ম প্রতীক জন্ম লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতীক-রূপটি নির্দ্ধারণ করা সুসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য নয়। ইহার সামান্য পরিচয় দানের চেষ্টা অন্যত্র করিয়াছি।

অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভের পথে রবীন্দ্রনাথকে এমনি করিয়া আপনার প্রতীক আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। দাদাঠাকুরের মত তিনিও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

সংস্কার ও অধ্যাত্ম উপলব্ধি সম্পর্কে দাদাঠাকুর ও আচার্য্যের মধ্যে পরিশেষে যে আলাপ ও আলোচনা হইয়াছে এক্ষেত্রে তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দিবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

"আচার্য্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারিদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা শুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

"দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

"আচার্য্য। তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌছয়নি বলেই মনে করে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিনরাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি।

"দাদাঠাকুর। তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্য প্রস্তুত হও।

"আচার্য্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে

ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে আসতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজারবার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

"দাদাঠাকুর। যে-চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।"

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের যদি প্রতীকার্থ লুপ্ত হয়, তবে তাহা মানুষের মনকে মুক্তি তো দেয় না অধিকন্তু তাহাকে নানাভাবে বাঁধে। তাহা মানুষের মনকে কোন একটা পরিণামে না লইয়া গিয়া একটা আবর্ত্তের মধ্যে অন্তহীন কাল ধরিয়া ঘুরাইয়া মারে।

সংস্কার যদি জীবন্ত হয়, অর্থাৎ উহার যদি প্রতীকার্থ থাকে, তাহা হইলে উহা মনকে না বাঁধিয়া ঊর্দ্ধতর চেতনা-লোকে পৌঁছাইয়া দিতে সহায়তা করে। সংস্কারের প্রয়োজন এইজন্য।

যিনি সীমাহীন তাঁহাকে লাভ করিতে হয় সকল সীমিতবোধের ঊর্দ্ধে উঠিয়া, একমাত্র ওই চেতনা-স্বারূপ্য লাভ করিয়া। সংস্কার, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান সীমাই, কিন্তু মনকে মার্জ্জিত করিতে, উহাকে উন্নততর বোধে স্থায়ী ভাবে ধরিয়া রাখিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

যিনি সর্ব্বগ, সর্ব্বভূতে বিরাজমান তাঁহাকে একটা বিশেষ স্থানে প্রথমে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহাকে এই একস্থানে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তাহা না হইলে প্রথম হইতেই তাঁহাকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিলে কোন পরিণামে তাহা ফলপ্রসূ হয় না।

তাঁহাকে একটা জায়গায় প্রত্যক্ষ করিবার অর্থ এই নয় যে মনের মধ্যে তাঁহার একটি কল্পিত রূপ সৃষ্টি করা। এই রূপ-কল্পনা ঈশ্বর

সাক্ষাৎকার নয়। ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের গভীর গোপন অনুপ্রেরণা মনের বিশিষ্ট গঠন অনুযায়ী একটি রূপ আশ্রয় করে। এই রূপ বাহিরের কোন অধ্যাত্ম প্রতীক হইতে পারে। গভীরতর বা ঊর্দ্ধতর চেতনার অনুপ্রেরণা এই অধিমানস আশ্রয় করিয়া নিম্নতর লোকে নানা স্থূল অনুপ্রেরণা, এমনকি নানা বিকৃত যৌন প্রেরণারূপেও প্রকাশ লাভ করিতে পারে। শুদ্ধ অধ্যাত্ম প্রেরণা অনেকক্ষেত্রে অধিচেতনা-লোক আশ্রয় করিয়া সচেতন মানস-লোকে সক্রিয় হয়। সচেতন মানস-লোকে সক্রিয় এই শক্তি যদি অনিয়ন্ত্রিত হয়, কিংবা ওই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার মত শক্তি যদি মনের না থাকে তবে মনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, তাহার ফলে মানুষের আচার-আচরণের মধ্যে নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। (কারণ মনের ঊর্দ্ধতর চেতনা-লোকের যে ক্রিয়াতত্ত্ব তাহার সহিত সচেতন মনো জগতের ক্রিয়াতত্ত্বের কোথাও কোন মিল নাই।) বলা বাহুল্য অধ্যাত্ম-ক্ষমতা লাভের জন্য যেখানে মনের প্রস্তুতি নাই, মানসিক বৃত্তিগুলির সুচারু অনুশীলন নাই, (মনও সমগ্র ব্যক্তিত্বের একটি অংশ বলিয়া মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আবার নিম্নতর সকল চেতনা-লোকের সুস্থ ও স্বাভাবিক অনুশীলন প্রয়োজন) সেইখানে মনের এইরূপ অস্বভাবী অবস্থা ঘটে। তাই ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের জন্য, ওই শক্তিকে জীবনে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার জন্য নিম্নতর সকল চেতনা-লোকের একের পর এক সচেতন অনুশীলন প্রয়োজন। তার বাঁধা না হইলে তার-যন্ত্রের সকল সুর যেমন বেসুর হইয়া যায়, সকল চেতনা পর্য্যায়ের একের পর এক পূর্ণ বিকাশ ও অনুশীলন না হইলে এবং এইরূপে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব না গড়িয়া উঠিলে ঊর্দ্ধতর চেতনা-লোকের যে-কোন অনুপ্রেরণা জীবনে কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হয় না, কেবল তাহাই নয়, ওই শক্তি নানা পাপ প্রবৃত্তির পশ্চাতে লীলা করিয়া তাহাদিগকে ভয়াবহ পরিণাম দান করিতে পারে।

এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এই যে এই রূপের উপর মনকে একাগ্র

করিয়া তুলিয়া অধ্যাত্ম সাধকগণ একটি পরিণামে মনের বা সকল রূপের সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া যান। তাহার পর ওই রূপাশ্রয়ী হইয়া, ওই রূপের যোগে তাঁহারা অরূপকে নিত্য প্রত্যক্ষ করেন। ইহার অর্থ এই নয় যে ওই রূপ ছাড়া আর কোন রূপের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেন না বা করিতে পারেন না।

এই সাধনা সম্পর্কে আরও দুই একটি বিষয় পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহার পূর্বে মহাপঞ্চক সম্পর্কে দাদাঠাকুরের দুই একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

"দ্বিতীয় শোন পাংশু। ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না।

"দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।"

অন্যত্র :—

"দাদাঠাকুর। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোক ভয়—জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।"

মনোলোক (তাহাও সচেতন) পর্য্যন্ত মানবিক বোধের সীমা। ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের যে-কোন সাধনায় মানুষকে কোন একটা উপায়ে মানস-লোক, অর্থাৎ মানবিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। মানবিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বের সকল প্রাণ, সকল রূপের জন্য যে অপার করুণা, এই দুই বিপরীত বোধের (অর্থাৎ রূপকে সম্পূর্ণ ও অব্যবহিত রূপে লাভ করিতে সকল রূপের বোধ ছাড়াইয়া উঠা) মধ্যে যে রহস্য একমাত্র তাহা সমাধান

করিতে পারিলে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সকল রহস্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের সাধনাকে অতি মানবিক বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অমানবিক নয়। কারণ ওই করুণার অমন প্রসার মানবিক বোধের চিন্তা ও কল্পনার অতীত। এই জাতীয় সাধনায় সমগ্র চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিতে হয় বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিতে হয় সত্য, কিন্তু পরিণামে বিশ্বের সমস্ত কিছুর সহিত যুক্ত হইবার জন্য। প্রত্যাহারের সাধনা তাই শূন্যতার সাধনা নয়।

ঊর্দ্ধতর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাও নয়। ইহা পূর্ণতার সাধনা, ইহা তাই জীবনের কোন কিছুকে অস্বীকার করিতে চায় না, পরন্তু পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য সাধনের ভিতর দিয়া তাহাদের পূর্ণ সামর্থ্য দান করিয়া অচিন্তনীয় দিব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে চায়। এই সাধনার লক্ষ্য হইল জীবনকে মানবিক বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করিয়া দিব্য-সঙ্কল্পের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা।

মহাপঞ্চকের সাধনা এই জাতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাপঞ্চকের সাধনা প্রকৃত পক্ষে আত্মহত্যার সাধনা, তাহা কোন প্রকার অধ্যাত্ম সাধনা নয়। মানবিক সকল বোধকে একে একে হত্যা করাকেই সে পরমার্থ সাধন বলিয়া বোধ করিয়াছে; কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টার সহিত অতীন্দ্রিয় চেতনা লাভের সাধনা যুক্ত করিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ দাদাঠাকুরের মুখ দিয়া যেখানে বলিয়াছেন, "ক্ষুধা তৃষ্ণা লোকভয়—জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।"—সেখানে তিনি অতিমানবিক চেতনা লাভের সাধনাকে যে অমানবিকতা বলিয়া বোধ করিতেন তাহাতে কোন সংশয় থাকে না। কিন্তু এই বোধ যে যথার্থ নয় তাহা আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ফাল্গুনী

অন্তহীন দেশ-কালে প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে সংখ্যাতীত রূপ-তরঙ্গ মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। সৃষ্টি ও বিনষ্টির হরণ ও পুরণের এই অন্তহীন লীলা। ধরিত্রীর এই রূপটিই তো আমাদের চোখে পড়ে। উহার বক্ষে প্রাণ-তরঙ্গের নিত্য উঠা ও নামা, ভাঙা ও গড়া। অতীতে কত নর-নারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, আবার একের পর এক মর্ত্ত্যভূমি হইতে বিদায় লইয়াছে, এখনও সেই এক লীলা চলিতেছে আসা ও যাওয়ার, ভবিষ্যতেও কতকাল ধরিয়া এই লীলা চলিতে থাকিবে। বিশ্ব-প্রাণলীলার এই দুটি দিক—সৃষ্টির আনন্দ ও বিনষ্টির বেদনা। প্রাণতত্ত্বের মধ্যে এই দুটি তত্ত্ব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে। প্রাণ-লীলায় কোন একটি দিক তাই সত্য নয়, শুধু সৃষ্টির আনন্দ না শুধু বিনষ্টির বেদনাও না। এই উভয়ের মিলিত সাক্ষাৎকারই সত্য সাক্ষাৎকার। যেখানে যতটা সৃষ্টি সেখানে ততটা বিনষ্টি, অন্যদিকে যেখানে যতটা বিনষ্টি সেখানে ততটা সৃষ্টি। সৃষ্টি ও বিনষ্টি যুগ্মতত্ত্ব। কোন একটিকে একান্ত করিয়া দেখিবার উপায় এখানে নাই।

মিলিত সাক্ষাৎকারের যে তত্ত্বের কথা বলা হয় বস্তুতঃ তাহাও সত্য নয়, সত্য সাক্ষাৎকার হইল দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত এক মহা অস্তিত্বের উপলব্ধি। সৃষ্টি ও বিনষ্টিকে ছাড়াইয়া উহাদের উত্তীর্ণ হইয়া যে উপলব্ধি তাহাও নয়। সে অস্তিত্বের উপলব্ধিতে সৃষ্টি ও বিনষ্টি একই স্বরূপের কেবল রূপভেদ হইয়া উঠে। সেখানে শাশ্বত বেদনা তত্ত্ব ও শাশ্বত আনন্দ তত্ত্ব একই তত্ত্বের দুই ভিন্ন দিক।

যে তত্ত্ব-দৃষ্টি এই মহা অস্তিত্বকেও অনুবিদ্ধ করিয়া উহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, অর্থাৎ যেখানে সৃষ্টি নাই, বিনষ্টিও নাই, সৃষ্টি ও বিনষ্টির যুগ্ম কোন অস্তিত্বও নাই, সেই তত্ত্বদৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে

স্বীকার করেন নাই। সে সাধনা রবীন্দ্রনাথের মতে শূন্যতার সাধনা। নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ইহার পরিচয় দান করিয়াছেন—

"সংসারে যে কেবলি সরা, কেবল চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।

"তাহলে শান্তি পাব কী করে।

"শান্তির উপরে তো আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

"কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি তো পাওয়া চাই।

"ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।"

নাট্যকার আরও পরিচয় দান করিয়াছেন —

"পাহাড়ের গুহা থেকে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি—তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।"

প্রাণের বুকে প্রাণের প্রকাশ, প্রাণের যোগে প্রাণের বিকাশ, আবার প্রাণের মধ্যে তাহার বিলুপ্তি। প্রাণ সম্পদ বক্ষে করিয়া প্রাণের কুসুম ফুটে, প্রাণের যোগে তাহার একটির পর একটি পাঁপড়ির উন্মোচন ঘটে। তাহার অন্তর্লীন সকল সম্পদ প্রাণেরই সম্পদ, প্রাণের যোগে উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহার পর ধীরে প্রাণের দান যেমন কমিয়া যায় তাহার প্রাণের ঐশ্বর্য্যও তেমনি ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। তাহার পর প্রাণের মধ্যে ওই প্রাণ-রূপটুকু একদিন নিঃশেষে হারাইয়া যায়। প্রাণ আপনাকেই নানা প্রাণের ঐশ্বর্য্যরূপে একদিকে প্রকাশ করিতেছে অন্যদিকে আপনার মধ্যেই আবার সংহরণ করিয়া লইতেছে।

মানুষের স্বরূপও এমনি। প্রাণের যোগে তাহার প্রকাশ প্রাণের যোগে তাহার বিকাশ আবার ওই প্রাণের মধ্যে তাহার বিলুপ্তি। মানুষের অন্তরে বিশ্ব-প্রাণের অনুভূতি যতই গভীর হইতে গভীরতর

হইতে থাকে তাহার অন্তর্লীন ঐশ্বর্য্যের ততই প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ মানুষ ততই সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করে। বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণ আপনাকে বিকাশ করিবে আপনাকে নানা ভাবে নানা রূপে সৃষ্টি করিবে ইহাই মানুষের জীবনে একমাত্র সার্থকতা। নির্ব্বিশেষ প্রাণ আপনার ঐশ্বর্য্য-রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তো ব্যক্তি প্রাণটিকে সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানে ইহার বিপরীত যে-কোন আচরণ সৃষ্টির মূল অভিপ্রায়ের বিপরীত আচরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের যে-কোন সৃষ্টির স্বরূপ তো এই। বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণের যে বিচিত্র অনুভূতি ইহা তাহারই প্রকাশ। মানুষের আনন্দ প্রেরণার সৃষ্টি মাত্রেই প্রাণের যোগে প্রাণের বন্দনা। প্রাণ 'আমি' এই ব্যক্তি-রূপের ভিতর দিয়া আপনার সম্পদকেই ফিরিয়া ফিরিয়া নানা রূপে লাভ করিতেছে। সেখানে সে সম্পদের পরিণাম কী হইবে, আমি-রূপটির বা কী হইবে এ চিন্তা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমি-রূপটি আমার কোন ইচ্ছায় গড়িয়া উঠে নাই। বিশ্বপ্রাণের ইচ্ছায় এই প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার তাহার লীলা শেষে তাহার ইচ্ছায় আমার এই প্রাণ প্রাণ-সমুদ্রে মিলিয়া একাকার হইয়া যাইবে। মাঝখানে 'আমি'-রূপের এই যে কান্না ইহাই মায়া। ইহা সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, ইহা অনির্ব্বচনীয়।

নাট্যকার জীবনের এই সত্যটিকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন—

"শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল স্থল আকাশ তাকে চারিদিক থেকে ব'লে উঠেছে—"আমি আছি।"—তারই উত্তরে ওই প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে "আমি আছি।" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।"

নাট্যকার এই ভাবটিকেই প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়।"

অর্থাৎ বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণের অস্তিত্বের অনুভূতির ভিতর দিয়া যেমন সকল সৃষ্টি, তেমনি সকল সৃষ্টি প্রেরণার ভিতর দিয়া ব্যক্তি ও বিশ্ব-প্রাণের চিরন্তন যোগের অস্তিত্ব উপলব্ধি শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। অর্থাৎ মানুষ তাহার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা জয়-পরাজয় এক কথায় তাহার সকল অনুভূতি ও সকল ক্রিয়ার ভিতর দিয়া তাহার অন্তর্লীন প্রাণকে নানা ভাবে অনুভব করিতেছে। এই প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে অনন্তকোটি রূপ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। ব্যক্তি-প্রাণের যোগে বিশ্ব-প্রাণের এক মহা অস্তিত্বের উপলব্ধি ঘটিলে জীবনে আর শোক থাকে না, জীবন আনন্দময় হইয়া উঠে। বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের প্রকাশ বলিয়া এই জীবনে আত্মত্যাগ এত সহজ হইয়া উঠে, মৃত্যুতে আর ভয় থাকে না।

জীবন ও জগতের প্রাণ-রূপের রহস্যই এই। এই জীবনে ও এই জগতে তাই দুঃখও আছে আবার আনন্দও আছে। ইহার কোন একটিকে স্বীকার করিয়া আর একটিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। প্রাণের প্রাচুর্য্য যাহার মধ্যে যত অধিক বিশ্ব-প্রাণের সহিত যাহার প্রাণের যোগ যত গভীর তাহার মধ্যে আনন্দ ও বেদনা উভয়েরই অনুভূতির তীব্রতা তত বেশি। বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যেখানে পূর্ণ মিলন সেখানে আনন্দও যেমন বেদনাও তেমনি সীমাহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সে পরিণামে আনন্দ ও বেদনা সমার্থক হইয়া যায়। সে অনুভূতি তাই সম্পূর্ণ অলৌকিক।

এই প্রাণ-তত্ত্ব যাহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা জীবনে যেমন সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তেমনি সকল জীবন ধারাকে তাহারাই নানা দিক হইতে নানা ভাবে সার্থকতামুখীন করিয়াছে। নাট্যকার সে কথাও উল্লেখ করিয়াছেন—

"যারা বৈরাগ্য বারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয় (অর্থাৎ যাহারা প্রাণের এই তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে) যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয় (অর্থাৎ যাহারা ব্যক্তি-প্রাণের অনুভূতিকে বিশ্বময় ক্রম প্রসারিত করিয়া দিতে চায় না) যারা কাজের

কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয় (অর্থাৎ যে-কর্ম্ম প্রাণের আনন্দ হইতে উৎসারিত হয় না) যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে সৃষ্টি করে তারাই, কেন-না তাদের মন্ত্র, আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।"

এই জীবন ও জগৎ যে কী অপর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ তাহা আমরা তেমন করিয়া বোধ করিতে পারি না। প্রিয়জন বিরহে, বিচ্ছেদে বা বিয়োগে গভীর বেদনা বোধের ভিতর দিয়া এই কথাটিই একান্ত করিয়া মনের মধ্যে জাগে যে আমাদেরও একদিন এই মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই গভীর বেদনার ভিতর দিয়া আমাদের সমগ্র সত্তা জাগ্রত হয়। আমাদের সমগ্র সত্তা যতই জাগ্রত হয় ততই এই জীবন ও জগতের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দ্বার একের পর এক উদ্ঘাটিত হইতে থাকে। মৃত্যুর বোধ আছে বলিয়া অনুভূতির এমন তীব্রতা, আবার এই সুতীব্র অনুভূতির জন্যই মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য অপরূপ হইয়া চোখে পড়ে। সৌন্দর্য্যের সে অনুভূতি সকল কাল পরিমাণকে ছাড়াইয়া যায়।

নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে এই ভাবটিই অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনও আমরা দেখি নি।

"ঊর্দ্ধশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে, চার পাশের দিকে নয়।

"বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি।

"আর দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চলে চলে না যেত তাহলে কোন মধুর চোখে পড়ত না।

"চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে মধুর দেখি।

"এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না সঙ্গে সঙ্গেই বলছে ছাড়ব ছাড়ব।

"সৃষ্টির গোধূলি লগ্নে "পাব"র সঙ্গে "ছাড়ব"র বিয়ে হয়ে গেছে রে তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।"

* * *

"ওই তারাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

"ফুলগুলোর মধ্যে কারা বলছে মনে রেখো, মনে রেখো, তাদের তো মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।"

ব্যক্তিগত দুঃখ বা আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কার ভিতর দিয়া মনে পড়ে যে এই পৃথিবীতে যুগে যুগে কত নর-নারী আসিয়াছে ভালোবাসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে তাহার পর একদিন এই মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই সকল যুগের সকল নর-নারীর বেদনা বিধুরা অনুরাগ যেন এই মর্ত্ত্যভূমির সমস্ত কিছু, এই নদী জল কলতান, এই ফুল পল্লব এই গিরি প্রান্তর, এই শ্যামল তৃন দল এই ধূলি কণার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা যাহাকে ভালোবাসি না তাহাদের কথা তো দূরের কথা যাহাকে ভালোবাসি তাহারই বা কতটুকু পরিচয় আমরা এই জগতে লাভ করি। প্রিয়জনের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক তাহাও বিচিত্র স্বার্থ, প্রয়োজন ও কর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই প্রয়োজনের বাহিরে তাহার যে অপরূপ, আশ্চর্য্য ও দুর্লভ প্রকাশ আমাদের প্রেমে তাহার কতটুকু প্রকাশ পায়। সেই বৃহৎ রূপটি আমাদের অগোচরে রহিয়া যায়। মৃত্যুতে সেই প্রিয়জন যখন হারাইয়া যায় তখন মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয় শূন্য হইয়া যায় সত্য কিন্তু ওই প্রেম আবার ওই মৃত্যুকেও জয় করিয়া উঠে। অর্থাৎ মানব প্রেম অন্তরের মধ্যে সেই প্রিয়জনের ভাব-রূপ গড়িয়া তুলিয়া অন্তরের মধ্যে তাহার নিবিড় আসঙ্গ লাভ করে। এ মিলনে আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকেনা।

অন্তরের মধ্যে প্রিয়জনের এই যে ধ্যান-রূপ তাহা কতকটা আসক্তি মুক্ত, প্রয়োজনের সীমার অতীত বলিয়া অনেক সত্য অনেক বড় অনেক বেশি সুন্দর।

মর্ত্ত্য প্রেমের এই স্বরূপ। এ প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, আবার বিচ্ছেদ আছে বলিয়া মানব প্রেমের মধ্যে এত তীব্রতা এমন ব্যাকুলতা। এই প্রেম বাহিরের বিচ্ছেদকে জয় করিয়া উঠে অন্তরে তাহারই ধ্যান-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়া। এই ভাবটি নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে—

"চন্দ্র হাসকে যে আমরা এত ভালবাসতুম তা জানতুম না।

"এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা খুশি তাই করেছি।

"যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।

"এবার যদি সে ফেরে, তাকে মুহূর্ত্তের জন্যে অনাদর করব না।

"আমার মনে হচ্ছে আমরা কেবলই তাকে দুঃখ দিয়েছি।

"তার ভালোবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।

"সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়েনি।"

জগতের দিকে তাকাইলে দেখা যায় সমস্ত কিছুই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এক রূপে 'নাই' হইয়া আর এক রূপে বিরাজ করিতেছে। সমাপ্তি বলিয়া নিঃশেষ বিলুপ্তি বলিয়া এ জগতে কিছু নাই। বিশ্বের সমস্ত কিছুই চলিতেছে রূপ হইতে রূপান্তর লাভের ভিতর দিয়া। বিশ্বসৃষ্টির ইহাই যদি স্বরূপ হয় মৃত্যুতে মানুষই শুধু অনস্তিত্ব হইয়া যায় এই বোধও নিশ্চিত রূপে মিথ্যা। বিশ্বের অন্তহীন চলায় মানবাত্মাও রূপ হইতে রূপান্তর লাভের ভিতর দিয়া ক্রমাগত চলিতেছে। মানুষ যদি এই সত্যটিকে গভীর করিয়া উপলব্ধি করে তবে তাহার আর মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যুর ভয় অনস্তিত্বের ভয়। যদি এই বোধ থাকে যে মৃত্যুতে মানব সত্তা সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইয়া যায় না তবে মৃত্যু আর বিভীষিকা হইয়া উঠে না। বস্তুতঃ এই বোধটিকে লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যুভয় জয় করিয়া উঠে।

"মনের ভিতর বলছে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে—তার পিছন পিছন আমিও যাব।"

প্রাণ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের যে স্বরূপ ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন উপরের আলোচনায় তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পর্কে যে দুই একটি জিজ্ঞাসা জাগে তাহা পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রাণ-তত্ত্বের দিক হইতে এ কথা সত্য যে প্রাণের যোগে প্রাণের প্রকাশ, আবার প্রাণের যোগে প্রাণের বিকাশ, অবশেষে প্রাণের মধ্যে প্রাণের অবসান। একথাও সত্য যে এই প্রাণের অনুভূতি যত গভীর ও যত বিস্তৃত হয় প্রাণের দুই বিশিষ্ট ধর্ম্ম অর্থাৎ আনন্দ ও বেদনা সেই সঙ্গে ক্রমাগত গভীর ও বিস্তৃত হইতে থাকে। একথাও সত্য যে প্রাণ প্রাচুর্য্য যাহার মধ্যে যত বেশি তাহার মধ্যে আসক্তি তত কম কারণ নিত্য নূতনকে সেই লাভ করিতে পারে নিত্য নূতন আনন্দ বোধের ভিতর দিয়া আবার প্রাণ প্রাচুর্য্যের জন্যই ত্যাগের শূন্যতাকে সহজেই জয় করিয়া উঠিতে পারে। এ কথাও সত্য প্রাণ-তত্ত্বে ধ্রুব কোন পরিণাম নাই, চূড়ান্ত কোন অবসান নাই, রূপ হইতে রূপান্তর লাভের ভিতর দিয়া আছে শুধু চিরন্তন চলা।

এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার জীবন ও জগতের একমাত্র সত্য সাক্ষাৎকার কি-না তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

মানুষের শোক তো এই জন্য নয়। মানুষ যে সেই বিশিষ্ট রূপটিকে ফিরিয়া লাভ করিতে চায়, মৃত্যুতে যে রূপ চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে।—প্রাণকে প্রিয় করিয়াছে যে বিশিষ্ট প্রাণ-রূপ। প্রাণের বক্ষে রূপ হারাইয়া যায়, আবার প্রাণের বক্ষে নূতন রূপ জাগে একথা সত্য কিন্তু সেই রূপটি। যাহাকে ভালোবাসিয়া বিশ্বের সকল রূপকে সকল প্রাণকে ভালোবাসিতে পারিয়াছি, তাহাকে তো অনন্ত জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়াও একটি বারের জন্যও লাভ করিতে পারা যাইবে না। মানুষের যত কান্না এই রূপের জন্য। তাহাকে লাভ করিতে পারা

যাইবে কোন তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া। আর নির্বিশেষ প্রাণের যে বিশেষ রূপের প্রকাশ তাহার যোগের রহস্যই বা কোন্ তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া উদ্ঘাটন করিতে পারা যাইবে। প্রাণ ও রূপ একই কিন্তু দুইয়ের প্রকাশে অন্তহীন ব্যবধান। ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায় না বলিয়াই তো রূপকে বলা হয় অনির্ব্বচনীয়। সর্দ্দার আবার এই মর্ত্ত্য-লোকে ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু যে সেই বিশেষ রূপে তাহা কোন তত্ত্ব-দৃষ্টি কোন অপরোক্ষ অনুভূতি আশ্রয় করিয়াও বলিতে পারা যায় না।

প্রাণ তত্ত্বকে জীবনের একমাত্র তত্ত্ব স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে আনন্দ ও বেদনার যুগ্ম তত্ত্বকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে প্রাণের সহিত প্রাণের যতদিন যোগ থাকে মানুষের কর্ম্ম ক্ষমতা ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, এই যোগ যতই শিথিল হইতে থাকে মানুষের কর্ম্ম ক্ষমতা ততই হ্রাস পায়। এই যোগ ছিন্ন হইয়া গেলে মানুষের কর্ম্ম ক্ষমতা লুপ্ত হয়। প্রাণের এই তত্ত্ব সেই সঙ্গে কর্ম্মের এই রহস্য স্বীকার করিলে প্রাণের আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিকেও জীবনের সকল পর্য্যায়ে সকল পরিণামে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জীবনের বেদনা পরিহার করিলে জীবনের আনন্দও অস্বীকৃত হইয়া যায় জীবন সকল কর্ম্ম প্রেরণা শূন্য হইয়া পড়ে।

এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে জীবনের এমন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার আছে যাহা লাভ করিতে প্রাণের এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার মানুষের কর্ম্মপ্রেরণাকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া দেয় না। কেবল তাহাই নয়, সে কর্ম্ম প্রেরণা এমন অচিন্তনীয় বেগ লাভ করে যাহার তুলনায় প্রাণের বেগ একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এই-তত্ত্ব দৃষ্টির আর একটি রহস্য এই যে ওই দৃষ্টি লাভ করিলে মানুষ মানবিক বেদনা বোধকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া উঠে, সেই সঙ্গে মানবিক আনন্দ বোধকেও। এই তত্ত্বের মধ্যে বেদনার কোন তত্ত্ব নাই। এই তত্ত্বের আদিও অন্ত আনন্দময়। তাহা লৌকিক আনন্দ বোধ নহে বলিয়াই তাহাকে বলা হয় অলৌকিক।

রক্তকরবী

বিশুর তখন প্রারম্ভিক যৌবন। সে কালে তাহার মধ্যে একদিকে প্রাণ যেমন অপরিসীম হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রাণের যে সম্পদ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি তাহাও অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহার অন্তর ও বাহিরকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইয়া বিশু অন্তরের গভীর হইতে গভীরতর লোকে যতই নিমজ্জিত হইয়াছে বহির্বিশ্বে সৌন্দর্য্যের একের পর এক দ্বার ততই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য ও রসবোধের এই যে ক্রম গভীরতা, ও প্রসারতা তাহা উৎকেন্দ্রিক হইয়া অসামঞ্জস্য বিধানের জন্য জীবনকে অধিক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। প্রাণের এই সাধনায় জীবনে সামঞ্জস্য এবং গভীরতর সার্থকতা ও সামর্থ্য লাভের জন্য তাই একটি বিগ্রহ দরকার। পুরুষের জীবনে নারী সেই বিগ্রহ। প্রাণের সাধনায় এই বিগ্রহ পুরুষের প্রাণের সমগ্র প্রয়াস, তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সকল ধ্যানকে একটা কেন্দ্রমুখীন করিয়া তুলে বলিয়া সেই প্রেম ও সৌন্দর্য্য-ধ্যান অন্তর ও বাহির, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে। এই সুসমঞ্জস্য সৌন্দর্য্য ও প্রেম জীবনে নানা সৃষ্টি প্রেরণারূপে প্রকাশ লাভ করে।

নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ও প্রেমের তত্ত্ব নিহিত। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই রহস্য নিহিত আছে বলিয়া পুরুষ প্রেমে নারীর প্রতি অমন গভীর আকর্ষণ বোধ করে। বস্তুতঃ পুরুষের সৌন্দর্য্য ও রস-সাধনায় নারী বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের প্রতীক হইয়া উঠে। অর্থাৎ পুরুষের প্রেম যত গভীর হয় নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের ততই প্রকাশ ঘটে এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের। পরিণামে এক অন্তহীন সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যে নারী ও বিশ্ব একাকার হইয়া যায়।

নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেম পুরুষের অন্তরে যেমন প্রাণের জাগরণ ঘটায় তেমনি বিশ্ব-প্রাণের যোগে ওই প্রাণকে ক্রম প্রসারিত ও গভীর করিয়া তুলে। প্রাণের অনুভূতিই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি। প্রাণ যতই প্রসারতা ও গভীরতা লাভ করিতে থাকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমও ততই নিঃসীম হইয়া পড়ে।

প্রথম যৌবনে বিশু একটি নারীকে ভালোবাসিয়াছিল। বিশু তাহাকে তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকের মাঝখানে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

নারী পুরুষের অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটাইয়া তাহাকে যেমন বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সহিত যুক্ত করিতে পারে, তাহার মুক্তি সাধনায় সহায়তা করিতে পারে, তাহার জীবনে আনন্দকে অফুরাণ করিয়া তুলিতে পারে তেমনি পুরুষের ওই জাগ্রত প্রাণকে নারী সম্পূর্ণ ভিন্ন-মুখীন করিয়া তুলিয়া তাহার জীবনে ঘোর বিনষ্টি ঘটাইতে পারে। নারীর মধ্যে সেই অসামান্য শক্তি আছে।

বিশুর প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা তাহার সমৃদ্ধ সৌন্দর্য্য-লোক তাহার প্রেমের পাত্রীর উপর সম্পূর্ণরূপে আক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে বাস্তব নারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষ প্রেমে এমনি করিয়া ভুল করিয়া বসে। যে সৌন্দর্য্য ও প্রেম মানুষকে রস-লোকে মুক্তি দেয় সেই সৌন্দর্য্য ও প্রেম মানুষকে বদ্ধ করে।

যে নারীকে বিশু ভালোবাসিয়াছিল সে নারী পুরুষের মুক্তি সাধনায় কখনই সহায়তা তো করিতে পারে না পরন্তু পুরুষের প্রেমের সুযোগ লইয়া আপনার স্থূল বাসনা ও কামনা চরিতার্থ করিতে চায়।

বিশু যক্ষপুরীর মধ্যে প্রাণের বিরুদ্ধ সাধনা লোকে কেমন করিয়া আসিতে পারে নন্দিনী একদিন বিশুকে সে প্রশ্ন করিয়াছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বিশু যে উত্তর দিয়াছে সেই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিশু। একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন

মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে ; আমি নিজেকে ভুলে ছিলুম।

"নন্দিনী। তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে।

"বিশু। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দ্দারের সোণার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে 'ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কতবড় তোমার সামর্থ্য'। আমি স্পর্দ্ধা করে বললুম, 'যাব নিয়ে'। আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নিচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।"

বিশুর অর্থলাভের জন্য সাধনা তাহার প্রেমের সাধনা। নারীর মধ্যে এই প্রেম ছিল না। সত্য প্রেমে অর্থ সঞ্চয়ের পশ্চাতে ভোগের পিপাসা নাই। বিশুর এই পিপাসা ছিল না। সে আপনার অন্তরে যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সন্ধান লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় বিশ্বের ভোগৈশ্বর্য্য কতটুকু, কত অকিঞ্চিৎকর। নারীর মধ্যে এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র আস্বাদ ছিল না বলিয়া বিশুর মধ্যে সে ওই বোধ জাগ্রত করিয়াছে। তাহার ভালোবাসার দোহাই দিয়া তাহার প্রেমের সত্যতা পরীক্ষা করিবার ছলে সে অর্থলাভের জন্য বিশুকে অত্যন্ত হীনকর্ম্মে নিয়োজিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ তো করে নাই, পরন্তু ওই সম্পর্কের মধ্যে সে এক প্রকার সুখেই ছিল। অর্থের জন্য সে আপনার মনুষ্যত্বকে যেমন বিসর্জ্জন দিয়াছিল তেমনি বিশুর মনুষ্যত্বকেও হত্যা করিতে সে ইতস্ততঃ করে নাই। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের স্বপ্নের মধ্যে বিভোর হইয়া বিশু প্রথমে এই আত্মহত্যা সম্পর্কে সচেতন হয় নাই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহার এই স্বপ্নের ঘোর ভাঙিয়াছে। বিশুকে যক্ষপুরীতে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইত। তাহার প্রেম তাহাকে এ কোন লোকে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে। এখানে মানুষকে মানুষের সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহার প্রাণের সকল সম্পদ।

বিশু অচিরেই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ওই পথ পরিহার করিয়াছে। তাহার মধ্যে সত্য প্রেম, গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা ছিল বলিয়া অত সহজে সে ওই নারীকে পরিহার করিতে পারিয়াছে। তাহার সত্য প্রেমের গভীরতা মিথ্যার চোরাবালির মধ্যে চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইতে পারে নাই। বিশু সে পরিচয় নিজের মুখেই দান করিয়াছে।

"যতদিন চরের উচ্চপদে ভরতি ছিলুম সর্দ্দারণীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যখন কাঙালদের দলে যোগ দিলুম ওপাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।"

প্রাণ প্রাচুর্য্য থাকিলে এবং জীবনে সত্য প্রেমের অনুভূতি থাকিলে মানুষ সহজেই প্রাণের শূন্যতা ভরিয়া তুলিতে পারে। বিশুও তাহার স্ত্রীর প্রতারণার অসহনীয় দুঃখ জয় করিয়া উঠিয়াছে। এ কথা নয়। প্রাণের সাধনায় প্রেমের আধার বিকৃত হইয়া গেলে (ইহার সহস্র বিধ কারণ থাকিতে পারে) মানুষ প্রাণের শূন্যতা জয় করিয়া উঠিতে পারে কিন্তু অন্তর চির অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে। এই সাধনায় মানুষ প্রাণের যতই গভীর হইতে গভীরতর লোক লাভ করিতে থাকে ততই অন্তহীন বেদনার এক একটি দ্বার যেন উদ্ঘাটিত হইতে থাকে।

বিশ্ব-প্রাণ তত্ত্বের সহিত ওতপ্রোত ভাবে দুটি তত্ত্ব বিজড়িত হইয়া আছে। একটি অসীম বেদনার আর একটি অন্তহীন আনন্দের। প্রাণের সাধনায় মানুষের অন্তরে ইহার যে-কোন একটি তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতে পারে তাহা নির্ভর করে মানুষের বিশেষ ঘটনা পরিবেশ এবং বিশিষ্ট মানসিক গঠনের উপর। বিশু প্রেমে পরিণামে দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত অন্তহীন বেদনা-লোকটিকে লাভ করিয়াছে।

বিশু নন্দিনীর মধ্যে যে মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছে সে মুক্তি সীমাহীন বেদনা-লোকে। বিশু নন্দিনীকে সে কথাও বলিয়াছে—

"নন্দিনী। বিশু পাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখ জাগানিয়া'?

"বিশু। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূত। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।"

অসীম আনন্দের তত্ত্ব বিশুর প্রেমে অসীম বেদনার তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধতর সত্তা লাভের জন্য মানুষের যে গভীর গোপন অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা প্রাণ সেই ব্যাকুলতাটিকেই গভীর হইতে গভীরতর করিয়া তুলে। এই ব্যাকুলতা গভীর নিবিড় সুখোচ্ছ্বাসের মত অনুভূত হইতে পারে, অন্যদিকে তীব্র বেদনা বোধও সঞ্চার করিতে পারে। ঊর্দ্ধতর সত্তা লাভের জন্য ব্যাকুলতা বিশুর অন্তরে বেদনার সুর ধ্বনিত করিয়াছে। বিশু বলিয়াছে—

"এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।"

বিশু ইহাকেই স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছে—

"কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দুঃখের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চির দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।"

বিশুর অন্তরে ঊর্দ্ধতর সত্তার আস্বাদ ছিল, সে আস্বাদ জীবনকে যে কোন্ সুধায় নিরন্তর ডুবাইয়া রাখে তাহারও কতকটা আভাস বিশু আপনার জীবনে লাভ করিয়াছিল বলিয়া অর্থের জন্য সাধনাকে বিশেষ করিয়া পাপবৃত্তিকে এবং ইহার ফলে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুকে সে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। জীবনের দুর্লভতা যাহারা বোধ করিয়াছে তাহারা পার্থিব আর কোন কিছুর বিনিময়ে তাহাকে বিকাইয়া দিতে পারে না। বিশু তাহার স্ত্রীর প্রেমের স্বরূপ জানিত, জানিত যে তাহার নিকট ঐশ্বর্য্য সম্মান ও প্রতিপত্তির মূল্য সবচেয়ে বেশি। ঊর্দ্ধতর মানবিক বোধের কোন আস্বাদ তাহার মধ্যে নাই। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠার লাঘব ঘটিলে ওই নারী যে-কোন সম্পর্ক এমনকি স্বামী সম্পর্কও ত্যাগ করিতে পারে এবং ওই অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় পুরুষের সহিত যে-কোন সম্পর্কও স্থাপন করিতে পারে। গোয়েন্দাগিরির পদ পরিত্যাগ করিতে তাহার স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশু জানিত মানুষের জীবনে এমন

সম্পদ আছে যাহাকে জগতের কাহারো জন্যও ক্ষয় করিতে পারা যায় না। মানুষের তাহা অধ্যাত্ম সম্পদ। মানুষের জীবনে সর্ব্বাধিক বঞ্চনা এই সম্পদ বিনষ্টির মধ্যে। ইহার অপেক্ষা বড় ক্ষতি বড় শোক মানুষের জীবনে আর কিছু নাই। ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবার জন্য বহির্জীবনের যে-কোন বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা বরন করিবার আনন্দ অপেক্ষা বড় আনন্দ আর কিছু নাই।

বিশিষ্ট একটি বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, সেই ধ্যান-রূপের মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য তাহার কতটুকু পরিচয় বাহিরের ওই কয়েকটি রেখা-বন্ধনের মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। অথচ বাহিরের বিগ্রহের সহিত তাহার যোগ কোন-না-কোন স্বরূপে যে থাকে তাহাও সত্য। বাহির হইতে যে রূপের মধ্যে কোন বিস্ময় নাই অন্তরের মধ্যে প্রেমের আলোকে তাহাই কোন অলৌকিক বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়।

বিশুর প্রেমে যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহা নন্দিনীকে আশ্রয় করিলেও তাহা যে কী অপরূপ, কী দুর্লভ তাহা যে কোন্ অপার্থিব সৌন্দর্য্যের আভাস বিজড়িত, ওই সৌন্দর্য্য-লোকের সীমা ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে তাহার মন যে কোন্ অগম পারের অসীম সৌন্দর্য্যকে অপরোক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া যায় তাহা বাহিরের লোক বুঝিবে কেমন করিয়া। বাহিরের লোকের অন্তরে নন্দিনীর জন্য সে প্রেম তো নাই তাই নন্দিনীর বিস্ময় রূপটি তাহাদের চোখে পড়ে না। প্রেমে সামান্যা নারীর অসামান্য রূপটি ধরা পড়ে। মানুষের অন্তরে যে অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা তাহা প্রথমে নারীর বাস্তব রূপটিকে আশ্রয় করে সত্য কিন্তু পরে ওই রূপ অন্তরের সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মধ্যে মানুষের মনকে অনেকটা মুক্তি দেয়। ইহা আদৌ অসীমের জন্য প্রেরণা বলিয়া মানুষের এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান পরিণামে রূপের সীমা ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। সৌন্দর্য্য তাহাকেই বলি যাহা মানুষের মনকে বস্তুর সীমার ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। বিশু যাহাকে ভালোবাসে সে নন্দিনী বটে আবার নন্দিনী নাও বটে। বিশুর অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক তাহা নন্দিনীর সৌন্দর্য্যেরও

অতিরিক্ত কিছু। বস্তুতঃ এক নির্বিবশেষ সৌন্দয্য ও প্রেমের প্রেরণা বিশিষ্ট এক একটি বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া নর-নারীর অন্তরে অনুভূত হইতেছে। বিশু একথা বলিয়াছে—

":বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখনি।

প্রেমে উর্দ্ধতর চেতনার জন্য এই যে ব্যাকুলতা তাহার ফল লাভটিকে বাহিরে পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। মর্ত্ত্যের যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে এই ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায় তাহাকে বাহিরে লাভ করা কিংবা না-করা প্রেম সাধনায় একান্ত গৌণ কিংবা আদৌ কোন সমস্যা নয়। প্রেম উর্দ্ধতর সত্তা লাভের জন্য যে ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করিয়া দেয় সেই নিত্য অতৃপ্তি ও অহর্নিশ জাগরণের ভিতর দিয়া মানুষের অন্তরের সকল সম্পদ আত্ম প্রকাশ লাভ করে। অন্তরের সকল ঐশ্বর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া এই যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠা প্রেমে ইহার অধিক ফল লাভ আর কিছু নাই। নন্দিনী বিশুর বেদনার দিকটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহার অন্তরের প্রাপ্তির দিকটি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

"নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

"বিশু। তোর সেই কিছু না দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব।" বিশু কিশোরের ফল লাভ সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছে সে কথা তাহার সম্পর্কেও সত্য।

"নন্দিনী। এ কথা কোনদিন ভুলতে পারব না যে তোমাকে শূন্য-হাতে বিদায় দিয়েছি। আর ওই যে বালক কিশোর ও আমার কাছ থেকেকী বা পেলে।

"বিশু। মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই।"

সকল প্রাণের ভিতর দিয়া যে নির্বিবশেষ প্রাণের লীলা চলিতেছে,

বিশু আপনার জীবনে সকল রূপের মধ্যে সকল রূপের অতীত করিয়া সেই এক প্রাণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল বলিয়া তাহার মধ্যে আত্মত্যাগ অত সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, প্রাণের পূজায় আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে বিশু প্রাণের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। বিশু নন্দিনীর নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে শেষ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে—"এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।"

প্রাণের যোগে প্রাণের উপলব্ধির ভিতর দিয়া প্রাণের ধীর বিকাশ ও পরিপূর্ণতা জীবনের ইহাই একমাত্র সার্থকতা। এমনি সার্থক এক একটি জীবন যেন পরিপক্ক এক একটি শস্য কণা। মৃত্যুতে বিধাতার কোন্ ভাণ্ডারে যুগযুগান্ত কাল ধরিয়া যে সেইগুলি সঞ্চিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে। মর্ত্ত্য হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইবার পূর্ব্বে বিশু নন্দিনীকে সে কথা বলিয়াছে।

"মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল।"

বিশুর মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণের প্রকাশ সেই এক প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যায় রঞ্জনের মধ্যে। প্রাণের উপর সহস্র অত্যাচার সত্ত্বেও যে প্রাণ যুগে যুগে অপরাজেয় প্রাণের জয় ঘোষণা করিয়াছে বিশু ও রঞ্জন তাহারই এক একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। বিশ্বকে নিঃশক্তি করিবার প্রাণ সম্পদে দেউলিয়া করিয়া দিবার নানা ষড়যন্ত্র নানা পৈশাচিক অত্যাচার সত্ত্বেও বিশ্বে প্রাণের সম্পদ ফুরাইয়া যায় নাই বিশু রঞ্জনের মত মানুষের জন্য। তাহাদের বাহিরের আত্ম ত্যাগটা বড় কথা নয়, তাহারা চিরন্তন প্রাণের জয় ঘোষণা করিয়াছে এইটাই বড় কথা।

প্রেমে বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া প্রাণ জাগে। প্রাণের এই উপলব্ধি যত গভীর হয় বিশ্ব-প্রাণের সহিত অন্তরের যোগ তত ব্যাপ্তি লাভ করে। পরিণামে ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের সহিত পূর্ণ মিলনে পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। বিশু ও রঞ্জন উভয়ের জীবনে প্রাণের এই বিকাশ ও পূর্ণ পরিণামটিকে প্রত্যক্ষ করিতে

পারা যায়। কিন্তু প্রাণের এই উপলব্ধি উভয়ের জীবনে এক নয়। বলিয়াছি বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্বে দুটি তত্ত্ব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত— একটি আনন্দের আর একটি বেদনার'। প্রাণের এই উপলব্ধি কাহারো জীবনে বেদনার কাহারো জীবনে আনন্দের। প্রাণের উপলব্ধি আনন্দের কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় কাহারও জীবনে পরম দুঃখের। যে আধারটি আশ্রয় করিয়া প্রেম উপলব্ধ হয় সেই আধারটি যদি কোন কারণে বিকৃত হইয়া যায় তবে বেদনায় আর অন্ত থাকে না। বিশুর বেদনার সেই বিশিষ্ট কারণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহার সহস্র কারণ থাকিতে পারে।

রঞ্জনকে প্রেম জীবনে কোন বঞ্চনা লাভ করিতে হয় নাই। নন্দিনীকেও না। উভয়ের হৃদয়ে প্রাণের অনুভূতি তাই আনন্দের তুফান তুলিয়াছিল। বিশুর জীবনে প্রাণের অনুভূতি যত গভীর হইয়াছে, বিশ্ব-প্রাণকে সে যত গভীর করিয়া আপনার মধ্যে লাভ করিয়াছে তাহার বেদনা তত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে! অন্য দিকে রঞ্জন ও নন্দিনী প্রাণকে যত গভীর করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে উভয়ের মধ্যে আনন্দ তত সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে। নন্দিনীর এক প্রাণ উভয়ের মধ্যে দুই ভিন্ন স্বরূপে উপলব্ধ হইয়াছে। নন্দিনী প্রাণের এই দুটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ বিস্মিত হইয়াছে। নন্দিনী বিশুকে সে কথা বলিয়াছে—

"নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে-দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাইনি।

"বিশু। কেন, রঞ্জনের কাছে?

"নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়: লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে।

প্রাণ দিয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে।"

বিশুও নন্দিনীর ভিতর দিয়া রঞ্জনের প্রাণের সেই আনন্দ স্বরূপের কতকটা আভাস লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া রাজা যখন নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিল, "ও কে তোমার সঙ্গে। রঞ্জনের জুড়ি নাকি।" বিশু তখন তাহার উত্তরে বলিয়াছিল, "না রাজা আমি রঞ্জনের ওপিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না—আমি অমাবস্যা।"

(২)

অন্তর দিয়া যাহাকে উপলব্ধি করিতে হয় যাহাকে বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, যাহা কেবল মাত্র বোধের, একান্ত তার অধ্যাপক জীবনে তাহাকে সভয়ে পরিহার করিয়াছে। বুদ্ধির সীমার মধ্যে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার মধ্যে কোন কিছুকে একান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া লাভ না করিলে তাহার মন অশান্ত হইয়া উঠে। মানুষের বুদ্ধির অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত যে সীমাহীন জগৎ তাহাকে অধ্যাপক সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করিয়াছে তাহার সাধনা যে জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে চায় তাহা বস্তুজ্ঞান। ইহা সেই জ্ঞান যাহার আশ্রয়ে মানুষ বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিতে পারে।

যে এক শ্রেণীর মানুষ পার্থিব ভোগ সুখের পরিমানকে নিত্যদিন বাড়াইয়া তুলিবার কার্য্যে নিযুক্ত যাহারা প্রকৃতির শক্তিকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে চায় অধ্যাপক তাহাদের সেই জ্ঞান যোগান দিয়াছে। মানুষের উন্নততর আর যে সহস্র সত্তা আছে, মানুষ সেই সত্তাতে যে সার্থকতা লাভ করিতে চায় এবং ওই সত্তায় সার্থকতা লাভ না করিতে পারিলে যে মনুষ্য জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা অধ্যাপক জানে না। তাহার প্রাণের মধ্যে সেই জাতীয় কোন ক্ষুধা তখনও পর্য্যন্ত জাগে নাই।

অধ্যাপকের অন্তরে প্রথম বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে নন্দিনী।

নন্দিনীর অসামান্য সৌন্দর্য্য, মুক্ত প্রাণের অবাধ লীলা, অমন আনন্দময় অখণ্ড সঙ্গীতের মত সত্তার প্রকাশ অধ্যাপকের অন্তরকেও উৎসুক করিয়াছে। রূপের মধ্যে বিশ্ব-প্রাণের সেই রহস্য নিহিত আছে। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাণ ব্যক্তি চিত্তে আপনাকে অনুভূত করাইতে চায়। বস্তুতঃ মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্ব-প্রাণের সেই অনুভূতি লাভ ঘটে বলিয়া আমরা কোন কিছুকে বলি সুন্দর। সৌন্দর্য্যের প্রভাব মানব চিত্তে তাই এমন অমোঘ ও অনিবার্য্য।

নন্দিনীর আনন্দ স্পর্শে অধ্যাপকের অন্তরেও তাই এমন প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে প্রাণ অনুভূত হয় তাহা যতই গভীরতা লাভ করিতে থাকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মানুষ ততই নিবিড় একাত্মতা বোধ করে। বিশ্ব-প্রাণই রূপে রূপে অনন্ত রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। ব্যক্তি-প্রাণ প্রসারিত হইয়া বিশ্ব-প্রাণকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে বিশ্ব-রূপের সহিত মানুষের ততই মিলন সাধিত হইতে থাকে। এই মিলনই আনন্দের। বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগ যতই গভীর হয় মানুষের অন্তরের সুপ্ত ঐশ্বর্য্যের ততই প্রকাশ ঘটিতে থাকে। বিশ্ব-প্রাণের সহিত পূর্ণ মিলনে মানুষের সুপ্ত সকল ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে বলিয়া এইরূপে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রাণের যোগে প্রাণের আস্বাদ লাভ, প্রাণের ক্রম প্রসারতার ভিতর দিয়া জীবনের ধীর বিকাশ ও পূর্ণতা, পরিণামে প্রাণের মধ্যে প্রাণের নিঃশেষ অবসান—প্রাণের ইহাই একমাত্র তত্ত্ব।

অধ্যাপক নন্দিনীকে আপনার ঘরে আহ্বান করিতে নন্দিনী বলিয়াছে 'আমাকে তোমার কিসের প্রয়োজন।' কারণ নন্দিনী জানে সে জীবনের যে অর্থ বহন করে এবং জীবনকে যে ভাবে অর্থান্বিত করিতে চায় অধ্যাপকের জীবনের উদ্দেশ্য তাহার একপ্রকার সম্পূর্ণ বিপরীত। অধ্যাপকের জীবনের উদ্দেশ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করা, বস্তুভার সঞ্চয় করা, বস্তুর শক্তি আহরণ করা। নন্দিনীর জীবনে যদি কোন তত্ত্ব থাকে তবে তাহা একমাত্র আনন্দের ;

নন্দিনী জীবনে যদি কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চায় তবে তাহা আত্মার, বস্তুজ্ঞানের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া উহা লাভ করিতে হয়। নন্দিনী যে-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া আছে বস্তুজগৎ তাহার প্রধানতম ও প্রবলতম বাধা। অধ্যাপকের জগৎ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও নিরীক্ষার, নন্দিনীর জগৎ অনুভূতি ও বোধের ; সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া উহাদের ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয়াতীতের। অধ্যাপকও নন্দিনীর এই স্বরূপ জানে। জানে যে নন্দিনী এবং তাহার জগতের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। নন্দিনী প্রয়োজনের কথা তুলিতে অধ্যাপক তাই বলিয়াছে,—'কিন্তু সুন্দরী তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।"

নন্দিনীকে যদি লাভ করিতে হয় তবে তাহাকে লাভ করিতে হইবে মুক্ত স্বরূপে আপনি মুক্ত হইয়া। আনন্দকে লাভ করিতে হয় আনন্দময় হইয়া। আপনি মুক্ত না হইয়া মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব।

যাহা একান্ত বোধের জগৎ, যাহা প্রত্যক্ষকে ছাড়াইয়া নিয়ত অপ্রত্যক্ষের মধ্যে উপচাইয়া পড়িতে চায়, যাহা বিষয় ভোগ বাসনা, ও বিষয়জ্ঞান তৃষ্ণাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলে তাহার সম্পর্কে অধ্যাপক শুধু অনভিজ্ঞ নয়, উহাকে লাভ করিবার চেষ্টাকে অধ্যাপক জীবনের অপচয় বলিয়াই জানে। নন্দিনী তাই অধ্যাপককে বিদ্রূপ করিয়াই বলিয়াছে।

"তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।"

অধ্যাপক তখনও পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করে নাই। তাহার জীবনের তখনও পর্য্যন্ত অবশেষ ছিল। এই অবশেষ ছিল বলিয়া যত ক্ষণকালের জন্যই হোক, নন্দিনীকে তাহার ভালো লাগে, তাহার আসঙ্গ লাভের জন্য অন্তরে কেমন যেন এক ঔৎসুক্য বোধ সঞ্চারিত হইয়া যায়—এক

অপরূপ বেদনা। আর এই বেদনা বোধের ভিতর দিয়া পৃথিবীর যাহা কিছু সুন্দর, যাহা সকল প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সম্পূর্ণ পৃথক এক অনুভূতির জগৎ। তাহাতে জীবনের আপেক্ষিক মূল্য বোধ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অধ্যাপক নন্দিনীকে সে কথা বলিয়াছে—

"অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি, তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যা তারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে উঠে।"

বিশ্বের রূপ যেন এক একটি গবাক্ষ। যাহারা বুক পাতিয়া বুক দিয়া দেখিতে জানে তাহারা ইহার ভিতর দিয়া ওপারের অসীম লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। নন্দিনী তেমনি একটি গবাক্ষ। ইহার ভিতর দিয়া মানুষ তাহার অসীমের আভাস লাভ করিয়া ধন্য হয়।

কিন্তু আভাস লাভ করিলে কী হইবে। সমগ্র জীবনের রূপান্তর অত সহজে হয় না। তাহার জন্যে দীর্ঘকালের মনন প্রয়োজন। অধ্যাপকের মানসিক গঠনটাই অমনি। কোন কিছুকে তত্ত্বান্বিত করিয়া অর্থাৎ যুক্তি বিচারের ভিতর দিয়া লাভ না করিতে পারিলে তাহার কোন মতেই চলে না। দীর্ঘ জীবনের এই স্বভাবটিই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্ত করবীর অভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।" অধ্যাপক সময় নষ্ট করিতে চাহিলে কী হইবে। অধ্যাপক সময় নষ্ট করিতে পারে না। যে সৌন্দর্য্য তাহাকে উৎসুক করিয়াছে, সেই ঔৎসুক্যের তত্ত্ব সে উদ্ঘাটন করিতে চায়, তাহার অর্থটি লাভ করিতে চায়। অধ্যাপকের মন এমনি যে বস্তু বা বস্তুজ্ঞানের সহিত অন্বিত করিয়া কোন কিছু লাভ না করিতে পারিলে তাহা তাহার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হয়। জীবনকে দুই দিক হইতে দেখা আছে,—একটি বস্তু বা বস্তুজ্ঞানের দিক হইতে, অপরটির স্বরূপ নির্দ্দেশ অসম্ভব বলিয়া কেবল নিষেধাত্মক সংজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বস্তু বা বস্তুজ্ঞান ব্যতিরিক্ত আত্মার

দিক। অধ্যাপক এই জগতের একটা আভাস নন্দিনীর ভিতর দিয়া লাভ করিলেও উহাকে আশ্রয় করিতে হয় কেমন করিয়া, উহাকে আশ্রয় করিলে জীবন ও জগতের কোন্ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য এবং কোন্ অর্থ তাহা অধ্যাপক জানে না। তাই অধ্যাপকের পক্ষে এমন উক্তি করা সম্ভব হইয়াছে।

"তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।"

এমনি করিয়া অধ্যাপকের জীবনে ধীর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে পরিণামে অধ্যাপক ওই জীবনটিকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিয়াছে।

পরিপূর্ণ প্রাণটিকে লাভ করিতে অধ্যাপক পরিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে। বুদ্ধি দিয়া নয়, কোন বস্তু বা বস্তুজ্ঞান দিয়াও নয় একমাত্র প্রাণ দিয়া প্রাণকে উপলব্ধি করিতে হয়।

(৩)

অধ্যাপকের জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছে রাজা। অধ্যাপকের নিকট হইতে রাজা যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছে তাহা বস্তুর জ্ঞান, তাহার সহায়তায় কেবল বস্তুজগতের বিপুল শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। অধ্যাপকের জ্ঞান আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন রাজা সেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। এই অমিত শক্তি লইয়া জীবনে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং এই শক্তি সেই উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে কতটুকু সহায়তা করে, এই শক্তি সঞ্চয় সমগ্র জীবনের কতটুকু অংশ ইহা রাজা কোনদিন ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। বস্তুর ক্ষমতা আহরণে একটা উন্মত্ততা আছে, উহা যতই বাড়িয়া যায় উন্মত্ততাও ততই বাড়িয়া চলে উন্নততর জীবনের সকল প্রেরণা ততই আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

রাজা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনাদর্শের সম্মুখীন যে কখন হয় নাই তাহা নহে, তবে ওই জীবন সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা তাহার অন্তরে কোন দিন জাগ্রত হয় নাই। মানুষের জীবনে জিজ্ঞাসা জাগে

তাহার বিশিষ্ট গভীর অধ্যাত্ম পিপাসা হইতে। সে পিপাসা তখনও পর্য্যন্ত রাজার অন্তরে জাগ্রত হয় নাই। কিংবা পিপাসা জাগ্রত হইলেও তাহার নিবৃত্তির জন্য রাজা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ রাজার অন্তরে যতই অধ্যাত্ম শূন্যতা জাগিয়াছে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য রাজা তত অধিক পরিমানে বস্তুভার বাড়াইয়াছে, বস্তুর ক্ষমতা আহরণের জন্য ততই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য কোন ফলাফল গননার মধ্যে আনয়ন করে নাই।

রাজা যে পথ আশ্রয় করিয়াছে তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা ও স্পষ্ট উপলব্ধির পথ। যাহাকে ইন্দ্রিয় বোধের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে লাভ করিতে পারা যায় না তাহাকে রাজা আপনার জীবনে যেমন অন্য কাহারও জীবনে তেমনি স্বীকার করে না। বাহিরের বিপুল জগতের প্রতি রাজার ঔৎসুক্য থাকিলেও রাজা তাহাকে ইন্দ্রিয় বোধের ভিতর দিয়া লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, পরিশেষে ব্যর্থ হইয়া ওই জগৎকে শুধু অস্বীকারই করে না, উহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। যাহাকে ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া লাভ করিতে পারা যায় না তাহার অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই।

বিশ্বের অফুরন্ত প্রাণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আশ্রয় করিয়া বিশ্ব প্রাণের উপলব্ধি লাভ করিতে হয়। কোন্ রহস্য প্রাণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহা বোধ করিতে হয় প্রাণের নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া। আর কোন উপায়ে প্রাণের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের একই তত্ত্ব নর-নারীর সৌন্দর্য্য ও প্রেমবোধ্যে মধ্যে। বিশ্বের মধ্যে, বিশ্বের নর-নারীর মধ্যে প্রাণের, সোন্দর্য্য ও প্রেমের অনাদ্যন্ত লীলা রাজা প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিন্তু ওই বিপরীত জীবন বোধের জন্য আপনার জীবনে তাহাকে সত্য করিয়া লাভ করিতে পারে নাই। এই ব্যর্থ আক্রোশে বিশ্বের সোন্দর্য্য ও প্রেম তাহার অপরূপ প্রাণের প্রকাশ নিরুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে।

ফুলের মত সহজ ও সুন্দর দুর্ব্বাদলের মত শ্যামল প্রাণের সেই

অপরূপ প্রকাশ রাজা নন্দিনীর মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্ব-প্রাণ-লীলা হইতে যেমন, নন্দিনীর প্রাণ-লীলা হইতেও তেমনি রাজা নির্ব্বাসিত। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের উপলব্ধির ভিতর দিয়া কেবল প্রাণের মধ্যে প্রাণকে কেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে হয় তাহা রাজা জানে না। রাজা নন্দিনীর প্রকাশকে উপলব্ধি করিতে চায় বাহির হইতে। সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে বাহির হইতে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। রাজা নন্দিনীকে তাই বলিয়াছে—

"নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন ? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙে চুরে ফেলতে চাই।"

নিখিল বিশ্বের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যায় অন্তহীন প্রাণ স্পন্দনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অচিন্তনীয় বস্তুভার বাঁশির সুরের মত লঘু হইয়া স্পন্দিত হইতেছে। বীণাকরের বীণার এক একটি ছিন্ন তারের মত এক একটি রূপের জগৎ অন্তহীন দেশ-কালের বক্ষে নিঃশব্দ সুরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ আপনার অন্তরে প্রাণকে যতই গভীর করিয়া উপলব্ধি করে, অর্থাৎ জীবনে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি যত গভীর হয় বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগ তত নিবিড় হয়, এই নিবিড় যোগের অনুভূতি আনন্দের অনুভূতি। এই আনন্দের বোধ যত গভীর হয় মানুষের জীবনে সৃষ্টি প্রেরণা তত অফুরাণ হইয়া উঠে। এই যে সৃষ্টি-প্রেরণা তাহা অন্তর হইতে বিশ্বের যোগে লব্ধ বলিয়া তাহার সহিত জীবন বিকাশের তত্ত্বও বিজড়িত। অর্থাৎ ওই সৃষ্টি প্রেরণা আবার জীবনকে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলে।

রাজার সৃষ্টির যে প্রেরণা তাহা বিশ্ব-প্রাণের যোগের অনুভূতির প্রেরণা নয়, তাহা তাই আনন্দের, জীবন বিকাশের প্রেরণা নয়। রাজার প্রয়াস বিশ্বের আনন্দের সহিত যুক্ত নহে বলিয়া তাহা কেবল

প্রয়াস মাত্র, তাহা ক্রমাগত ভার বর্দ্ধিত করিয়া জীবনকে পিষ্ট ও দলিত করে। সে বস্তুভার বহনের সামর্থ্য মানুষের নাই। জীবন তাহাতে পঙ্গু বিকল হইয়া যায়।

বিশ্বের সেই মুক্ত আনন্দ রূপটিকে রাজা নন্দিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু কোন্ রহস্যে নন্দিনী বিশ্বের আনন্দ রূপটিকে আপনার জীবনে সত্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা রাজা জানে না: কারণ রাজা আদৌ যে পথটিকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ, তাহাই বিশ্বের আনন্দ তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করিবার প্রবলতম বাধা।

"নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখেছ।

"নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

"নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

"নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারী নট বালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর।"

বিশ্ব-প্রাণের আনন্দ প্রেরণায় যে সৃষ্টি রাজা সেই সৃষ্টি-প্রেরণা বঞ্চিত। আর প্রাণের আনন্দ প্রেরণা বঞ্চিত সৃষ্টি প্রয়াস রাজার জীবনকে ক্রমাগত সীমিত করিয়াছে। সেই প্রভূত সঞ্চয়ের ভারে রাজার হৃদয় নিত্য নিষ্পেষিত। তাই তো রাজার প্রাণ ভরিয়া অমন দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিয়াছে।

"পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্ত্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।"

প্রেমে প্রাণের উপলব্ধি ঘটে। প্রেমোপলব্ধির গভীরতার সঙ্গে প্রাণও তাই পরিমিত হইয়া পড়ে। প্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন এই জন্য একান্ত সহজ। ওই আত্ম বিসর্জ্জনের: ভিতর দিয়া প্রাণ তাহার

অসীমতা উপলব্ধি করে। কিংবা বলা যায় প্রেমে অনন্ত প্রাণের উপলব্ধি ঘটে বলিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন শূন্যতার ভীতি জাগ্রত করে না। মৃত্যু মহৎ বিনষ্টি বলিয়া বোধ হয় যদি বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া ব্যক্তি প্রাণের প্রকাশটিকে সত্য করিয়া উপলব্ধি না করি। প্রেম ব্যক্তি-প্রাণকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করে বলিয় এবং এইরূপে এক অন্তহীন প্রাণের যোগে সকল প্রাণের অস্তিত্বের উপলব্ধি ঘটে বলিয়া প্রাণের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে আর অনস্তিত্বের ভয় জাগে না।

রাজা প্রাণের এই তত্ত্বটিকে জানে না। জীবনের সার্থকতা বলিতে রাজা বাহিরের ফল লাভটিকে বুঝে। এই ফল লাভের জন্য মৃত্যু পণও বুঝে। কিন্তু অন্তরের যে আস্বাদে মানুষ প্রাণ দেয় তাহার বাহিরে কোন পরিমাপ নাই বলিয়া রাজা তাহাকে বুঝিতে পারে না। যে ফল লাভ অন্তরের, মানস-লোকের, কিংবা তাহারও ঊর্দ্ধতর অধ্যাত্ম-লোকে তাহার কোন উপলব্ধি রাজার জীবনে নাই বলিয়া রাজার নিকট তাহা একান্ত শূন্যতার বোধ বলিয়া বোধ হয়। নন্দিনীর নিকট যে উপলব্ধি সত্য রাজার জীবনে সে উপলব্ধির আস্বাদ নাই বলিয়া মিথ্যা এবং এই জন্য নন্দিনীর উপলব্ধিতে রাজার এমন সংশয়। নন্দিনী বিশুকে একথা বলিয়াছে—

"ওর জন্য প্রাণ দিতে পার ? আমি বললুম, 'এখ্খনি'। ও যেন রেগে গর্জ্জন করে বললে, 'কখ্খনো না'। আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।'

রাজা লাভ বলিতে বস্তু জগতের ফল লাভটিকে বুঝে, যাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সকল ইন্দ্রিয় দিয়া বোধ করিতে পারা যায়। যে ফল লাভ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, যাহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, তাহার জন্য মানুষের এত সাধনা এত দুঃখ ভোগ এত আত্মবিসর্জ্জনের কোন অর্থ রাজা খুঁজিয়া পায় না বলিয়া অমন বিস্মিত হইয়া কতকটা বিহ্বল হইয়া অবোধের মত নন্দিনীকে প্রশ্ন করিয়াছে তাতে তোমার লাভ কী ?'

এমনি করিয়া নন্দিনী রাজাকে এমন একটা জগতের দ্বার প্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে যে জগতের সহিত তাহার কোন পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না। এই অপরিচয়ের জন্য আবার রাজার অন্তরে যে মন বিস্ময় আছে তেমনি অপরিচিত বলিয়া ইহার অস্তিত্ব রাজার নিকট অসহনীয় বোধ হইয়াছে।

আয়ুষ্কালকে যতদূর ইচ্ছা বৰ্দ্ধিত করা যাক-না-কেন তাহাতে জীবনের অর্থলাভ ঘটে না, জীবন তাহাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে না। কেবল অস্তিত্বমাত্র বজায় রাখিয়া কেমন করিয়া টিকিয়া থাকিতে হয় তাহার তত্ত্ব এবং কেমন করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া সমগ্র করিয়া লাভ করিতে হয় তাহার তত্ত্ব এক নয়। রাজা বস্তুর শক্তি আশ্রয় করিয়া কেবল অস্তিত্ব মাত্র বজায় রাখিবার তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিল। বহির্জগতের বিপুল শক্তি লীলায়িত করিয়া আপনাকে বিরাট রূপে উপলব্ধি করিবার যে আনন্দ রাজা সেই আনন্দকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অন্তরে আর যে এক সীমাহীন জগৎ আছে সেই জগতের উপলব্ধি মানুষকে মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সকল মুহূর্ত্তের অতীত লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে, এই উপলব্ধিতে যে দেশ-কালের পরিমাপ নাই, আত্যন্তিক নিবিড় উপলব্ধির মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য সে বাঁচায় যে আর সমস্ত কিছু অপ্রমাণ হইয়া যায় রাজা তাহা জানিত না।

নন্দিনীর সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে রাজার জীবনে প্রথম জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। রাজা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছে জীবনে বাহিরের উপকরণ, বস্তু সম্ভারের পর বস্তু সম্ভার যতই বৰ্দ্ধিত করা যাক্-না-কেন, বহির্জগতে শক্তি যতই সংগ্রহ করা যাক্-না-কেন, তাহাতে জীবনের অর্থ লাভ করিতে পারা যায় না, নিখিল বিশ্বের মর্ম্মমূলে যে প্রাণ ও আনন্দ তত্ত্ব জীবনে তাহার কোন উপলব্ধি ঘটে না। সকল বস্তু, সকল সীমার উর্দ্ধে মানবাত্মার যে চির মুক্ত স্বরূপ তাহার কোন উপলব্ধি এই জীবনে লাভ করা অসম্ভব। যদি তাহাই হয় তবে এই জীবনে লাভ কি? বস্তুর রহস্য একের পর এক যতই উদ্‌ঘাটিত করা যাক-না-

কেন, তাহাতে বস্তু চিরকাল অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহা কোন একটা পরিণামে মানুষকে আনন্দ-লোকে চির মুক্তি দান করিতে পারে না। আপনার পথটাকে রাজা সেই প্রথম অশ্রদ্ধা করিয়াছে ; আর বস্তুর সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অবাধ প্রাণের মুক্ত প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া আসিতে চাহিয়াছে—যেখানে প্রাণ প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য রূপে, নর-নারীর মধ্যে মাধুর্য্য ও প্রেমরূপে নিত্য প্রকাশ লাভ করিতেছে। রাজা নন্দিনীকে তাই বলিয়াছে—

"এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এই ভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম ; কি করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম নিরন্তর টিঁকে থাকার থেকে দিলুম মুক্তি।"

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি মানুষের জীবনে সামগ্রিক অনুভূতি। আর সামগ্রিক অনুভূতি বলিয়া তাহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে, পারা যায় না। কারণ মানব বুদ্ধি বিশ্লেষণাত্মক। এই বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি দিয়া মানুষ কোন কিছুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লাভ করিতে পারে। খণ্ডের বোধ দ্ব গুর উপলব্ধি লাভ অসম্ভব। সমগ্রতাকে বোধ করিতে তাই বুদ্ধির পথ পরিহার করিতে হয়।

কিন্তু মানুষের বিশেষ করিয়া রাজার পক্ষে বুদ্ধি ছাড়াইয়া উঠা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

নন্দিনীর ভিতর দিয়া বিশ্বের আর সকল সৌন্দর্য্যের ন্যায় রাজা অন্তরের মধ্যে অনিবার্য্য আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু রাজা তাহাকে আর সকল জ্ঞানের সামগ্রীর ন্যায় বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিতে চায়। বুদ্ধি দিয়া যে-কোন সীমার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, কিন্তু যে-বোধ অসীমের তাহাকে বুদ্ধি দিয়া লাভ করা যায় না। রাজা তাই পার্থিব জীবনে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া জ্ঞান রাজ্যের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌছাইয়া সৌন্দর্য্যও মাধুর্য্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

নন্দিনীর সহিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া রাজার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"রাজা। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

"নন্দিনী। কোন তুমি নিষ্ঠুর।

"রাজা। আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।"

সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে, প্রাণকে উপলব্ধি করিতে হয় একমাত্র অন্তরে প্রাণের বোধ, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ জাগ্রত করিয়া। যে জীবন প্রাণের সম্পদে একান্ত ক্ষীণ, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ঐশ্বর্য্যে একান্ত দীন সে জীবন আর কোন উপায়ে সৌন্দর্য্য ও প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে না। এ জগতের দ্বার তাহার নিকট চির রুদ্ধ। জীবনে যৌবনকে বা প্রাণকে নিরুদ্ধ করিয়া বিশ্বের প্রাণ-শক্তিকে অকাতরে হত্যা করিয়া রাজা প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছে, যেন এমন করিয়া প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায়।

অথচ নন্দিনীর সান্নিধ্যে কেমন করিয়া রাজার প্রাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, বিশ্বের প্রাণ-ধারায় ধীরে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, এক অলৌকিক বিস্মৃতি ও অনুভূতির মধ্যে ধীরে তলাইয়া যাওয়া—আর কিছু নয়। রাজা তাহার এই অনুভূতির কথা নন্দিনীকে বলিয়াছে ঃ

মনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা। আমার এই হাত দুটো সেদিনতার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।"

মানুষ যেখানে জীবনে একমাত্র বুদ্ধি ও বস্তুকে আশ্রয় করে সেখানে

মৃত্যু অনিবার্য্য রূপে অনস্তিত্বের বোধ জাগ্রত করে। এই অনস্তিত্বের বোধ মানুষের জীবনে অসহনীয়। এই অস্তিত্ব বোধের জন্য মানুষ তাই বিশ্বের সকল প্রাণ হত্যা করিতে বস্তুর সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করে না। মানুষ যখন আপনার প্রাণের ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রাণের অনন্ত অস্তিত্ব বোধ করে, তখন মানুষ বোধ করে প্রাণের যোগে প্রাণের সার্থকতা, প্রাণের সম্পূর্ণতা, মৃত্যুতে প্রাণের মধ্যে প্রাণ চির বিশ্রাম লাভ করে। প্রাণের উপলব্ধির জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহাতে বিশ্বের সহিত প্রাণের যোগে প্রাণের একাত্মতা বোধ জাগ্রত করে বলিয়া আর অনস্তিত্বের ভয় থাকে না। বিশ্ব-প্রাণের যোগে বিশ্বের সহিত মিলিত হইয়া যে বাঁচা রাজা পরিশেষে আপনার জীবনে তাহা উপলব্ধি করিয়াছে। প্রাণের জন্য রাজা তাই আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ইতস্ততঃ বোধ করে নাই। প্রাণের সংগ্রামে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে রাজা সে কথা বলিয়াছে।

"মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।"

(৪)

রক্তকরবী নাটকে বর্ত্তমান সভ্যতা ও মনুষ্য-সমাজের সমস্যার যে কয়েকটি দিক উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনারও প্রয়োজন আছে, অবশ্য ইহা সাহিত্য আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না হইতেও পারে।

বর্ত্তমান মনুষ্য সভ্যতা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে মনুষ্যত্ব সাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক বলা যাইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুতঃ যে শক্তি আয়ত্ত করিতে চায় এবং যে শক্তির সহায়তায় সে বিচিত্র ভোগের সম্পদকে ক্রমাগত স্তূপীকৃত করিয়া তুলিতেছে তাহাতে মানুষের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, কিন্তু মানুষের আর সকল উন্নততর সত্তা বিকাশের কোন সহায়তা

ইহা করিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে ওই আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে বর্ত্তমানে এরূপ একান্ত ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে মানুষের উন্নততর জীবন বোধ সম্পর্কে ঔৎসুক্য, উহার জন্য সাধনা দিনে দিনে হ্রাস পাইতেছে। এইরূপে মানুষের জীবনে যে অসীমের মূল্য ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া সীমার মূল্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষের সেই অসীম সত্তা বলিতে তাহার নৈতিক জীবন, ধর্ম্মজীবন, অধ্যাত্ম জীবন; তাহার মনোময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় গননাতীত বিচিত্র সত্তাটিকেই বুঝায়। মানুষের স্বাভাবিক গতি ক্রমিক উন্নততর সত্তার দিকে বৃক্ষের স্বাভাবিক বিকাশ ও গতি যেমন আলোকের দিকে। বর্ত্তমান মনুষ্য সভ্যতা এই স্বাভাবিক পরিণামের যেন বিপরীত পথ অনুসরণ করিতেছে। বস্তু বা জড়ের বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিবার আকাঙ্ক্ষা নহে, ইহা জড় বা বস্তুর গভীর হইতে গভীরে নিমজ্জিত হইবার চেষ্টা, এক বস্তু তত্ত্বের ভিতর দিয়া আর এক বস্তুতত্ত্ব লাভ—এই রূপে অন্তহীন অভিসার। ইন্দ্রিয়ের কোন একটা পরিণামে নিবৃত্তি নয় উপকরণের নিত্য:নূতন বৈচিত্র্য সম্পাদনের ভিতর দিয়া তাহাকে ক্রমাগত সজীব রাখিবার চেষ্টা। এই জাতীয় প্রয়াস দেখিয়া মনে হয় যে বৃক্ষের উর্দ্ধে আলোকমুখীন হওয়ার কথা ছিল সে-যেন কোন এক রহস্যের বশে পাতালমুখীন হইয়া অন্ধকার হাতড়াইয়া আলোর তত্ত্ব লাভ করিতে চাহিয়াছে।

নন্দিনী এই সত্যটিকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে।—"অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।"

যে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি আয়ত্ত করিতে চায়, এবং ওই শক্তিকে ক্রমাগতবর্দ্ধিত করিয়া ভোগেরবিচিত্র উপকরণ সৃষ্টি করিতে চায় তাহার মূলে হয়ত কোন উদ্দেশ্য প্রেরণা ছিল, অর্থাৎ উহাকে উপায় করিয়া সে হয়ত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রয়াস সম্পূর্ণ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া উপায়টাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের অর্থ কী, জীবনে সম্পূর্ণতা বা

সার্থকতা লাভ করিতে হয় কেমন করিয়া যে উদ্দেশ্যমুখীন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে হয় তাহার স্বরূপ কি, সামগ্রিক জীবনের পরিসীমা কোথায়, ইত্যাদি সহস্র জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর—যে উত্তর লাভের জন্য মানুষ যুগে যুগে সংখ্যাতীত পথে সাধনা করিয়াছে, বস্তুর বিচিত্রতত্ত্বে, ভোগের বিচিত্র আয়োজনে তাহার কতটুকু অর্থ লাভ করিতে পারা যাইবে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানাশ্রয়ী সভ্যতা সেই প্রশ্নটাকেই পরিহার করিয়া বসিয়া আছে। এই শক্তি সঞ্চয়ে বস্তুর বিচিত্র তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে গিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজটাই লুপ্ত হইয়া যাইবে কিনা সে আশঙ্কাকেও নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া উহা কেবল শক্তির পরিমান বাড়াইতে উৎসুক। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিয়াছে—

"শাপের কথা জানিনে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি।"

এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় যে যত অধিক পরিমানে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে, যে জীবনে যত অধিক বস্তু বা উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে সে তত বড়ো। বর্ত্তমান সভ্যতায় বড়ো হবার তত্ত্ব হইল বস্তুর শক্তি ও উপকরণ সংগ্রহ করা। বস্তুর শক্তি যতই সঞ্চয় করিতে হয় ততই অধিক লোককে এই কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে হয় এবং ইহার জন্য ততই অধিক সংখ্যক লোকের শক্তির অপচয় ঘটে। এই শক্তির আর একটি তত্ত্ব হইল, ইহা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে আপনাকে লীলায়িত করিবার ক্ষেত্রের ততই প্রসার ঘটে, কারণ বস্তু শক্তির পরিমাপ হয় একমাত্র তাহার প্রকাশের উপর। শক্তিকে প্রকাশ করিতে কিংবা উহাকে লীলায়িত করিতে তত অধিক সংখ্যক লোককে ওই কর্ম্মে নিয়োগ করিতে হয়। এমনি করিয়া ওই শক্তি ক্রম প্রসারতা লাভ করে।

বৃহৎ কল কারখানায় মানুষের প্রাণশক্তির যে কীরূপ অপচয় ঘটে, মানুষের নৈতিক মান যে কত নিম্নে নামিয়া যায়, পশু শক্তি সঞ্চয় করিতে পশুর কাজ আদায় করিতে মানুষকে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে পশু করিয়া তোলা হয় নাট্যকার নাটকের মধ্যে তাহার পরিচয়েকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। নন্দিনী তাহার পরিচয়

লাভ করিয়া বেদনা বিহ্বল হইয়া অধ্যাপককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক বলিয়াছে—"সেই অদ্ভুতটি হ'ল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হল তার খরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।"

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিপুল শক্তির দিকটা আমাদের বড় করিয়া চোখে পড়ে, কিন্তু এই শক্তির জোগান দিতে গিয়া যে কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। কত মানুষ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, কত নিবীর্য্য, গতশক্তি হইয়া মৃত্যুর অধিক লাঞ্ছনা লাভ করিতেছে, কত লোক যে আত্মার হত্যা ঘটাইয়া আত্ম বিক্রয় করিতেছে তাহার সংখ্যা কে গননা করিবে। বাহিরের শক্তি যত বাড়িতেছে মনুষ্য-সমাজের অন্তরের শক্তি ততই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, প্রাণের সম্পদে আত্মার ঐশ্বর্য্যে মানুষ ততই দেউলিয়া হইয়া পড়িতেছে।

মানুষের এই "বড়ো হবার তত্ত্ব"কে নন্দিনী তাই "রাক্ষসের তত্ত্ব" বলিয়াছে।

ভালো মন্দের প্রশ্ন নয়, এই তত্ত্বকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, অর্থাৎ বস্তুজগতে বাঁচাটাই যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহারা ক্রমাগতঃ বস্তু সঞ্চয় করিয়া চলিবে এবং এই বস্তুর সঞ্চয় যতই বাড়িবে তাহার ভার বহনের জন্য তত অধিক লোকের প্রয়োজন হইবে। তাহা না হইলে বস্তুর ভারে তাহারাই একদিন যে দলিত পিষ্ট হইয়া যাইবে। অধ্যাপক তাই নন্দিনীকে বলিয়াছে—

"ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।" উত্তরে নন্দিনী বলিয়াছে—

"থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।"

নন্দিনী জীবনকে যে দিক হইতে দেখিয়াছে অধ্যাপক জীবনকে

দেখিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে। তাই নন্দিনীর ওই উক্তির অর্থ অধ্যাপক কোনদিন বুঝিতে পারিবে না।

অধ্যাপক জীবনে "বড়ো হবার যে তত্ত্বের" কথা, অস্তিত্ব বজায় রাখিবার যে পথের কথা নন্দিনীকে বুঝাইতে চাহিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি তত্ত্ব আছে।

ইহাতে মানুষ ইন্দ্রিয়োপভোগের, বিষয় বাসনার, জড়ের বন্ধনের যত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এইরূপে যতই সে তাহার গভীরতর বা উর্দ্ধতর সত্তার পরিচয় লাভ করিতে থাকে ততই সে বিশ্ব মানবের সহিত একাত্মতা বোধ করিতে থাকে। সর্ব্বোত্তম সত্তার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। মানুষ এখানে নির্ব্বিশেষ। এই সর্ব্বোত্তম সত্তা ছাড়াইয়া যতই স্থূল সত্তার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় মানুষে মানুষে ততই পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া বিশিষ্টতা লাভ করিতে থাকে।

এক সত্তা ক্রম পরিণাম স্বরূপে উর্দ্ধতম সত্তা হইতে নিম্নতম জড় জগৎ পর্য্যন্ত অনন্তকোটি রূপ বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। মানুষ যতই তাহার উর্দ্ধতর সত্তা লাভ করিতে থাকে বিশ্বের অনন্ত কোটি প্রকাশ বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাহার ততই মিলন সাধিত হইতে থাকে। মানুষ যখন এই পূর্ণ মিলন তত্ত্বটির সন্ধান পায় তখন অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন একান্ত সহজ হইয়া উঠে। কারণ প্রাণের জন্য সে যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে বিশ্বের অনন্ত কোটি রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক প্রাণের প্রকাশ। সকল প্রাণের ভিতর দিয়া তাহার এই প্রাণের লীলা চলিবে অনন্ত কাল ধরিয়া।

মিলনের এই তত্ত্বটির সন্ধান লাভ করিতে হয় একমাত্র অন্তরে, বাহিরে তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নেই। অন্তরের এই পথ অবলম্বন করিতে মানুষকে বহির্জীবনে বস্তুর সঞ্চয় ভার নিঃশেষে নামাইয়া দিতে হয়। নন্দিনী অধ্যাপককে এই মিলন তত্ত্বটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

বৃহৎ কলকারখানা নাগরিক সভ্যতার অস্তিত্বকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছে। এই নাগরিক সভ্যতার আর একটি বড় অভিশাপ হইল

মানুষের প্রকৃতির আসঙ্গ লাভের বঞ্চনা। মনুষ্যত্ব বিকাশে প্রকৃতির নিবিড় আসঙ্গের প্রয়োজন আছে। এই আসঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত হইলে মনুষ্য স্বভাব যে কত দিক হইতে বিকৃত হইতে থাকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে তাহার নানা পরিচয় দান করিয়াছেন।

জীবনে জৈবিক প্রয়োজনের একটা দিক আছে, এবং তাহার প্রয়োজন মিটাইতে মানুষকে কঠিন শ্রম স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু প্রকৃতির মাঝখানে তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মাঝখানে, তাহার প্রশান্ত উদারতা ও ব্যাপ্তির মাঝখানে মানুষ এই শ্রমের গ্লানি সহজেই মুছিয়া ফেলিতে পারে। শ্রমের গ্লানি এইরূপে সহজেই মুছিয়া ফেলিতে পারে বলিয়া মানুষ হীনতা প্রাপ্ত হয় না, মানুষের উন্নততর বোধ গুলিও বিনষ্ট হইতে রক্ষা পায়। মানুষ তাহার জৈবিক সত্তাকে অস্বীকার করিতে পরে না, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে তাহার উন্নততর সত্তায় অধিষ্ঠিত থাকিতে সহায়তা করে। প্রকৃতি মানুষকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, আবার প্রকৃতিই আর এক রূপে মানুষকে কর্ম্মের উর্দ্ধে উঠিতে সহায়তা করে।

নাগরিক জীবনে কর্ম্ম আছে কিন্তু কর্ম্মের অবসাদ দূর করিবার মত প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মানুষ কর্ম্মের একান্ত দাস হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব প্রতি মুহূর্ত্তে লাঞ্ছিত হইতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হয় এইজন্য যে উহার ভিতর দিয়া মানুষ এত সহজে তাহার উন্নততর সত্তাটিকে লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ উহার আশ্রয়ে মানুষের উন্নততর বোধ এত সহজে উদ্রিক্ত হয় যে যাহা আর কোন কিছুর দ্বারা সম্ভব হয় না। নাগরিক জীবনে মানুষ তাই আত্মার অবসাদ ঘুচাইতে অন্য নানা কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, এক কাজ ফুরাইয়া গেলে আর এক কাজ। নাগরিক সভ্যতায় উন্নততর সত্তায় বাঁচিবার উপকরণের এতই অভাব। ক্রমাগত কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া মানুষ তাহার উন্নততর বোধ গুলিকে এক প্রকার হত্যা করে। বিশ্রাম বা অবসর মুহূর্ত্ত তাহার

নিকট তাই এত অসহনীয় বলিয়া বোধ হয়; এবং এই দুঃসহ মানসিক অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য মানুষ নানা অস্বভাবী উপায় অবলম্বন করে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাধিক মারাত্মক উপায় হইল, নানা নেশার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চেতনাকে অসাড় করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত করিয়া কোন লাভ নাই। নিম্নে কয়েকটি অংশ একত্রে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত লাভ করিতে পারা যাইবে।

"ফাগুলাল। বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে চায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

"বিশু। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, —বলছে ছুটি ছুটি।"

বিশু। সেই নীল চাঁদোয়ার নিচে, খোলা মদের অড্ডায়! রাস্তাবন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।"

তাহা ছাড়া অন্তরের আনন্দ সঞ্চয় যতই ক্ষয় হইয়া আসিতে থাকে মানুষ ততই বাহিরের উপকরণের মধ্যে আনন্দ লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠে। মনুষ্য স্বভাবের এই স্বাভাবিক পরিণতি নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনেই সত্য। আন্তর সম্ভোগের মানস উপলব্ধির শক্তি নারীদের যতই হ্রাস পাইতেছে ততই তাহারা বাহিরের ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে। বাহিরের উপকরণ বঞ্চিত হইলে কিংবা ওইদিক দিয়া কিছু ন্যূনতা ঘটিলে তাহাদের প্রেমও মুহূর্ত্তে বিশুষ্ক হইয়া যায়। নারীর বাহিরের উপকরণের যোগান দিতে পুরুষ ও

আত্মবিসর্জন করিয়া চলিয়াছে। ফাগুলালের স্ত্রীকে বিশু সেকথাও বলিয়াছে।

"তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।"

'ফুল' নারীর অন্তরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যবোধ। নারী চিত্তের সেই মাধুর্য্য যতই লুপ্ত হইতেছে নারী ততই বাহিরের সম্পদ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের প্রেমের মূল্য নারী সোনার বাটখারার ওজনে পরিমাপ করিতে শুরু করিয়াছে। নারী আপনার জীবনে যেমন পুরুষের জীবনেও তেমনি মনুষ্যত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষাকে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

বস্তুর এই সঞ্চয় ভার ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্ত্য দেশ সমূহে কীরূপ ভার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ কালে সুস্পষ্ট রূপে লাভ করিয়াছিলেন। এই বস্তুর ভারের তলায় সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যে অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ তলাইয়া যাইবে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কোন সংশয় ছিল না। ছিন্ন ক্লিষ্ট প্রাণের বেদনার কত আভাস না তিনি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুর এই সাধনা মানুষের প্রাণের সাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া প্রাণ দিয়া যত দিন সম্ভব হয় এই সভ্যতা বস্তুর বিপুল ভার বহন করিবে তাহার পর নিঃশেষিত প্রাণ বস্তুর বিপুল ভারে নিঃশেষে গুঁড়াইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতায় আসন্ন মৃত্যুর নানা সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়াছিলেন। যক্ষপুরীর রাজার উক্তির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কাটিকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। এক দিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম।

(৫)

পরিশেষে যক্ষপুরীর গোঁসাই সম্পর্কেও কিছু আলোচনা প্রয়োজন মানুষকে পশু না করিতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করিতে পারা যায় না। প্রাণকে প্রাণের বিরুদ্ধ কর্মে যখন নিয়োগ করিতে হয় তখন প্রাণের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দমন করিতে নানা আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শাসন, ছলনা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পশু করিয়া তুলিতে যেমন নানা গোপন হীন পন্থার আশ্রয় গ্রহন করিতে হয়, তেমনি মানুষ পশুর নানা পাশবিক বৃত্তিকে প্রয়োজন মত সংযত করিতে নানা পাশবিক শক্তির আয়োজন রাখিতে হয়।

এই আয়োজন বলিয়াছি আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধিভৌতিক শাসন হইল মানুষকে শিথিল ইন্দ্রিয়, অতি নিকৃষ্ট ভোগ পরায়ণ, বিশেষ করিয়া সুরা ও বারাঙ্গনাসক্ত করিয়া তোলা, নানা হীন কর্মে আসক্ত করিয়া তোলা, অর্থাৎ এককথায় বলা যায় মানুষের উন্নততর সকল বোধকে হত্যা করিবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা করা। আধিভৌতিক শাসনের আর একটি দিক হইল পৈশাচিক দৈহিক উৎপীড়ন। অত্যন্ত ভয়াবহ দৈহিক যন্ত্রনা দানের নানা পরিচয় যতটা সম্ভব আচ্ছন্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে দান করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আর একটি ব্যবস্থাও করা হয় যাহাকে বলা যায় আধিভৌতিক ব্যবস্থা। মানুষের প্রাণ এমনি এই সহস্রাবিধ অত্যাচারেও তাহা বাঁচিয়া থাকে পথের শ্যামল তৃণের মত। বারংবার রথের চাকার তলায় পিষ্ট বিবর্ণ হইয়া যায়, পর মুহূর্ত্তে বারংবার আবাব কেমন করিয়া মাটির রস শোষণ করিয়া সবুজ হইয়া উঠে! কখন অলক্ষ্যে ফুল ফুটাইয়া ঝরাইয়া দেয়!

যখন এত করিয়াও প্রাণের বিদ্রোহ ও অসন্তোষ ঘুচে না তখন নানা ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা করা হয়। পার্থিব যে-কোন মাদক দ্রব্য অপেক্ষা এ দ্রব্য আরও ভয়ানক। মানুষ ধর্ম্মের নামে অমৃত ভাবিয়া আফিং গিলিয়া চলে। প্রাণের শক্তি ইহাতে চিরতরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ যখন তাহার লাঞ্ছনাকে বিধি নির্দ্দিষ্ট বলিয়া বোধ করে

তখনই মানুষ আপনার সর্ব্বাধিক অকল্যাণ সাধন করে। সকল চেষ্টা নিরুদ্ধ করিয়া দিবার মত বড় অপরাধ মানুষের জীবনে আর কিছু নাই ধর্ম্মের নামে মানুষ সেই অকল্যাণ, সেই অপরাধ ঘটাইয়া বসে।

সমাজে প্রাণ-শক্তি ও উপকরণের অসাম্য যেখানে ঘটাইতে হয় সেখানে বাহির হইতে বল প্রয়োগের প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি তাহাকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লইবারও প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানাইয়া লওয়াইতে পারিলে অতি সামান্য বল প্রয়োগে কিংবা বল প্রয়োগ না করিয়াও উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারা যায়।

যান্ত্রিক সভ্যতায় অসাম্য সাধন করিতে বর্ত্তমানে যে উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় ইহারই ভিন্ন প্রকাশ ছিল মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু ধর্ম্মের জাতি ভেদ ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই আপনার প্রাণ-শক্তি ও অধিকার সীমার সহিত পরিচিত হইয়া যায়। শিশু উত্তর জীবনে ইহাকে যদি মানিয়া লয় ভালই, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা তাহার মিত্র হইয়া উঠিবে, যদি না মানিয়া লইতে পারে তবেই তাহার সমূহ বিপদ। এই ব্যবস্থার পশ্চাৎ প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পরিশেষে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তিগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

"গোঁসাই। আমাদের শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশী পরিমানে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

"নন্দিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন।"

"গোঁসাই। যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশ ভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই

প্রাণের রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।"

(৬)

নাটকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একটি সুরের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে,—তাহা একটি গানের সুর—পৌষের ধান কাটার গান।

মাটির পৃথিবী আনন্দে আঁচল ভরিয়া শস্যের সম্পদ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর মানুষ দুই হাত ভরিয়া ভারে ভারে সেই সম্পদ ঘরে আনিয়া তুলিতেছে। ইহার একটি গভীর তাৎপর্য্য আছে।

বিশ্বের এক প্রাণ প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রূপে এবং নর-নারীর মধ্যে প্রেম রূপে অভিব্যক্ত। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতির ভিতর দিয়া মানুষ পরিণামে বিশ্ব-প্রাণকে আপনার মধ্যে অনুভব করে। বিশ্বের সকল রূপ সকল প্রাণের মধ্যে আপনার প্রাণকে উপলব্ধি করিয়া মানুষ ধন্য হয়। মানুষের শক্তি ও মহত্ত্বের পরিমাপ হয় এই সংযোগ অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপ্তির উপর।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতির ভিতর দিয়া প্রাণের এই যে বিকাশ ও পূর্ণতা তাহারই প্রতীক পরিপক্ক ধান্যশস্য। এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় বিশুর ওই উক্তি হইতে। প্রাণের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে যাইবার পূর্ব্বে বিশু নন্দিনীকে বলিয়াছে "মাঠের লীলা শেষ হল খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল।"

বিশু আপনার জীবনকে 'পাকা ফসলে'র মত সুসম্পূর্ণতা দান করিতে পারিয়াছে প্রাণকে অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে জীবনে পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া।

বিধাতার অন্তরে ইচ্ছা ছিল যে মানুষ বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে আশ্রয় করিয়া আপনার জীবনকে পরিপক্ক শস্যের মত সার্থক করিয়া তুলিবে, বিশু সেই ইচ্ছাকেই জীবনে চরিতার্থ করিয়াছে। তাহার পর কৃষক যেমন করিয়া পরিপক্ক ফসল কাটিয়া ঘরে আনিয়া

তুলে, মহাকাল নিত্যকাল ধরিয়া এমনি পরিণত মানব হৃদয় গুলিকে কোন্ অ-দৃষ্ট লোকে সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছেন; বিধাতার আনন্দের সঞ্চয়। এই পরিণত মানব হৃদয় বিধাতার নিত্য কালের ধন। মৃত্যুতে আর সব হারায় কেবল এই সম্পদগুলি অমর হইয়া থাকে। নন্দিনী প্রাণের এই তত্ত্ব-লোকে সকলকে আহ্বান করিয়াছে। তাহার ওই সম্পূর্ণ তত্ত্বটাই অভিব্যক্ত হইয়াছে পৌষের ফসল কাটার ওই একটি মাত্র গানের মধ্যে।

বিশ্বের উত্তাপ, জল, বায়ু ও মৃত্তিকাকে প্রাণের ভিতর দিয়া শোধন করিয়া যেমন করিয়া একটি ফল ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিপক্ব হয়, মানুষের আত্মাও তেমনি বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও প্রেমের ভিতর দিয়া, আনন্দ ও বেদনার নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া ধীরে ফলবান হইয়া উঠে।—এই আত্মাই মৃত্যুঞ্জয়ী। বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও প্রেম এবং আনন্দ ও বেদনার বিচিত্র অনুভূতির আস্বাদ লাভ; —জীবনে ইহাই একমাত্র সার্থকতা। যাহারা এই সার্থকতা লাভ করিয়াছে এই জীবনে তাহারাই ধন্য।

গৃহ প্রবেশ

সৌন্দর্য্য ও প্রেম সাধনার দুটি স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একটি রূপাশ্রয়ী আর একটি অরূপাশ্রয়ী। যেখানে বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া প্রেম বিশ্বময় আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়, যেখানে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য একটি মাত্র রূপের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যেখানে বিশ্বের সকল রূপ একটি মাত্র রূপকে ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত করিতে চায়, যেখানে সেই রূপ একটি মাত্র সূত্র হইয়া সকল রূপকে গ্রথিত করে, যেখানে ওই রূপ হারাইয়া গেলে বিশ্বের সকল রূপ হারাইয়া যায়, যেখানে ওই আলোক নিভিয়া গেলে বিশ্বের সকল

আলোক নিভিয়া যায়, যেখানে ওই একটি মাত্র সূত্র ছিন্ন হইয়া গেলে সকল রূপ অবিন্যস্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, মানবিক সেই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধকে রূপাশ্রয়ী সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনা বলা যাইতে পারে। এই বিশিষ্ট সাধনায় সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ যতদূর গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করুক না-কেন তাহা কোন একটা পরিণামে রূপকে সম্পূর্ণ রূপে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। অরূপের যে আস্বাদ তাহাও এই বিশিষ্ট রূপাশ্রয়ী করিয়া।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আর এক সাধনা আছে যাহা আদৌ কোন বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া অনুভূত হয় না। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনায় একটি সামঞ্জস্য বোধের সূত্র কোন-না-কোন রূপে থাকিতে বাধ্য এবং তাহা যদি কোন রূপও হয় তাহা অরূপের প্রতীক রূপে সত্য। এই সাধনায় সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বোধ যতই গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে ওই প্রতীকের প্রতীকত্ব বোধটা ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে এবং পরিণামে ওই প্রতীকটিও হারাইয়া যায়। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই সাধনাকে তাই অরূপের সাধনা বলা যাইতে পারে। প্রতীকত্বের এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে বলিয়া বিশিষ্ট রূপের জন্য হাহাকারও থাকে না।

যতীনের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনা যে রূপাশ্রয়ী সাধনা তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না। যতীনের প্রেম মণিকে আশ্রয় করিয়াই চরিতার্থ হইতে চাহিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সকল ধ্যান একমাত্র মণিকে আশ্রয় করিয়া। মনে মনে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া যতীন তাহারই মাঝখানে মণিকে বসাইয়া নিরীক্ষণ করিয়াছে, অনিমেষ দৃষ্টিতে ফিরাইয়া ফিরাইয়া নানা দিক হইতে নানা ভাবে দেখিয়া দেখিয়া তাহার আশা মিটে নাই—অপরিতৃপ্তিতে বুক ভরিয়া দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসিয়াছে।

অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোকের মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া যতীন মণিকে দেখিয়াছে বাহিরে সে সেই সৌন্দর্য্যকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছে তাহার গৃহের মধ্যে। নূতন গৃহ নির্ম্মান করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য ও

মাধুর্য্য দিয়া গড়া সংসারের মাঝখানে যতীন মণিকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছে।

শিল্পীর ধর্ম্ম কেবল আন্তর উপলব্ধি নয়, তাহাকে বাহিরে রূপায়িত করাও বটে। যতীনের মধ্যে এমনি একটি শিল্পী মন ছিল বলিয়া তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-লোকটিকে সে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে গৃহ-রচনার ভিতর দিয়া। অন্তরের সৌন্দর্য্যকে বাহিরে রূপায়িত করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় যতীন কতকগুলি মারাত্মক, সর্ব্বনাশা উপায় অবলম্বন করিয়াছে। চড়া সুদে পৈতৃক বসতবাটি বন্ধক রাখিয়া ঋণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। পাটের বাজারে ফটকা লাভের আশায় প্রায় সর্বস্ব দিয়া পাট মজুতজাত করিয়াছে, আশা পাটের বাজার চড়িলে একত্রে মোটা মুনাফা করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত টাকা বাড়ী নির্ম্মান কার্য্যে ব্যয় করিবে। আশঙ্কার কথা যে যতীনের মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে, তবে প্রাণের গরজে যতীন ওই আশঙ্কাকে বারংবার চাপা দিয়াছে।

গৃহ-নির্ম্মান ব্যাপারে এই যেমন একটি আশঙ্কা ছিল, অর্থাৎ পাটের বাজার দর না চড়িলে গৃহ মুহূর্ত্তে মরীচিকা হইয়া মিলাইয়া যাইবে, তেমনি আর একটি আশঙ্কা ছিল মণির প্রেম সম্পর্কে। গৃহ-নির্ম্মান একদিন সম্পূর্ণ হইবে, কিন্তু মণির হৃদয় হয়ত তখনও জাগিবে না, মণির হয়ত গৃহ-প্রবেশ হইবে না। প্রেমের পথ বহিয়া মানুষ চির সুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। মণির অন্তরে এই প্রেম ছিল না। মণি হৃদয়হীনা; মণি ছিল অলৌকিক কারুকার্য্য খচিত বিগ্রহ শূন্য মন্দিরের মত। মণি বাহিরের ঐশ্বর্য্যে যেমন পরিপূর্ণ অন্তরের ঐশ্বর্য্যে তেমনি দীন।

যতীনের সৌন্দর্য্য-সাধনা তাহার হৃদয় বোধেরই-প্রকাশ। মণিকে যতীন সত্য করিয়াই ভালোবাসিত। তাই তাহার সৌন্দর্য্য-সাধনার সহিত হৃদয়ের ক্ষুধাও বিজড়িত হইয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য বোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ক্ষুধাও গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে।

কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার মত কোন ঐশ্বর্য্য মণির অন্তরে ছিল না।

যতীনের হৃদয় পিপাসা যদি মিটিত তবে তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম সাধনার অমন ট্র্যাজেডি অর্থাৎ তাহার প্রেমে আদর্শ ও বাস্তবের অমন দ্বন্দ্ব কখনই ঘটিতে পারিত না।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনা যেখানে সত্য যাহা আদৌ যুগ্ম বা দ্বৈত সাধনা, সেখানে প্রেমে আদর্শ ও বাস্তবের এমন দ্বন্দ্ব জাগা একপ্রকার অসম্ভব। দ্বন্দ্ব যদি জাগেও তাহা হইলে ওই প্রেম আপনার অলৌকিক শক্তি বলে বাস্তবকে জয় করিয়া উঠে, বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া নয়, তাহাকে আদর্শ মুখীন বা আদর্শায়িত করিয়া তুলিয়া। প্রেমের সে দৃষ্টিতে বাস্তবটাই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করে। এই দৃষ্টিতে আদর্শের সহিত তাই বাস্তবের কোন মূল সজ্ঘাত নাই। আদিতে দুইয়ের বোধ থাকিলেও পরিণামে দ্বৈত বোধ থাকে না। সেখানে আদর্শ বাস্তবে একাকার হইয়া যায়, না:বাস্তব আদর্শে একাকার হইয়া যায় তাহা কে নির্ণয় করিবে।

যতীনের সৌন্দর্য্য বোধ যত গভীর হইয়াছে প্রাণের ক্ষুধা না মিটিবার ফলে হৃদয়ের মধ্যে তত অধিক শূন্যতা বোধ জাগিয়াছে। এই অসহনীয় শূন্যতা বোধ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যতীনের সৌন্দর্য্যধ্যান অমন বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছে। যতীনের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান যতীনকে বিশ্বের সকল রূপের সহিত যুক্ত বা মিলিত করে নাই, বিশ্বের সমস্ত কিছু হইতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে।

নিছক সৌন্দর্য্য-ধ্যানে অর্থাৎ যাহার সহিত হৃদয় বোধের চরিতার্থতা বিজড়িত হইয়া নাই, জীবনে তাহার ফল লাভ কতখানি, তাহা আদৌ প্রাণের ক্ষুধাকে কোন পরিণামে জয় করিয়া উঠিতে পারে কি-না, তাহার একটা পরিচয় যতীনের জীবনের মধ্য দিয়া লাভ করিতে পারা যায়। যতীন সৌন্দর্য্য-ধ্যানে মণির প্রেম শূন্যতাকে, আপনার হৃদয়ের ক্ষুধাকে ভুলিবার প্রাণপন সহস্র চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পরিণামে সকল প্রয়াস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া হৃদয়ের ক্ষুধাকে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে।

অন্ততঃ যতীন তাহার রক্ত মোক্ষণ কারী সংগ্রামের ভিতর দিয়া ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছে যে প্রেমে অন্য হৃদয়ের প্রেমের প্রত্যাশা অনিবার্য্য হইয়া থাকে, অন্য হৃদয়ের প্রেম না পাইলে কোন প্রেম আপনাকে আপনি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারে না। শূন্যতা বোধের পীড়ায় মানুষ প্রেমকে বাস্তব দশা মুক্ত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে প্রাণপন চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সেই জাতীয় চেষ্টার আধ্যাত্মিক ফল লাভ কিছু নাই। আধ্যাত্মিক ফললাভ বলিতে যদি বিশ্বের সহিত আনুক্রমিক যোগের কথাই বুঝিতে হয়, এই জাতীয় প্রেম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফললাভ দান করে। অর্থাৎ উহা নর-নারীকে ধীরে ধীরে বিশ্ব বিমুখ করিয়া তুলে। যতীন তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম সাধনার অসারবত্তা বোধ করিয়া তাহার মণি, তাহার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সহিত তাহার 'মণি-সৌধ'কে দুই পায়ে মিথ্যা বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। ওই বোধের সর্ব্বশেষ বন্ধন পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া যতীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

যতীন তাহার সৌন্দর্য্য স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, দুটি মিথ্যার উপর,—একটি আর্থিক দৈন্য অপরটি মণির প্রেম-শূন্যতা। কিন্তু প্রেমই আশা জাগাইয়া রাখে। আশা সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে প্রেমের। যতীনের আশা পাটের ব্যবসায় তাহার প্রভূত লাভ হইবে, আর এক আশা গৃহ-নির্ম্মান সমাধা হইবার পূর্ব্বে হয়ত মণির অন্তর জাগ্রত হইবে।

যতীনের সৌন্দর্য্য ও প্রেম সাধনায় বাস্তবের সহিত যে দ্বন্দ্ব তাহা এই দুইটি দিক আশ্রয় করিয়া। রোগ শয্যায় পড়িয়া যতীনের এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান কতকটা স্থায়ী হইয়াছে। যতীনের অসামর্থ্যের এই সুযোগ না লাভ করিলে মাসির পক্ষে তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ধ্যান জাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্য অমন নানা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ অসম্ভব হইয়া উঠিত।

যে বীর্য্যহীন প্রেম আপনার মধ্যে আপনি সংবৃত হইয়া থাকিতে চায়, যে প্রেমে প্রাণের ক্ষুধা তেমন করিয়া অনুভূত হয় না

বলিয়া সৌন্দর্য্য-ধ্যান একান্ত অগভীর ও অপরিব্যাপ্ত, যতীনের প্রেম তেমনি বীর্য্যহীন ছিল না বলিয়া অমন জীবন বিমুখী, বাস্তব বিমুখী হইয়া পড়ে নাই। যতীন নরহরির উপস্থিতিতে অধীর এবং অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে সত্য, পাটের বাজার দরের অবনতির কথা জানিতে চায় নাই, জানালা বন্ধ করিয়া বাস্তব জগৎকে বিস্মৃত হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু ইহা তাহার জীবনে বড় কথা নয়। পাটের বাজার দর নামিলে তাহার:'মণি-সৌধ' শূন্যে মিলাইয়া যাইবে সত্য কিন্তু এ সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াই যতীন তাহার মাসিকে এক সময় বলিয়াছে, 'মাসি একটা কথা গর্ব্ব করে বলতে পারি। যা পাইনি তা নিয়ে কোনদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষা করলুম। মিথ্যাকে চাইনি বলেই এত সবুর করতে হল।"

তাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যতীনের জীবনের সকল সমস্যা আসিয়াছে একমাত্র মণির দিক হইতে। তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম সাধনার একমাত্র সমস্যা হইল মানবিক হৃদয় বোধকে এবং তজ্জাত সকল বাস্তব সমস্যাকে কোন একটা উপায়ে জয় করিয়া উঠা।

কোন্ তত্ত্ব দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া যতীন তাহার মানবিক সকল ক্ষুধা জয় করিয়া উঠিতে চাহিয়াছে এক্ষেত্রে তাহারই কিছু বিস্তারিত পরিচয় দানের চেষ্টা করিব। সে ক্ষেত্রে ইহাও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে যে এই সমস্ত তত্ত্বের বাঁধ জীর্ণ করিয়া প্রাণের পিপাস শত ধারায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কান্নাকে আকুল অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মাসি যতীনকে তাহার রোগশয্যায় গৃহ নির্ম্মান সমাপ্তির কথা জানাইতে যতীন পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছে।

"তারা বাহির থেকে দেখছে, আমি ভিতরে থেকে যা দেখতে পাচ্ছি তা এখনো শেষ হয়নি। কোন কালে শেষ হবে না। কল্প লোকের শেষ পাথরটি বসিয়ে কোন্ শিল্পী বলেছে, এইবার আমার সাঙ্গ হল? বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তাও বলতে পারেন নি, তাঁরও কাজ চলছে।"

বিধাতার অন্তরে যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াই তো তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন্ অনাদি কাল হইতে এই সৃষ্টি কার্য্যে তিনি নিযুক্ত কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ধ্যান-রূপটি আজও সম্পূর্ণ রূপে ধরা পড়ে নাই। তাই তো ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নিত্য গড়া চলিতেছে, হয়ত কোন কালে সেই পূর্ণ রূপটি ধরা পড়িবে, কিম্বা ধরা পড়িবে না। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে আজও সেই সম্পূর্ণ রূপটি ধরা পড়ে নাই বলিয়া ইহার সহিত যেন অপার বেদনা বিজড়িত হইয়া আছে।

শিল্পীর অন্তরেও এই একই প্রেরণা রহিয়াছে। শিল্পীও তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকটিকে বাহিরে রূপায়িত করিতে চায়। বিধাতার সৃষ্ট জগতের মত শিল্পীর সৃষ্ট জগতের মধ্যেও অসম্পূর্ণতার বেদনা বিজড়িত। অন্তরের সৌন্দর্য্যকে বাহিরে সম্পূর্ণ করিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। অন্তর ও বাহিরের আদর্শ ও বাস্তবের এইখানে যেন চিরন্তন বিচ্ছেদ। কেবল অসম্পূর্ণতার কথা নয়, আন্তর সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে নিত্য রূপান্তরতা যে নিত্য নব রূপতা তাহার যে প্রবহমানতা তাহাকে বাহিরে কোন্ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারা যাইবে! বস্তুতঃ সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায় বলিয়া স্রষ্টার অন্তর এমন নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে।

যতীনের গৃহ নির্ম্মান সমাধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য-লোকের কতটুকু পরিচয় উহার মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজকে আশ্রয় করিয়া সম্রাট শাজাহানের অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক বিরচিত হইয়াছিল তাহাকেই তিনি বাহিরে তাজমহলের মধ্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান ছিল তাহার কতটুকু প্রকাশ ঘটিয়াছে তাজমহলের মধ্যে। কিন্তু তাঁহার অন্তরে মমতাজের যে ধ্যান-রূপ বিরাজ করিত এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান, তাহারই প্রতীক হইয়া থাকিবে ওই তাজমহল। ওই তাজমহল যতদিন মর্ত্ত্যে

বিরাজ করিবে ততদিন উহার ভিতর দিয়া তাহার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী তাহার প্রেম প্রতিমার কথা যুগে যুগে বিঘোষিত হইতে থাকিবে। তাহার পর কালে ওই তাজমহল যখন জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে তখন কি তাঁহার অন্তরের ওই পরিপূর্ণ ধ্যান-রূপের কিছুমাত্র আভাস থাকিবে না, তাহাও কি ধুলায় ধূলি হইয়া চিরবিস্মৃতির তলে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহার কোন পরিচয় কোথাও এতটুকুও থাকিবে না ? বস্তুতঃ ইহা সত্য নয়, মানুষের ধ্যান-রূপ চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায় না। সকল রূপ-ধ্যানের সহিত অরূপের যোগ আছে বলিয়া ভাব-রূপে তাহা অমর হইয়া থাকে। শাজাহান গিয়াছেন, তাঁহার প্রেমের সৌধ তাজমহলও একদিন হারাইয়া যাইবে কিন্তু তাঁহার প্রেম সত্য বলিয়া অমর, আর ওই প্রেমাশ্রয়ী যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহাও।

যতীনের প্রেম রূপ লাভ করিয়াছে তাহার গৃহ আশ্রয় করিয়া। তাহার গৃহের ভিতর দিয়া তাহার প্রেমই ব্যক্ত হইবে। মণিকে ভালো-বাসিয়া তাহার অন্তরে যে নিত্য সৌন্দর্য্য কুসুম ফুটিয়াছে সেই সব কটি ফুল দিয়া সে তাহার এই গৃহ রচনা করিয়াছে। মণি তাহার অন্তরে যে মাধুর্য্যের আস্বাদ দিয়াছে সেই সকল মাধুর্য্য দিয়া সে তাহার গৃহকে অভিষিক্ত করিয়াছে। যতীন যখন এই মর্ত্ত্য-লোকে থাকিবে না তখন তাহার এই গৃহ তাহার প্রেমের স্মৃতি বহন করিয়া বিরাজ করিবে। কেবল বাহিরে নয়, অন্তরের ধ্যান-লোকে মণির যে মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা তাহা জন্ম-মৃত্যুর সকল সীমানা অতিক্রম করিয়া চিরকাল বিরাজ করিবে। তাহার এই প্রেমও যে সকল প্রেমের চির উৎসের রস ধারায় অভিসিঞ্চিত।

শাজাহানের কথা বলিতে পারি না, যতীনের এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের পশ্চাতে যে একটি গভীর বেদনা বিস্মৃত হইবার নিয়ত প্রয়াস ছিল তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সে বেদনা কি, না মানবিক স্নেহ লাভের আকাঙ্ক্ষা। যতীনের জীবনে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। এই আকাঙ্ক্ষার অতি তীব্র বেদন ভুলিবার জন্যই যতীন অমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মাঝখানে মাসি যখন বলিয়াছে যে যতীনের এতটুকু সেবা ও যত্নের জন্য মণি নিয়ত উৎসুক হইয়া থাকে, ইহাতে এতটুকু ত্রুটি দেখা দিলে মণির কান্না আর বাধা মানে না, তখন যতীনের সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন মুহূর্ত্তে বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া গিয়াছে। যতীনের গভীরতম গোপন বেদনাস্থলের উপর মাসি যেন না জানিয়াই হাত দিয়া ফেলিয়াছে। বেদনায় একপ্রকার আর্ত্তস্বর তুলিয়া যতীন বলিয়া উঠিয়াছে—"সত্যি মাসি মণি কাঁদলে ? সত্যি ? তুমি দেখেছ ?"

এই বারংবার ব্যাকুল জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া যতীনের অন্তরের নিরুদ্ধ হাহাকার যে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

কিন্তু যতীন তখনও পর্য্যন্ত আত্মপ্রতারণা করিয়া চলিয়াছে। হয়ত মাসির প্রেমের স্থির একটা প্রত্যয় আপনার অন্তরে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া যতীন অমন সৌন্দর্য্য-ধ্যানের কথা বলিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ মানবিক প্রেমের শূন্যতাকে কোন সৌন্দর্য্য-ধ্যান দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে পারা যায় না। মাসিকে যতীন বলিয়াছে, "সাজাহানের ঘরে ঘরকরনা করবার লোক ঢের ছিল তাদের সকলের মধ্যে কেবল একজনকে তিনি দেখেছিলেন যার কিছুই করবার দরকার ছিল না। নইলে তাজমহল তাঁর মনে আসত না। তাজমহলেরও কোন দরকার নেই।

"বিধাতার স্বপ্নকে যে আমি চোখে দেখলুম, আমার স্বপ্নকে সাজিয়ে তুলে কেবল সেই খবরটি রেখে যেতে চাই।"

মানবিক প্রেমে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব আছে সত্য কিন্তু তাহা ওই নিয়ত দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ক্রমিক বৃহত্তর উন্নততর সামঞ্জস্য লাভের জন্য। প্রকৃত প্রেমে তাই আদর্শ ও বাস্তবের বিরুদ্ধ ভাব নাই। প্রকৃত প্রেমই আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে।

যতীন প্রেমকে আদর্শ ও বাস্তবে বিভক্ত করিয়াছে। বাস্তব প্রেম, অর্থাৎ যাহা জাগতিক বা সাংসারিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাহার ভিতর দিয়া মানুষের নিত্য প্রয়োজনের দাবী মিটে, সেবা-যত্নের ভিতর দিয়া এবং উহার জন্য নিয়ত যে আত্মত্যাগ যতীনের মতে সৌন্দর্য্য-

স্বপ্নের, সৃষ্টি-প্রেরণার তাহা পরিপন্থী। নিত্য পরিচয়ে একান্ত নৈকট্যে তাহার সকল বিস্ময় নষ্ট হইয়া যায়।

মানুষের আর একটি সৌন্দর্য্য ও প্রেম পিপাসা আছে যাহাকে বাস্তবে চরিতার্থ করিতে পারা যায় না। এই অধরাকে ধরিতে পারা যায় না বলিয়াই তো মানুষের অন্তরে এত বেদনা। এই বেদনায় মানুষ সৃষ্টি করে কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত আরও কত কি। তাই তো সৃষ্টির সহিত এমন বেদনা বিজড়িত হইয়া থাকে।

মণিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটে নাই সত্য, কিন্তু বিধাতা মণির অঙ্গে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়াছেন তাহাকে বাস্তবে আর কোথায় লাভ করিতে পারা যাইবে। মণি যদি 'ঘরনী' না হয় তাহাতে ক্ষতি কী, মণি তাহার সৌন্দর্য্য দিয়া তাহার অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে তাহা কোন ঘরনী পারিত না। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য-ধ্যান মণির অঙ্গে রূপ লাভ করিয়াছে। মণির সৌন্দর্য্য আশ্রয় করিয়া তাহার অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সে বাহিরে তাহার গৃহের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবে।

যতীন প্রেম এবং তদাশ্রয়ী সৌন্দর্য্য-ধ্যানকে অমন আদর্শ ও বাস্তবে বিভক্ত করিয়াছে বস্তুতঃ আপনার জীবনে প্রেম বঞ্চনা ছিল বলিয়া। প্রকৃত প্রেমে আদর্শও বাস্তবের মূলতঃ কোন সজ্ঘাত নাই। প্রেম বা সৌন্দর্য্য বোধের অর্থই হইল রূপের মধ্যে অরূপের আভাস। যেখানে এই আভাস যত সত্য সেখানে প্রেম ও সৌন্দর্য্য বোধও তত সত্য তত গভীর।

যতীন যতদিন সুস্থ ছিল ততদিন মণির প্রাণের দীনতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মর্ম্মাহত হইয়াছে এবং তাহাকে ভুলিবার জন্য অমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যতত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অন্তরের ওই সুপ্ত বাসনাও দিনে দিনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া যতীন সেই বাসনাকে আর কোন উপায়ে চাপা দিতে পারে নাই, সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মর্ত্ত্য হইতে শেষ বিদায় লইবার পূর্ব্বে মানুষ মর্ত্ত্যের স্নেহ প্রেম

প্রীতিকেই পরিপূর্ণ করিয়া লাভ করিতে চায়। এই প্রেমে মৃত্যু অপ্রমাণ হইয়া যায়। মাসি মণির সেবা ও যত্ন, প্রেম ও প্রীতির কথা যতই বলুক না-কেন এবং তাহা বিশ্বাস করিয়া যতীন যতই আশ্বস্ত হোক-না-কেন, তাহা মিথ্যা বলিয়া যতীনের অন্তর অমন অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে,—নিত্য শূন্যতা বোধের অমন অসহনীয় পীড়া।

এই মিথ্যার আশ্রয় লইতে গিয়া মাসি হিমিকে বলিয়াছে "হিমি, তোর বৌদিদিকে যিনি সুন্দর করেছেন, তাঁর সঙ্কল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে মণি ভগবানের আপন বুকের ধন যে মণি সেই তো কৌস্তুভ রত্ন—তার মধ্যে কোথাও কোন খুঁত নেই। মৃত্যুকালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।"

শম্ভুর নিকট হইতে যতীন যদি মণির সত্য সংবাদ না পাইত, মাসির উক্তিকেই যতীন যদি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিত, সংশয়ের কোথাও যদি কোন অবকাশ না থাকিত তাহা হইলে যতীনের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার কি নিবৃত্তি ঘটিত? বস্তুতঃ তাহা ঘটে না। প্রেমে যে আধ্যাত্মিক ফল লাভ তাহা মিথ্যা বোধকে আশ্রয় করিয়া কখনই ঘটিতে পারে না। যতীন মাসির সহস্র সান্ত্বনায়ও তাই অন্তরের অন্তরে সান্ত্বনা পায় নাই। মণির অন্তরে যতীনের জন্য যদি সত্য প্রেম থাকিত তবে যতীন আপনার অন্তরেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত, সকল সংশয়কেও সে ওই উপলব্ধির দ্বারা জয় করিয়া উঠিতে পারিত। মাসিকে কথার দ্বারা ওই উপলব্ধি সঞ্চার করিবার চেষ্টাও করিতে হইত না। তাই দেখিতে পাই মাসিকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যতীনের অন্তর সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই।

মৃত্যু যতই আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে যতীন মণির প্রেম লাভের জন্য ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাকুলতার স্বরূপ কি, না আমি যাহাদের একান্ত করিয়া ভালবাসি আমার সেই সকল প্রিয়জন আমার মৃত্যুকালে আমাকে যেন অশ্রুজলে বিদায় দেয়। আমাকে যে তাহারা ভালোবাসে তাহাদের জীবনে আমার যে কিছু মূল্য আছে, আমাকে মৃত্যুর পর তাহাদের হৃদয়ে আমি যে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণে পড়িব

তাহাদের অশ্রুজলের মধ্যে আমি সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া যাইতে চাই।

যতীন তাই মাসিকে বলিয়াছে, "যখন থেকে শুনেছি মাসি, মণি কেঁদেছে তখন থেকেই বুঝেছি ওর মন জেগেছে। * * * দুপুর বেলা একবার এসেছিল। তখন দিনের প্রথম আলো দেখে হঠাৎ মনে হল, ওর মধ্যে ছায়া একটুও কোথাও নেই। এইবার এই সন্ধ্যের অন্ধকারে দেখতে দাও, হয়ত ওর ভিতরের সেই চোখের জলটুকু দেখতে পাব।"

যতীনের এই উক্তির ভিতর দিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার এতদিনের সৌন্দর্য্য-ধ্যান কোন্ শূন্যে হারাইয়া গিয়াছে। যে যতীন এক দিন বলিয়াছিল সে শাজাহানের গৃহে সংসার কর্ম্মের অনেক লোক ছিল কেবল মমতাজের কোন কাজ ছিল না, কিন্তু জীব-লোকের সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে ছিল বলিয়া মমতাজই শাজাহানের অন্তরকে সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল, আর কেহ পারে নাই; মণিকে দিয়া সংসারের কোন কাজ নাই বা হইল, মণি সংসারের সকল প্রয়োজন হইতে দূরে থাকিয়া তাহাকে যাহা দিতে পারিয়াছে তাহা সংসারের আর কোন নারী দিতে পারিত না, সেইযতীন আজ মণির অন্তরে একটি বেদনা সজল করুণা কোমল স্থান প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছে। যে কথা বলিয়াছিলাম, সত্য প্রেমে মানুষের স্নেহের ক্ষুধাও যেমন মিটে তেমনি সৌন্দর্য্য-ধ্যান সীমাহীন প্রসার লাভ করিতেও কোথাও বাধা পায় না। সত্য প্রেমে বাস্তব ও আদর্শ ইহকাল ও পরকালের সকল ক্ষুধা মিটে।

কিন্তু প্রেমের প্রত্যাশা এমনি যে সব জানিয়া সব বুঝিয়াও প্রেম পরাভব স্বীকার করিতে চায় না। যতীন যতদিন সুস্থ ছিল ততদিন মণির হৃদয়হীনতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, রোগশয্যায় শয়ন করিয়া আশ্চর্য্য নিস্পৃহতার নানা আভাস লাভ করিয়াছে, কিন্তু তবুও যতীন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ইহ জন্মে তাহার জীবৎকালের মধ্যে মণির হৃদয় হয়ত জাগিবে না, তাহার প্রেম প্রত্যাশা হয়ত পূর্ণ হইবে না, কিন্তু যতীন

বিশ্বাস করে, তাহার প্রেম তাহার অন্তরে এই বিশ্বাস গড়িয়া তুলিয়াছে, মণির হৃদয় একদিন নিশ্চয়ই জাগিবে, বেদনায় ভাঙ্গিয়া গড়িয়া শূন্য অন্তরে তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিয়া ফিরিবে। তখন যে লোকে সে থাকুক না-কেন ঠিক বোধ করিতে পারিবে। প্রেম যে মৃত্যুর সীমা পার হইয়া যায়। যতীন হিমিকে বলিয়াছে, "ভাই হিমি তুই থাকবি আমার ঘরটিতে। একদিন হয়তো সময় হবে ঘরে প্রবেশ করবে সেদিন যে লোকেই থাকি আমি জানতে পারব।"

তখনও পর্য্যন্ত মিথ্যার ক্ষীণ একটা আবরণ ছিল বলিয়া যতীন তাহার মনকে এমনি করিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পর মণির হৃদয়ের পরিচয় যতীনের নিকট যখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে যখন মোহ জাগাইয়া রাখিবার ক্ষীণতম অন্তরালও কোথাও এতটুকু নাই, তখন যতীনের সকল সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিচিত্র তত্ত্ব মুহূর্ত্তে মরীচিকার মত মিলাইয়া গিয়াছে।

প্রেম শূন্য হৃদয় শূন্য সৌন্দর্য্য-ধ্যানে মানুষের অধ্যাত্ম পিপাসার নিবৃত্তি ঘটে না। অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় সৌন্দর্য্য-ধ্যান সম্পূর্ণ বন্ধ্যা।

মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যতীন তাই একমাত্র মাসি ও হিমিকে নিকটে লাভ করিতে চাহিয়াছে। জীব-লোক ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে জীবের স্নেহ স্পর্শ লাভের সেই চিরন্তন সত্য ব্যাকুলতা। যতীন মাসী ও হিমির মধ্যে সেই অপার স্নেহ ও প্রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহার জীবনে তাহারাই একমাত্র সত্য কার কেউ নয়, আর সব মিথ্যা! যতীনের ওই সর্ব্বশেষ উক্তি।

"মিথ্যে সান্ত্বনার আমার দরকার নেই। বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। মাসি এখন আমার তুমি আছ কোনো মিথ্যাকেই চাইনে। আয় ভাই হিমি, আমার পাশে বোস।"

সত্য প্রেমে অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহাতে ঈশ্বরীয় প্রেমের ছায়া পড়ে। ওই সৌন্দর্য্য-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া মানুষ

তাই ক্ষণে ক্ষণে মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। জীবনের বাস্তব সকল পিপাসাও আবার এই প্রেমে চরিতার্থ হয় বলিয়া ওই সৌন্দর্য্য-লোক পরম সুন্দরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বিলীন হইয়া যাইতে কোন বাধা পায় না। সত্য প্রেম ও সৌন্দর্য্য-ধ্যানে এবং ঈশ্বরীয় প্রেম ও সৌন্দর্য্য-ধ্যানে যে পার্থক্য তাহা পরিণামগত। যতীন তাহার প্রেমকে ঈশ্বরীয় প্রেমে স্বাভাবিক পরিণাম দান করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পারে নাই তাহার মূল সত্যের মধ্যে নিহিত ছিল না বলিয়া।

যতীন পরিশেষে এই সমস্ত মিথ্যা প্রয়াস পরিহার করিয়া ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা যাচ্ঞা করিয়াছে। জীবন কোন পরিণামে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায় না।

তপতী

নাট্য কাহিনীর পূর্ব্ব আখ্যায়িকাটি এইরূপ। জালন্ধরের অধিপতি বিক্রমদেব কাশ্মীর অভিযান করিয়া কাশ্মীর বিজয় করেন। বিক্রম দেবের সামর্থ্য ও সাহস এবং পরাক্রান্ত সৈন্যদল যেমন ছিল তেমনি রাজ্যের কয়েকজন বিদ্রোহী অমাত্যের সহায়তাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য জয়ে রাজাকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। ভাগ্যও রাজার প্রতি প্রসন্ন ছিল। রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমারসেন তখন অভিষেক বারি আনয়নের জন্য রাজ্যের বাহিরে। কুমারসেনের এক খুল্লতাত সিংহাসন লাভের আশায় সৈন্য চালনার ভার লইয়া যুদ্ধ করিবার ছলে সুকৌশলে পরাজয় স্বীকার করিয়া বিক্রমদেবের অধীনে সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজ্যের অকারণ লোকক্ষয় বন্ধ করিবার জন্য এবং জালন্ধর অধিপতির সহিত কাশ্মীরের মৈত্রী স্থাপনের জন্য খুল্লতাত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার 'একমাত্র কন্যা, কুমারসেনের ভগ্নি সুমিত্রার সহিত

রাজার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। রাজ্যের অগৌরবের সহিত সুমিত্রাকেও এই অগৌরব বরণ করিয়া লইতে হয়। বিক্রমদেব এবং তাহার খুল্লতাতের এই প্রস্তাব শুনিয়া সুমিত্রা অপমান জ্বালা ভুলিবার জন্য অগ্নি-শয্যা প্রস্তুত করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হন। পরে তিনি বুঝিতে পারেন এ বিসর্জ্জনে কোন লাভ নাই। তিনি রাজ দুহিতা রাজ্যের কল্যাণ অকল্যাণও তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া রাজা ব্যর্থ আক্রোশে হয়ত সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যের উপর অবাধে অত্যাচার করিবে। এই বিবাহ বন্ধন তাহার পক্ষে যত অগৌরবের যত গ্লানিকর হোক-না-কেন কাশ্মীরের প্রজার জন্য তাহাকে ইহা বরণ করিয়া লইতে হইবে। কাশ্মীরের প্রজার জন্য তাহার জীবন হইবে মহতী দুঃখের।

ইতিপূর্ব্বে সুমিত্রা কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে চিত্ত শুদ্ধির জন্য তিন দিন উপবাসে থাকিয়া তপস্যা করেন। এই তপস্যার ভিতর দিয়া নিঃসীম দুঃখই তিনি কেবল জয় করেন নাই তিনি আপনাকে দেবতার নিকট নিঃশেষে সমর্পণ করেন। এই নিঃশেষ সমর্পণের অর্থ হইল তাঁহার সমগ্র জীবন, জীবনের সকল কর্ম্ম হইবে অনাসক্ত, পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি অনাসক্তি।

রাজা মর্ত্ত্যের সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে সবলে তাঁহার ভোগের মধ্যে লাভ করিতে চাহিতেছেন, এবং তাঁহাকেও রাজ্যের কল্যাণের জন্য এই বন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রমাণ করিবেন যে ভোগের মধ্যে কাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। আত্মার শক্তি ত্যাগের শক্তি পার্থিব যে কোন শক্তি অপেক্ষা বড়। রাজা তাঁহার দেহকে বন্দী করিতে পারেন, প্রয়োজনে দেহকে লাঞ্ছিত করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার আত্মা থাকিবে অম্লান। কোন শক্তিমান মানুষের হাত সেখানে পৌঁছায় না। এই ব্রতের পরিচয় সুমিত্রা দান করিয়াছেন।

"প্রজা রক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার ক'রে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলুম তখন

* * * এই শক্তি চেয়েছিলুম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি। তবে আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না!"

সুমিত্রা তখন বালিকা। ইতি মধ্যে সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক বৎসরে রাজার জীবনে যেমন সুমিত্রার জীবনেও তেমনি পরিণাম ঘটিয়াছে অনেক খানি। উভয়ের এই পরিণাম সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে। সুমিত্রার যে ব্রত তাহা কেবল ওই বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করিয়া লইবার জন্য স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়; যে-কোন অবস্থাতে তাঁহার মধ্যে ভোগ বৈরাগ্য জাগিতই। এক একটি মানুষ জন্ম হইতেই তাহার স্বভাবের মধ্যে অমর্ত্যের বা অমৃতের পিপাসা লইয়াই জন্মায়। এই আহ্বান সত্য করিয়া যাহার অন্তরের মধ্যে পৌঁছায় তাহাকে সংসার ভোগের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবে এমন সাধ্য কি!

সুমিত্রা একমাত্র সেই জাতীয় পুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারে যাহার মধ্যে এমনিতর ভোগ বৈরাগ্য আছে, অমৃত লাভের জন্য যাহার অন্তর নিয়ত অশ্রুসিক্ত। সে মিলন নর-নারীর জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে না। বিপাশা ইহাকে বলিয়াছে 'মুক্ত ধারার মিলন'।

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার মধ্যে এই স্বভাবের মিল ঘটে নাই। সুমিত্রা ও বিক্রমদেবের স্বভাব এক নয়। বিপাশা বলিয়াছে রাজা ও রাণীর মিলনটাই পাপবিদ্ধ। পাপের ওই ছিদ্রপথ দিয়াই কাল প্রবেশ করিয়াছে। একথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সত্য এইজন্য যে এই অত্যাচার ছিল বলিয়া রাণীর অন্তরে গ্লানি কোন কালেই ঘুচে নাই। রাজাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর জুড়িয়া আছে তাঁহার মার্তণ্ডদেব, তীব্র বিষয় বৈরাগ্য। সম্পূর্ণ সত্য নয় এইজন্য যে যদি উভয়ের স্বভাবের মিল থাকিত তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে নিয়ত এমন আত্মঘাতী সঙ্ঘাত জাগিত না। বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

রাজার সাধনা প্রবৃত্তির সাধনা; কিংবা বলা যায় প্রেমের সাধনা। এই সাধনায় ভোগ বা বাসনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি চাই-ই। ভোগ পরিতৃপ্তি শেষে যে ভোগ বিরক্তি ইহা তাহাও নহে। এই কামোপভোগই ধীরে ধীরে নর-নারীকে উন্নততর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। হৃদয়ের এই বেদনা ভারই প্রেমের মুক্তা সৃষ্টি করে। প্রেমের এই আশ্চর্য্য তত্ত্ব। এই পরিশুদ্ধ প্রেমই নর-নারীকে মুক্তি দেয়। ইহা একান্ত কামোপভোগও নয় আবার একান্ত নিবৃত্তিও নয়। পূর্ণ জীবনাদর্শ ইহার কোন একটিও না। পূর্ণ জীবনাদর্শ এই উভয়ের মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য সাধন করে। ইহারই নাম প্রেম।

রাজা এই সাধনায় যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। রাজার মধ্যে সেই শক্তি ছিল, সে সাধনাও ছিল। ভাগ্য বিড়ম্বনায় রাজা ওই সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। যাহাকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের এই সাধনা সেই নারী তাঁহার জীবনে প্রতিকূল, স্বেচ্ছায় নয় ভাগ্য বিপর্য্যয়ে।

রাজার অন্তরে দুর্জ্জয় প্রাণ-শক্তি। সেই প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার কোন শক্তিই রাণীর নাই। তাঁহার ওই জাতীয় মিলন, উহার জন্য নিয়ত গ্লানি বোধ, তাঁহার ব্রত ইত্যাদির জন্য নয়; রাণীর স্বভাবের মধ্যে এই জাতীয় ঐশ্বর্য্য নাই। পুরুষের দুর্জ্জয় বাসনা কামনাকে ভোগে শান্ত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ওই শক্তিকেই উর্দ্ধায়িত করিতে পারে যে নারী সে নারীর স্বভাব সুমিত্রার নয়। ইহারই জন্য সুমিত্রা রাজার বাহুবেষ্টনের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে ধরা দিতে পারেন নাই।

অপরিতৃপ্ত বাসনা রাজার অন্তরকে আরও অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ওই কামনা আরও তীব্র আরও অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, রাণী আরও আশঙ্কিত হইয়া আরও দূরে সরিয়া আসিয়াছেন, আপনার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আরও আবরণের পর আবরণ টানিয়াছেন। দুই জনের পরিণাম তাই দুই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। রাণী সুমিত্রা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়াছেন।

"সুমিত্রা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি-সে শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। * * এই শক্তির দুর্জ্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না— এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্ব।"

অপরিতৃপ্ত কামনার বিষে রাজার সকল পৌরুষ দিনে দিনে ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। রাজা রাজ কার্য্য ভুলিলেন, রাজ কর্ত্তব্য ভুলিলেন। রাজ অন্তঃপুরে রাজা আপনার স্থান করিয়া লইলেন। রাজার অন্তরে প্রাণের অপরিমিত প্রকাশ। এই প্রাণ-শক্তি ভোগ-লালসার পশ্চাতে সক্রিয় হইয়া তাঁহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছে। রাজা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সমগ্র রাজ্যকে তেমনি ওই ভোগ সর্ব্বস্বতার মধ্যে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। প্রাণের শূন্যতাকে রাজা অমনি করিয়া অন্তরে বাহিরে পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। প্রবৃত্তি নিত্য নূতন উত্তেজনা না পাইলে অশান্ত হইয়া উঠে, রাজাও তাই অন্তরে বাহিরে নিত্য নূতন উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। কেবল উৎসব কেবল আনন্দ কেবল ভোগ শুধু, মাধুর্য্য শুধু কমনীয়তা শুধু সৌকুমার্য্যের সাধনা।

রাজা যে কাশ্মীরীদের সহায়তায় কাশ্মীর বিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের উপর এক প্রকার রাজ্য শাসন ভার অর্পণ করিয়া দিলেন। কাশ্মীরী হইয়া কাশ্মীরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা যাহারা করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কোন কিছু প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা আপনাদের ভোগ লোলুপতাকে সকল বন্ধন বিহীন করিয়া তুলিল। তাহাদের অত্যাচারে, নির্ম্মম শোষণে রাজ্য জুড়িয়া হাহাকার উঠিল। কিন্তু সেই শোক সাগরের ক্ষীণ ধ্বনিও রাজার কর্ণগোচর হইল না। অভিযোগ যে রাজার নিকট মাঝে মাঝে আসিয়া পৌঁছাইত না তাহা নহে, কিন্তু রাজা তাহাকে বিদেশীদের প্রতি এদেশীয় জনগণের ঈর্ষা বলিয়া উড়াইয়া

দিতেন। বস্তুতঃ ভোগের আয়োজন ছাড়িয়া রাজকার্য্যে সময় ক্ষেপণ করিতে রাজা কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিতেন না। এমনি করিয়া একদিকে প্রবৃত্তির সোপানে রাজা একের পর এক সোপান নিম্নে অবতরণ করিতেছেন, অন্যদিকে রাজার এই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে, অন্যায় প্রতিহত না হইল তাহার শক্তি অত্যন্ত দ্রুত বাড়িয়া যায়।

রাজার অধঃপতন রাজ্যের এই অকল্যাণের পরিচয় যেমন তেমনি তাহার কারণও বিপাশার উক্তির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। বিপাশা সুমিত্রাকে বলিয়াছে।

"এই ভুবন মোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি —কিছু চাইলে না, কিছু দিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি। কিন্তু কত বড়ো দুর্ভাগা রাজ সিংহাসনের উপরে বসে ছটফট করে মরছে, দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নির্বুদ্ধিতার ধিক্কারে আজ সকলেরই উপর রেগে উঠছেন।"

রাজার কর্ম্ম কুণ্ঠতা কর্ত্তব্য বিমুখতা শাসন-শৈথিল্য নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মূলে যে প্রতিহত অপরিতৃপ্ত কামনার বিকৃত প্রকাশ সেই কথাটাই এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। অপরিমিত শক্তি বিশ্বমুখিন হইলে যেমন মহান রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে তেমনি নিম্নমুখিন হইলে তাহা প্রবৃত্তির প্রকাশকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে। রাজার জীবনে প্রবৃত্তির প্রকাশ অত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল কেবল এই জন্য।

অত্যাচারে অশাসনে অনাচারে অধর্ম্মে যখন সমগ্র রাজ্য জুড়িয়া হাহাকার উঠিয়াছে তখন রাজা সেই কান্নার কণ্ঠরোধ করিয়া দেশ জুড়িয়া সম্ভোগের আয়োজন করিয়াছেন।

রাজা তাঁহার জীবনে একদিকে এই পরিণাম লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে রাণী রাজার কামনা-কল্লোলকে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া প্রতিহত করিবার ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন। এমনি করিয়া উভয়ের

মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। রাজা এখন জীবনে কামোপভোগকে সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছেন, আর রাণী মানবীয় সকল নিম্নতর বোধকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিয়া শুদ্ধসত্ত্ব চৈতন্যে স্থিতি লাভ করিয়াছেন। আত্মার প্রেরণা আত্মার শক্তি রাণীর জীবনে এখন একমাত্র প্রেরণা এবং একমাত্র শক্তি। তিনি এখন কাশ্মীর রাজ দুহিতা নন জালন্ধর রাজ মহিষীও নন, তিনি এখন বিশ্বের নির্ব্বিশেষ কল্যাণ শক্তি মাত্র। সেই কল্যাণ শক্তি আশ্রয় করিয়া তিনি যতদূর সম্ভব রাণীর কর্ত্তব্য করিয়াছেন, কাশ্মীরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা নিষ্কাম নিরাসক্ত। তিনি এখন সেই নির্ব্বিশেষ ধর্ম্ম পরিণাম লাভ করিয়াছেন, যে ধর্ম্ম নর-নারীর অন্তরে থাকিয়া নিতান্ত শুভবুদ্ধি, বিবেক ও মহত্ত্বর প্রেরণা সঞ্চার করে। তিনি দেবতার, তিনি লোকমাতা, শুদ্ধা দৈবী প্রেরণা। তাঁহার জগৎ আত্মার রাজার জগৎ প্রবৃত্তির। দেবদত্ত একটিকে বলিয়াছে দেব-শক্তি, অন্যটিকে বলিয়াছে দৈত্য-শক্তি। জগতে এই দুই শক্তির চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত চলিয়াছে।

রাজা ও রাণী উভয়ে যখন এই দুই ভিন্ন পরিণাম লাভ করিয়াছেন তখন হইতে নাটকীয় ঘটনাবলীর সুরু। এই পরিণামে পৌঁছাইয়া কেহ কাহারও স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রাণী চেষ্টা করিয়াছেন রাজাকে মহত্তর লোকে টানিয়া আনিতে। রাজ কর্ত্তব্যের কথা, প্রজার দুঃখের কথা, অমাত্যদের অত্যাচারের কথা, জীবনের উর্দ্ধতর প্রেরণার কথা, আত্ম-শক্তি ইত্যাদির কথা রাণী দিনের পর দিন রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। রাজা রাণীর কথা বুঝিতে পারেন না, পরন্তু তাঁহার কামনাবৃত্ত দিনের পর দিন বিস্তারিত হইয়া চলিয়াছে। অন্য দিকে রাজা সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া আপনার অন্তরের কথা রাণীকে বলিয়াছেন। তাঁহার প্রেম পিপাসা পরিতৃপ্ত না হইলে তাঁহার চিত্ত শান্ত হইবে না। চিত্ত শান্ত না হইলে রাজ কর্ত্তব্য সাধন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রাণীকে রাজা তাঁহার ব্যাকুল বাহু বেষ্টনের মধ্যে সম্পুর্ণরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। আর

রাণী রাজার উন্মত্ত কামনা সাগরের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবিক বোধের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রাণী, অন্য প্রান্তে দাঁড়াইয়া রাজা। দুজনে দুজনের সহিত মিলিত হইতে পারিতেছেন না। তাই একদিকে অপার করুণা অন্যদিকে নিস্ফল দুরন্ত আক্রোশ।

"বিক্রম। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য্য—। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত।

"সুমিত্রা। * * * তোমার নিজের তরঙ্গ গর্জ্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন করে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চারদিকে। কত মর্ম্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্ত কুহরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে তা' বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চারিদিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না।"

রাজা আপনার জীবনে যেমন প্রবৃত্তিকে একমাত্র প্রেরণা করিয়া তুলিয়াছেন বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তেমনি একমাত্র সেই শক্তিটিকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। উহারই মধ্যে মানুষের যে মোহন সর্ব্বনাশ তাহাকেই তিনি মহামুক্তি বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

রাণী আপনার জীবনে যেমন তেমনি সর্ব্বত্র আত্মিক শক্তিটিকেই প্রত্যক্ষ করিতে, জীবনে ও জগতে একমাত্র তাহাকেই জয় যুক্ত হইতে দেখিতে চাহিয়াছেন। জীবনের সম্পূর্ণ দুই বিপরীত প্রেরণার প্রতীক রাজা ও রাণী। এই অবস্থায় অনিবার্য্য রূপে প্রবল সজ্ঘাত সৃষ্টি হইয়া দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদকে একান্ত করিয়া তুলে। এই অবস্থায় কেহ কাহাকে সহায়তা করিতে পারে না এমনকি পরস্পরের সঙ্গ পর্য্যন্ত অসহনীয় বোধ হয়। রাণী পরিশেষে মিলিত প্রয়াসের চেষ্টা পরিহার করিয়াছেন। রাণী দেখিয়াছেন তাঁহার হস্তক্ষেপে কাহারও কল্যাণ তো হয়ই না উপরন্ত অকল্যাণই বাড়িয়া চলে।

কাশ্মীরে মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে ব্রত ধ্যান আরাধনায় মার্ত্তণ্ডদেবের

উপাসিকা রূপে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিবার জন্য রাণী তাই গোপনে জালন্ধর ত্যাগ করিয়াছেন। জালন্ধর ও কাশ্মীরের কল্যাণের জন্য, সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মার জন্য তিনি দেবতার নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিবেন। জীবন দিয়া তিনি এখন ইহাই মাত্র করিতে পারেন।

রাণীর এই জালন্ধর পরিত্যাগ সম্পর্কে বিপাশা মন্তব্য করিয়াছে "আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাণ্ডারে তাদের বন্ধন রুদ্রদেব সহ্য করতে পারেন না।"

রাণী জালন্ধর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন দেবতার নিকট আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য, এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধ উপজাত হয়। আপনার কামনা-বন্ধনের মধ্যে রাণীকে লাভ করিতে না পারিয়া রাজা স্থির করিলেন রাণীকে বল প্রয়োগে আপনার ভোগের মাঝখানে বাঁধিয়া রাখিবেন। তিনি স্থির করিলেন পুনরায় কাশ্মীর বিজয় করিয়া রাণীকে মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দির হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিবেন। রাজা রাণীর মর দেহ লাভের জন্য কামোন্মত্ত, অন্যদিকে রাণীর আত্মা তাঁহার প্রাণ-মন দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত। দেবতার কাম্য রাণীর আত্মা রাজার কাম্য রাণীর অপরূপ লাবণ্য পরিপূর্ণ তনুলতা। দেবাসুরের সংগ্রাম এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর ও সর্ব্বনাশা হইয়া উঠিয়াছে।

রাজার কামনাই নিদারুণ ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া রাজাকে সম্পূর্ণ হৃদয় হীন করিয়া তুলিয়াছে।

রাজার উদ্দেশ্য সুমিত্রাকে যেমন করিয়াই হোক মন্দির হইতে সবলে আপনার ভোগের মাঝখানে টানিয়া আনা। রাজা তাই সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য জুড়িয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্যাচারে হত্যায় লুণ্ঠনে বর্ব্বরতায় রাজা সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে হাহাকার জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

সুমিত্রা তাঁহার ধর্ম্মের প্রতীক, কাশ্মীরের উপাস্য দেবতা

মার্তণ্ডদেবের উপাসিকা। সুমিত্রার অপমান তাই ধর্ম্মের অপমান। এই ধর্ম্মলাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন ধর্ম্মবীর রাজ-শক্তিকে প্রাণ দিয়াও প্রতিহত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়া অগণিত নর-নারীর বক্ষ রক্তে পথ প্রান্তর আরক্ত করিয়া রাজা ও রাজসৈন্য ক্রমাগত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাণী শান্ত অবিচলিত অন্তরে রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ইতিমধ্যে মানুষের নিঃসীম দুঃখের কত-না-পরিচয় তিনি দিনের পর দিন লাভ করিতেছেন, রাজার অত্যাচার ও অনাচারের কত-না কাহিনী।

এই কালে চন্দ্রসেন ও রাজার মধ্যে যে তীব্র বাক্‌বিতণ্ডা হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"চন্দ্রসেন: মহারাজ, কাশ্মীরের দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ কোরো না। দেবালয়ে গিয়ে মার্তণ্ডদেবের উপাসিকাকে হরণ করা সইবে না।

"বিক্রম। তোমাদের মার্তণ্ডদেবই তো আমার মহিষীকে হরণ করেছেন। দেবতার চৌর্য্য আমি স্বীকার করব না।

* * *

"চন্দ্রসেন। দেবমন্দির ইহলোকের সীমায় নয় মহারাজ, সে তো পার্থিব কাশ্মীরের বাইরে।

"বিক্রম। তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি।"

যতক্ষণ রাণী মর্ত্ত্যের রূপ-বন্ধনে আবদ্ধ ততক্ষণ রাজার আকাঙ্ক্ষা কোন উপায়ে প্রতিহত হইবে না। ওই রূপ তাঁহাকে অহর্নিশ অকর্ষণ করিবে। রাণীর ওই রূপটিকে তাঁহার চাই-ই।

চন্দ্রসেন রাজাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে রাণী যে জগতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন সে জগতে মানুষের প্রবলতম প্রতাপও ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া যায়। তাহা আত্মিক জগৎ। বস্তু জগতের কোন শৌর্য্য, কোন

প্রতাপ কোন মালিন্য, কোন সুখ-দুঃখ তাঁহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার চেতনা, তাঁহার প্রাণ-মন দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে বটে, কিন্তু ওই দেহকেও জগতের কোন শক্তি দিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। দেহকে তাঁহারা মাটির পাত্রের মত যে-কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন। দেহকে বন্ধন করিয়া আত্মাকে জয় করিতে পারা যায় না।

এই শক্তি রাণীর মধ্যে অপরিমিত। রাণী তাই নিঃশঙ্ক অবিচলিত। অযথা যুদ্ধ করিয়া রক্তপাত ঘটাইতে নিষেধ করিয়া রাণী লোকমুখে রাজার নিকট সম্ভাষণ জানাইয়া পাঠাইলেন। রাণী দূত মুখে জানাইলেন—"তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণ প্রান্তে সুমিত্রা অপেক্ষা করবে।"

রাজার সঙ্গে সুমিত্রার বন্ধন কেবল মাত্র প্রবৃত্তির। রাণী মৃত্যুতে তাঁহার ওই রূপটিকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিয়া সেই সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিবেন।

রাণী চিতা-শয্যা রচনা করিয়া রূপের বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন করিবার পূর্ব্বে বিপাশাকে বলিয়াছেন, "রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্ব্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহ মন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেক দিনের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরম তেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।"

রাণীর এ মৃত্যু পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে আত্মার জয় ঘোষণা। রাণীর এই আত্মবিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া বিক্রমদেবের কি মোহমুক্তি ঘটিবে? ইহার ভিতর দিয়া রাজা কি রাণীর সত্য মূল্য অর্থাৎ অধ্যাত্ম প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শুরু করিবেন? ইহার পর হইতে রাজা কি বুঝিতে পারিবেন যে প্রবৃত্তির মধ্যে মনুষ্যত্বকে যতই জোরের সহিত প্রচারও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হোক-না তাহার মধ্যে নর-নারীর গৌরবের কিছুই নাই? সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

রাণী স্বয়ং এই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীরমৃত্যু শোকে কাতর এক নারীকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"যারা তাঁকে মেরেছে, মৃত্যুর দ্বারা তাদের তিনি জয় করেছেন, সে-কথা তারা কোন-দিন বুঝবে না এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা।"

সুমিত্রা স্বয়ং যে মৃত্যুর ভিতর দিয়া রাজার পার্থিব শক্তিকে জয় করিয়াছেন, আত্মার মহিমা প্রচার করিয়াছেন ইহাও রাজা কোন দিন বোধ করিতে পারিবেন না। কারণ রাজার শক্তি ও সাধনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা যদি সত্য হয় তবে জগতে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বও যে চিরন্তন তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

বস্তুতঃ মানুষের জীবনে এই উভয় প্রেরণার নিত্য সঙ্ঘাত ও সঙ্ঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই জীবনের একমাত্র স্বরূপ, তাহার একমাত্র নিয়তি নয়। মানুষ একান্ত দৈত্য নয় আবার একান্ত দেবতাও নয়। মানুষের মধ্যে এই দুই বোধ একেবারে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। মানুষে মানুষে এই দুই বোধের নানা প্রকারের মিশ্রন রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে একটির আধিক্য কাহারও মধ্যে অপরটির। পূর্ণ মনুষ্যত্বে দেব ও দৈত্যের, আত্মা ও দেহের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন প্রয়োজন। রাজা ও রাণীর কাহারও আদর্শ তাই পূর্ণ জীবনাদর্শ নয়। জগৎ ও জীবনের বিরোধ তত্ত্বও তাই শাশ্বত নয়। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ও জীবন এমন একটা পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে যেখানে এই বিরোধ আর থাকিবে না। জীবনের সমস্যা সমাধান করিতে সেই মিলন তত্ত্ব বা সামঞ্জস্য তত্ত্বটির সন্ধান লাভ করিতেই হইবে। কারণ জীবনের দুই বিপরীতমুখী প্রেরণায় কোন একটিকে একান্ত রূপে সত্য করিয়া জীবনের সমস্যা সমাধন করিতে পারা যাইবে না, কারণ উহা জীবনের স্বরূপ নয়। এই সম্পর্কে দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"The new humanity will be universal-and it will have the artist's attitude ; that is, it will recognize that the immense value and beauty of the human being lie precisely in that he belongs to the two kingdoms, of nature and spirit. It will realize that no romantic conflict or tragic dualism is inherent in the fact ; but rather a fruitful and engaging combination of destiny and free choice. Upon that it will base a love for humanity in which its pessimism and its optimism will canceal each other out." Thomas Mann.

"Whre ever in the realm of mind and personality, I find that ideal manifested, as the union of darkness and light, feeling and mind, the primitive and the civilized, wisdom and the happy heart-in short as the humanized mystery we call man : there lies my profoundest allegiance, there is my heart finds its home." Thomas Mann.

"Personality, individuality, may be a biological device which has served its end in evolution and will decline. A conscious of something greater than ourselves—the immortal soul of the race-may be taking control of the direction of our lives." H. G. Wells.

"This idea of the immortal soul of the race in which our own lives are like passing thoughts, is to be found in what Confucius called the Higher person, in what St. Paul called the New Adam, in the Logos of Stoics, in the modrn talk we hear of the over man or Superman." H. G. Wells.

"The subordination of self to higher order of being does not mean the suppression of all or any of one's distinctive gifts. We have to use ourselves to the utmost. We have to learn and make to the full measure of our possibilities. It is a sin to bury the talent, the individual gift which we posses for the good of the greater being, Man." H. G. Wells.

বাঁশরি

সন্ন্যাসী পুরন্দর যে মহা ব্রত উৎযাপন করিতে চান তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় নাটকের মধ্যে দান না করা হইলেও তাহার জন্য যে ধাতুর নারী ও পুরুষ প্রয়োজন যে বিশিষ্ট সাধনা তাহার একপ্রকার আভাস লাভ করিতে পারা যায়। বাঁশরি ক্ষিতীশকে বলিয়াছে—"কোন্ ডাকঘর বিবর্জ্জিত দেশে ও এক সঙ্ঘ বানিয়েছে, তরুণ তাপস সঙ্ঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরী হচ্ছে।"

সেই মানুষ তৈয়ারীর পরীক্ষার একটা পরিচয় নাটকের মধ্যে দান করা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে পুরন্দরের সাধারণ একটা পরিচয় লাভের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ পুরন্দরকে সেই শ্রেণীর নর-নারীর একপ্রকার আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে। সমগ্র নাট্য কাহিনীর মধ্যে পুরন্দরের যে পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহাকে একত্র করিয়া উপস্থাপিত করিলে এই দাঁড়ায়!

পুরন্দর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস, এক কথায় মানুষের বিপুল বিচিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারের সহিত প্রত্যক্ষ ও নিবিড় পরিচয় লাভ করিয়াছে। শুধু বহির্বিষয়ক জ্ঞান নয়, অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য সুদীর্ঘ কাল দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া আত্মজ্ঞানও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতীয় ষড় দর্শনে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। অতুলনীয় তাহার শৌর্য্য বীর্য্য; পশু শিকার হইতে পোলো খেলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহার সমান প্রবেশাধিকার। ঘোড়ায় চড়িতে, সাঁতার কাটিতে, বন্দুক ছুঁড়িতে পুরন্দর সবই দক্ষতার সহিত জানে। পুরন্দর সুর-স্রষ্টা ও গায়ক। পুরন্দরের নাম-রূপ, জাতি-ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন সংস্কার নাই। নবাব দরবারে মুসলমানের পোষাক পরিধান করিয়া নবাবের সহিত একত্রে পানাহার করিতে তাঁহার যেমন কোন বিকার বোধ হয় না, তেমনি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে ইংরেজ বন্ধুর আতিথেয়তা

স্বীকার করিয়া ম্লেচ্ছ আহার করিতে ও তাহার কোন সঙ্কোচ জাগে না। পুরন্দর সর্ব্ব সংস্কার মুক্ত সকল বন্ধন মুক্ত আত্মজয়ী পুরুষ। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে।—গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ।

যে আদর্শ নর-নারী এবং আদর্শ সমাজের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন তাহারই একটা আভাস পুরুন্দর এবং তাঁহার সৃষ্ট সমাজের মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়। ভবিষ্যতে যে পুরুষ এই সমাজ গড়িয়া তুলিবে, কিংবা বর্ত্তমানেই যে পুরুষ হয়ত সেই সমাজ রচনার কর্ম্মে ব্যাপৃত, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চরিত্র, তাঁহার ক্রিয়া কলাপ তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের একটা আভাস দানের চেষ্টা করিয়াছেন পুরন্দর চরিত্রের মধ্যে। ইহাও একপ্রকার Superman, বা অতিমানব এবং তাহার দিব্য-সমাজ রচনার স্বপ্ন। সমগ্র মানব-সমাজ যে ধীরে ওই পরিণাম মুখী হইয়া চলিয়াছে, তাহার সেই বেগকেই আর দ্রুত করিয়া তোলার ব্রত অনেকের মত পুরন্দরের ও ব্রত। পুরন্দরের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

সমগ্র মানব-প্রকৃতি যে পরিণাম লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, পুরন্দর সমগ্র মানব প্রকৃতির মধ্যে যে রূপান্তর সাধন করিতে চায় তাহার পরিচয় পুরন্দর একটি পত্রে বাঁশরিকে জানাইয়াছে। মানব প্রকৃতির সে রূপান্তর ও মুক্তি পরিশুদ্ধ জ্ঞান (পরিশুদ্ধ জ্ঞান বলিতে জ্ঞানের আত্ম বা অধ্যাত্ম মুখীনতা বুঝায়) ও অধ্যাত্ম-লোকে। এই রূপান্তর সাধন বা মুক্তি সাধনার ক্ষেত্রে সর্ব বৃহৎ অন্তরায় হইল মানুষের প্রাণ-লোক, যাহাকে বলে প্রবৃত্তি এবং উহার বিচিত্র মোহনীয় প্রকাশ। এই প্রাণ-লোককে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিতে না পারিলে পূর্ণ জ্ঞানের লোকে মুক্তি লাভ অসম্ভব। সন্ন্যাসীর পত্র ঃ—

"প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্ব্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অধিকৃত করে। সংসারে যত দুঃখ, যত বিরোধ,

যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি ভালোবাসায় বন্ধন।"

সকল দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম শেষে পুরন্দরের এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সোমশঙ্কর, সুষমা ও বাঁশরী। সোমশঙ্করের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় নাটকের মধ্যে নাই। নাটকের যবনিকা উঠিবার পূর্ব্বেই সোমশঙ্করের এই পরিণাম সম্পূর্ণ হইয়াছে। অবশিষ্ট সুষমা ও বাঁশরি। সুষমার অন্তর্দ্বন্দ্বের সামান্য পরিচয় নাটকের মধ্যে থাকিলেও বাঁশরির মত তাহা সম্পূর্ণ নয়। সুষমার চরিত্রের এই ধীর পরিণামের পরিচয় দান ভালোবাসা হইতে প্রেমে বন্ধন হইতে মুক্তিতে, নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া মনুষ্য সত্তার নারী প্রকৃতির গভীরতম লোক পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। সে পারচয় লাভের পূর্ব্বে সমগ্র কাহিনীটি অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

তরুণ তাপস সঙ্ঘের অর্থাৎ দিব্য-সমাজ সংস্থাপনের জন্য পুরন্দর দেশের সকল স্থান হইতে সদস্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিত। তরুণ সমাজের সংস্পর্শে আসিবার জন্য পুরন্দর বিনা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করিত। ব্রতপালনের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, ওই সাধনার উপযুক্ত আধার দেখিলে পুরন্দর তাহাকে আপনার সংঘের সদস্য ভুক্ত করিয়া লইত। এই দিব্য-সমাজের পরিচালক কিন্তু পুরন্দর নয়। তাহার ব্রতপতি স্বয়ং ঈশ্বর। পুরন্দরের কাজ হইল অধ্যাত্ম বোধে নর-নারীর হৃদয় জাগ্রত করা। তাহার পর নর-নারী আপনার হৃদয় আলোকে আপনি পথ চিনিয়া লইতে পারিবে। ইহ জগতের কোনো কিছু লাভের আশায় পুরন্দর এই সমাজ গড়িয়া তুলিতে চায় নাই, কোনো কল্যাণ বোধের প্রেরণায়ও নয়। তাহা হইলে তাহার প্রয়াস হইত সকাম, দিব্য-কর্ম্ম, দিব্য-সমাজ ইত্যাদির কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত। এই ব্রত একমাত্র ঈশ্বরের, ঈশ্বরের ব্রত উৎযাপনের সে একটি যন্ত্র মাত্র। একমাত্র সেই দিব্য-প্রেরণায় পুরন্দরের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া তাহা সর্ব্বফল

কামনা শূন্য। সে চায় যে প্রেরণা তাহার মধ্যে নিয়ত জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে তাহার সদস্যদের মধ্যে একমাত্র সেই নির্ব্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক প্রেরণা জয়যুক্ত হোক ইহার সহিত আর কোনো প্রেরণা যতখানি জড়িত থাকিবে জীবনে সেই প্রেরণা লীলায়িত হইতে ততখানি বাধা প্রাপ্ত হইবে, দিব্য-সমাজ সৃষ্টি ততখানি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই সাধনায় ব্যক্তিগত মাধুর্য্য ও অনুশাসন দুর্লঙ্ঘ বাধার সৃষ্টি করে। পুরন্দর মুক্ত পুরুষ বলিয়া এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

সোমশঙ্কর সুষমা ও বাঁশরিকে অধ্যাত্ম-লোকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিগত মাধুর্য্য আসক্তি ও মোহ সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত করিয়া দিয়া চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম। এমনি করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুরন্দরের সহিত সুষমার পরিচয় ঘটিয়াছে। শিক্ষকতা তাহাকে সুষমার নিকট সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ দিয়াছে। সন্ন্যাসী পুরন্দরের শিষ্যা সুষমা।

পুরন্দর তাহার তাপস সঙ্ঘের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন নারী সদস্য নির্ব্বাচন করে নাই, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত পুরন্দর কোন নারীর মধ্যে সেই বিশিষ্ট গুণাবলীর সন্ধান পায় নাই। পুরন্দর এতদিন পরে সুষমার মধ্যে সেই দুর্লভতার সন্ধান পাইয়াছে। সুষমাও পুরন্দরের মধ্যে দুর্লভ মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। সুষমার সমস্ত সত্তা ভক্তিতে প্রেমে পুরন্দরের মধ্যে নিঃশেষে হারাইয়া গিয়াছে। সুষমার অন্তর্লোক জাগ্রত হইয়াছে পুরন্দরকে ভালোবাসিয়া, যে ভালোবাসা ভক্তিতে কৃতার্থতা লাভ করে।

একই সঙ্গে পুরন্দর সোমশঙ্করকেও নিকটে লাভ করিয়াছে, আকস্মিক ভাবে নয়, যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া। সোমশঙ্কর রাজ পরিবারের সন্তান। সে জন্য নয়, পুরন্দর সোমশঙ্করের মধ্যে দুর্লভ বীর্য্যবত্তার সন্ধান লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় পৌরুষ ও নিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য মুখীন করিয়া তুলিতে পারিলে অচিরকালের মধ্যে সিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

কিন্তু তাহাকে সদস্য ভুক্ত করিতে পুরন্দর একটি প্রবল বাধা বোধ করিয়াছে। সেই বাধা দূর করিতে না পারিলে পুরন্দর যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পুরন্দরের পক্ষে তাহা অনতিক্রমনীয় বাধা। পুরন্দর ভালোবাসে বাঁশরিকে। ব্রতের জন্য পুরন্দর দৈহিক সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে। কিন্তু বাঁশরির প্রেমের আকর্ষণ উপেক্ষা করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়। বাঁশরি তাহার বাহুতে শক্তি দিতে পারে, বাঁশরি তাহার বাহুর সমস্ত শক্তি অপহরণ করিতে পারে। বাঁশরি সাধারণ নারী নহে। এই নারী বন্ধন সৃষ্টি করিতে চাহিলে সোমশঙ্করের মত আকাশচারী আত্মাকেও ধূলায় লুটাইয়া দিতে পারে। পুরন্দরের আশঙ্কা এই খানে।

পুরন্দর তাই সোমশঙ্করকে বাঁশরির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার সহিত তাই পুরন্দর এমন একজন নারীর বিবাহ দিতে চাহিয়াছে যে নারী সোমশঙ্করকে ভালোবাসায় বাঁধিবে না। পুরন্দর ইহারই জন্য সুষমাকে নির্ব্বাচন করিয়াছে। সুষমা ও সোমশঙ্কর আপন আপন পথে অধ্যাত্ম সাধনা করিয়া চলিবে। সেই পথ চলায় একে অন্যকে সহায়তা করিবে। ব্রতই হইবে উভয়ের জীবনের একমাত্র বন্ধন। এই ব্রতের জন্যই উভয়ে সাংসারিক সুখ উপেক্ষা করিবে। সুষমার হৃদয় জাগ্রত হইয়াছে সন্ন্যাসী পুরন্দরকে আশ্রয় করিয়া, সুষমার অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গী সোমশঙ্কর। সোমশঙ্করের অন্তর্লোক বিকশিত হইয়াছে বাঁশরির প্রেমে বাঁশরিকে ভালোবাসিয়া, তাহার অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গিনী সুষমা। প্রেম যে অর্থে অধ্যাত্ম স্বরূপতা লাভ করে অর্থাৎ তাহার যে ভাব-রূপের ধ্যান সে অর্থে সোমশঙ্কর ও সুষমা মিলিত হয় নাই। কারণ বাহিরের যে রূপ অন্তরে ভাব-স্বরূপতা লাভ করে সে রূপ সুষমার ক্ষেত্রে সোমশঙ্কর নয়, কিংবা সোমশঙ্করের ক্ষেত্রে সুষমা নয়। তাহাদের জীবনে বাহিরের রূপ যদি অন্তরে ভাব-স্বরূপতা লাভ করে তবে সুষমার ক্ষেত্রে পুরন্দর এবং সোমশঙ্করের ক্ষেত্রে বাঁশরি। প্রেম যখন অধ্যাত্ম স্বরূপতা লাভ করে

তখন বাহিরের পাওয়া গৌণ হইয়া যায়। সেই অধ্যাত্ম স্বরূপে সোমশঙ্কর ও বাঁশরি পরস্পর পরস্পরকে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে। এ প্রেমে আসক্তি নাই। প্রেমের এই যে আসক্তি মুক্ত পরিণাম তাহা ঠিক নির্ব্বিশেষ পরিণাম নহে। ইহাতে রূপের বোধ কোন-না-কোন স্বরূপে থাকে।

সন্ন্যাসী পুরন্দর ও সুষমার প্রেম এই পরিণাম লাভ করে নাই। পুরন্দর তাহার রূপ হইতে ভাব-রূপ হইতেও সুষমাকে মুক্তি দিয়াছে। নির্বিবশেষ প্রেম বলিয়া যদি কোন তত্ত্ব থাকে পুরন্দরের ক্ষেত্রেই তাহা সত্য হইয়াছে। পুরন্দর একথা বাঁশরিকে বলিয়াছে। বাঁশরি পুরন্দরকে দিয়া তাহার প্রেম স্বীকার করাইয়া লইতে চাহিলে সন্ন্যাসী বলিয়াছে,—"সত্য কি মিথ্যা সে কথা বলে কোনও ফল নেই, দুইই সমান।"

পুরন্দরের হৃদয়ে সুষমার কোন রূপই থাকিবে না। সুষমার প্রেম কিন্তু তেমনি কোন পরিণাম লাভ করে নাই। তাহা নির্ব্বিশেষ প্রেম নহে। সুষমা বাঁশরির ভাষায় পুরন্দরকে ভালোবাসিয়া তাহার ব্রতের হার গলায় পরিয়াছে। সুষমার অন্তরে পুরন্দরের ভাব-রূপ চিরকাল বিরাজ করিবে।

মানবিক প্রেম বলিতে যদি রূপাশ্রয়ী প্রেম বুঝায় তবে সোমশঙ্কর, সুষমা ও বাঁশরির প্রেমকেও মানবিক প্রেম বলিতে হয়। এই প্রেমই যদি অন্তরে ভাব বা অধ্যাত্ম স্বরূপতা লাভ করে তবে প্রেম নর-নারীর জীবনে আর বন্ধন সৃষ্টি করে না। এই তিন জনের জীবনেই প্রেম সেই অধ্যাত্ম-স্বরূপতা লাভ করিয়াছে। নির্ব্বিশেষ প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একমাত্র পুরন্দরের জীবনে সত্য। কিন্তু পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন।

পুরন্দরকে ভালোবাসে সুষমা, বাঁশরিকে ভালোবাসে সোমশঙ্কর। অথচ সব জানিয়া পুরন্দর সোমশঙ্করের সহিত সুষমার বিবাহ ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারাও উভয়ে এই ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মানিয়া লইয়াছে। এই মিলন সাধনে পুরন্দর কোন্ যুক্তি উপস্থাপিত

করিয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া নর-নারীর জীবনে কোন্ সার্থকতা সে দান করিতে চাহিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

বাঁশরি স্পষ্ট করিয়াই সোমশঙ্করকে জানাইয়াছে যে সুষমা তাহাকে ভালোবাসে না সুতরাং এ বিবাহে সোমশঙ্করের জীবনে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু লাভ ঘটিবে না। আর সুষমার জীবনও তো হইবে গভীর দুখের, কারণ তাহাকে এমন একজন পুরুষকে স্বামীপদে বরণ করিয়া লইতে হইবে যাহাকে সে কোন দিন ভালোবাসিতে পারিবে না; সুষমার সংসার জীবনও তাই শূন্যময়। উত্তরে সোমশঙ্কর বলিয়াছে, তাহারা সংসার রচনা করিতে চায় না, সুখও তাহাদের কাম্য নয়। সুষমার জীবনে একটি ব্রত আছে সেই ব্রত পালনে সে কেবল তাহাকে সাধ্যমত সহায়তা করিবে। বাঁশরি সোমশঙ্করের এই উত্তরে সম্পূর্ণ মূক হইয়া গিয়াছে। নর-নারীর এই জাতীয় মিলন যে ভিত্তি-ভূমির দাঁড়াইয়া সাধিত হয় তাহা তাহার উপলব্ধি বহির্ভূত সামগ্রী।

বাঁশরি তাহার পর পুরন্দরকেও অভিযোগ করিয়াছে। তাহার ধারণা সন্ন্যাসীর প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে সোমশঙ্কর এমন ভয়ঙ্কর আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইয়াছে। আত্মহত্যা নয় তো কি। যে নারী তাহাকে ভালোবাসে না, তাহার ভালোবাসা প্রত্যাশা করে না তাহার ভার সমস্ত জীবনভোর বহন করিয়া বেড়ান পুরুষের পক্ষে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন অধিকারে সন্ন্যাসী সোমশঙ্করের মত অতবড় জীবনকে চিরকালের জন্য বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। পুরন্দর ইহার উত্তরে বাঁশরিকে বলিয়াছে—

"ব্রতকে নিষ্কাম ভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ, এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে-পুরুষ অনেক দিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

"বাঁশরি। পুরুষ বলেই বুঝতে পারছে না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

"পুরন্দর। মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নাই।"

নির্ব্বিশেষ নিরাসক্ত এই যে প্রেম, এবং এই প্রেমে নর-নারীর যে মিলন তাহা যে কীরূপ, জীবনে এই মিলনে প্রয়োজন কি, তাহার ফল লাভ যে কী তাহা বাঁশরি বুঝিতে পারে না। ইহা তো কোন যুক্তি বা তর্ক নয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বাঁশরির চিত্ত আজও পর্য্যন্ত সেই উন্নত পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসীর সহিত তাই তাহার সজ্যাত তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়াছে মাত্র।

নর-নারীর জীবনে চরম লক্ষ্য হইল মুক্তি লাভ করা, এবং ওই বোধাশ্রয়ী হইয়া জাগতিক সকল কর্ম্ম করা কিংবা ওই বোধ মুখীন করিয়া জাগতিক সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করা। এই পরিপূর্ণতা লাভের পথে সর্ব্বাধিক বন্ধন আসক্তি, যে আসক্তির প্রবল আকর্ষণে নর-নারী মিলিত হয়। এই আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠিতে না পারিলে নর-নারীর জীবনে উন্নততর পরিণাম লাভ ঘটে না। বন্ধন কেবল অন্তরের মধ্যে নাই, বাহিরেও এই বন্ধন রহিয়াছে এবং তাহা বহু বিচিত্র। মানুষ মানুষের জন্য এই বিচিত্র দাসত্বের শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ণতা লাভের জন্য নর-নারীকে অন্তরের আসক্তির বন্ধন যেমন তেমনি সামাজিক বিচিত্র বন্ধনও ছিন্ন করিতে হইবে।

এই যে মুক্ত নিরাসক্ত নির্ব্বিশেষ প্রেমে মিলন তাহারই বা প্রয়োজন কি? অর্থাৎ এই প্রেমে বিবাহ তো নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ প্রশ্ন বাঁশরিও পুরন্দরকে করিয়াছে। পুরন্দর তাহার উত্তরে বলিয়াছে, "পুরুষ কর্ম্ম করে স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম্ম মুক্তির বাহন শক্তি।"

পুরন্দর সুষমার অন্তরে আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছে। আসক্তি ছিল বলিয়া সুষমার অন্তরে এমন আশঙ্কা। তাহার ভয় পুরন্দব দূরে সরিয়া গেলে সে হয়ত সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িবে এমন একটা মানসিক অবস্থা সুষমার ছিল যখন পুরন্দর দূরে চলিয়া গেলে তাহার অন্তর মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া যাইত। এই অবস্থা পুরন্দর যে লক্ষ্য করে নাই তাহা নহে। পুরন্দর তাহার অন্তরে নিয়ত শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে ওই মহৎ ভয় জয় করিয়া উঠিতে সহায়তা করিয়াছে। সুষমা ওই আসক্তি প্রায় জয় করিয়া উঠিয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয় নাই।

এখন পুরন্দরের দূরে সরিয়া যাওয়া প্রয়োজন। তাহাতে বেদনা বোধের ভিতর দিয়া আত্মশক্তিতে স্থিত হইবার একটা সংগ্রাম সুষমার অন্তরে জাগিবে। ইহাতে তাহার সুপ্ত সামর্থ্যের বিকাশ ঘটিবে। পুরন্দর তাই সুষমাকে বলিয়াছে, "আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয় দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারই দেবতা, দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনার মধ্যে।"

নারীকে এমনি করিয়া আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে হয়। এমনি করিয়া বেদনার সমুদ্র পার হইয়া নারীকে আনন্দময় উর্দ্ধতর সত্তা লাভ করিতে হয়। প্রেমে প্রাণ জাগে, এই প্রাণ একটি বিশিষ্ট রূপের চতুর্দ্দিকে নারীকে ঘুরাইয়া মারে। উন্নততর চেতনা লাভের জন্য নারীকে রূপের এই বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়।

সুষমা যদি এই আদর্শে অটুট থাকে। তাহার দেহ-প্রাণ-মন যদি সেই আদর্শের অধিষ্ঠান ভূমি হয় তবে সোমশঙ্করও তাহার আদর্শে অবিচলিত হইয়া থাকিবে। সুষমার প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকেও আপনার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিবে।

সোমশঙ্করের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া পুরন্দর তাই সুষমাকে বলিয়াছে—"সেই দুর্লভ মহত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে তার বীর্য্যকে সর্ব্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মুখ করবে, এই নারীর কাজ, মনে রেখো তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে।"

প্রেমে পুরুষ আত্মবিসর্জ্জন দেয়, প্রাণের পূর্ণতা বোধ করে বলিয়া। সোমশঙ্করের হৃদয়কে সুষমা যদি তেমনি প্রেম পরিপূর্ণ করিতে পারে তবে সোমশঙ্করের আত্মত্যাগ মহীয়ান হইয়া উঠিবে।

সুষমার ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, সেই ধর্ম্ম সোমশঙ্করকেও রক্ষা করিবে সুষমার ধর্ম্ম আত্মজ্ঞান লাভ, অধ্যাত্ম-জীবন বা দিব্য-জীবন লাভ, তাহাতে সহায়তা করার অর্থ হইল আপনার জীবনকেও দিব্য-জীবনে

রূপান্তরিত করা। সুষমার ধর্ম্ম সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে সোমশঙ্করও সাধন পথ হইতে স্খলিত হইয়া যাইবে।

বাঁশরি ও সোমশঙ্কর পরস্পরকে সঙ্গীরূপে লাভ করিয়াছিল যখন জীবনে তাহাদের প্রথম পথ চলার সুরু। সেইদিন হইতে তাহারা পরস্পরকে অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছিল। প্রেমের স্বাভাবিক যে পরিণাম মিলনে বা বিবাহে সেই স্বাভাবিক পরিণাম লাভের জন্য দুইজনেই তখন উন্মুখ। ভাবে বীর্য্যে মহত্বে সোমশঙ্কর যেমন দুর্লভ পুরুষ, মাধুর্য্যে, শক্তিতে ও ত্যাগে বাঁশরি তেমনি নারী কুল রত্ন। উভয়ের এই মিলন তাই বড় প্রত্যাশিত।

এমন সময় বজ্রপাতের মত তাহাদের মাঝখানে কোন্ রহস্যের বশে যে বিচ্ছেদ নামিয়া আসিল তাহা বাঁশরি সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। ইহার কিছুকাল পরে বাঁশরি বিস্মিত হইয়া দেখিল এক সন্ন্যাসী সোমশঙ্করকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সহিত তাহার এক শিষ্যার বিবাহ দিবার আয়োজন করিয়াছে। সুষমা অসামান্যা সুন্দরী নানা সদ্‌গুণ বিভূষিতা। অসামান্যা সুন্দরী বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। সুষমার আবির্ভাব যে-কোন পুরুষের চিত্তকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্ময় স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে।

সন্ন্যাসীর আইডিয়ার সহিত তখনও বাঁশরির পরিচয় ঘটে নাই। জীবনকে এই দিকে হইতে যে দেখা তাহার সহিত তাহার ইতিপূর্ব্বে কোন পরিচয় ছিল না। তাহা এমনি অভিনব যে বাঁশরি তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পায় না। আপাত দৃষ্টিতে তাহা তাহার নিকট পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হইয়াছে। সম্পূর্ণ মানবিক বোধ বিবর্জ্জিত ইহা কেমন যেন এক কিম্ভূতকিমাকার।

সাধারণ নারীর দৃষ্টিতে সোমশঙ্কর ও সুষমার বিবাহরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে বাঁশরির নিকট সেইরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। সোমশঙ্কর সুষমার রূপে মুগ্ধ হইয়া না হয় তাহার অমন প্রেম প্রেমে তাহার অমন প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু বাঁশরি সেই সঙ্গে নিশ্চিত রূপে জানে যে সুষমা ভালোবাসে সন্ন্যাসী পুরন্দরকে। তাহার মন

কোনদিন সোমশঙ্করের প্রতি অনুকূল হইবে না। যে-নারী ভালোবাসে না, যাহার হৃদয় অন্য পাত্রে ন্যস্ত তাহার ভার সমস্ত জীবন ভোর সোমশঙ্কর কেমন করিয়া বহন করিবে। সোমশঙ্কর তাহার নিকট হইতে পাইবে কি। সোমশঙ্করের জীবনে তাহা যে এক বৃহৎ বঞ্চনা। ওই বঞ্চনার ভারে সোমশঙ্করের সমস্ত জীবন যে পঙ্গু হইয়া যাইবে।

বাঁশরি তাই সোমশঙ্করের রূপ-মোহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সোমশঙ্করকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছে যে সুষমা তাহাকে ভালো-বাসে না তাহার হৃদয় অন্যত্র ন্যস্ত। উত্তরে সোমশঙ্কর বলিয়াছে সে তো সুষমার ভালোবাসা প্রত্যাশা করে না, সুষমাও তাহার ভালোবাসা প্রত্যাশা করে না। তাহারা সংসার গড়িয়া তুলিবার জন্য অথবা সুখ লাভের জন্যও মিলিত হয় নাই। সোমশঙ্কর আরও বলিয়াছে, সুষমার জীবনে একটা ব্রত আছে সেই ব্রত পালনে তাহাকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার জন্য সে এই জীবন বাছিয়া লইয়াছে। এই উত্তর বাঁশরির সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বাঁশরি বিমূঢ় হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

তবে তো বাঁশরি এতদিন এক মিথ্যা বোধ বহন করিয়া ফিরিতেছিল। সে এতদিন ইহাকে পুরুষের রূপ মোহ বলিয়াই জানিত। পুরুষ যতই আদর্শের কথা শক্তির কথা বলুক না-কেন তাহাদের সকলের অন্তরে এক আদিম বর্ব্বরতা আছে। রূপের সম্মুখীন হইলে পুরুষমাত্রেরই অন্তরে সেই বর্ব্বরতা জাগিয়া ওঠে। পুরুষ মাত্রেই রূপ-মোহগ্রস্ত। পুরুষ জাত-দুর্ব্বল। এই কথাটাকেই না সে ক্ষিতীশের সম্মুখে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সোমশঙ্করের এই উক্তির মধ্যে তো ইহার কোন আভাস নাই। যে ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া সোমশঙ্কর সুষমার সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছে তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না সত্য, কিন্তু একথা তাহাকে নিঃসংশয়ে বুঝিতে হইয়াছে যে সাধারণ মানুষের বিচার এখানে পরাভূত হইয়া যায়। তাহার মন একথা বুঝিলে কী হইবে প্রাণ যে বুঝে না। ব্যর্থ প্রেম তাহার হৃদয়কে সম্পূর্ণ অশান্ত করিয়া দিয়াছে। তীব্র শোকে তাহার বুদ্ধি অস্থির। এই মন ও বুদ্ধি দিয়া জীবনের উন্নততর বোধ উপলব্ধি করা অসম্ভব।

বাঁশরি তাই সোমশঙ্করের নিকট হইতে ফিরিয়া সন্ন্যাসী পুরন্দরকে অভিযোগ করিয়াছে।

নারীর হৃদয় ধর্ম্মের কথা সন্ন্যাসী না বুঝুক, সুষমা নারী হইয়া কি এই কথাটাও বুঝিতে পারে না যে যাহাকে ভালোবাসিতে পারা যায় না, কিংবা যেখানে ভালোবাসা নাই সেখানে একজন পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীর পক্ষে মহৎ অন্যায়। কোন তত্ত্ব বা আইডিয়ায় নারীর অন্তরের ক্ষুধা মিটে না। বাঁশরি এই সঙ্গে তাই সুষমাকেও অভিযোগ করিয়াছে।

"বাঁশরি। আইডিয়ার সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।"

সাধারণ মানবিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণ নর-নারী জগৎ ও জীবনকে যে ভাবে দেখে যে নীতি ও ধর্ম্মবোধ গড়িয়া তুলে জীবনের যে নিয়তি রূপ প্রত্যক্ষ করে এবং এই সমস্ত কিছুকে আশ্রয় করিয়া যে বিচার বোধ, বাঁশরি সেই বিচার বোধ লইয়া সোমশঙ্কর, পুরন্দর ও সুষমার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করিয়াছে।

এই জীবন ও জগৎকে মানুষের এই বর্ত্তমান বোধ অপেক্ষাও উন্নত বোধে যে দেখা সম্ভব, বস্তুতঃ সমগ্র মনুষ্য-সমাজ যে ওই পরিণামমুখী হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছে এবং ওই উন্নততর বোধের জগতের নীতি, ধর্ম্ম ও বিচার বোধ ও যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা বাঁশরি বুঝিতে পারে না

বুঝিতে পারে না তাহার কারণ বাঁশরির ওই জীবনের কোন আস্বাদ নাই। বস্তুতঃ ওই জীবন না লাভ করিলে ওই দৃষ্টি লাভ অসম্ভব। কেবল যুক্তি দিয়া ইহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যে উপলব্ধি লাভ করিতে সমগ্র জীবনের রূপান্তর সাধন প্রয়োজন, তাহাকে বর্ত্তমান জীবন বোধ এবং ওই জীবনাশ্রয়ী যুক্তি ও বিচার বোধ দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারা যায় না।

এই দ্বন্দ্ব সজ্ঘাতের ভিতর দিয়া বাঁশরির মধ্যে ধীর রূপান্তর সাধিত হইতেছে—সে রূপান্তর উন্নততর বোধের জগতে। তবু আজ ও পর্য্যন্ত বাঁশরি ওই জীবনটাকে সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে পার

নাই। আপনার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য হোক, অথবা সোমশঙ্করের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিবার জন্যই হোক' বাঁশরি ক্ষিতীশের সহিত আপনার বিবাহের আয়োজন করিয়াছে। কিন্তু বাঁশরিকে আত্মহত্যা করিতে হয় নাই। যে প্রেম হারাইয়া গিয়াছে ভাবিয়া বাঁশরি শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল সেই প্রেমকেই সে ফিরিয়া পাইয়াছে অনেক বড় করিয়া অনেক বেশি করিয়া। অর্থাৎ বাঁশরির সেই নিম্নতর জগতের প্রেম, যাহা নর-নারীর অন্তরে দারুণ মোহ সৃষ্টি করিয়া নর-নারীকে আবদ্ধ করে, তাহা আসক্তি মুক্ত উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়াছে। প্রেমের এই যে মুক্ত স্বরূপ, তাহাতে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে মুক্ত করিয়া তাহাদের মুক্ত বা পূর্ণ স্বরূপে ফিরিয়া লাভ করে। এই প্রেম পরস্পরকে মুক্তি দিয়া মুক্তি লাভ করে। সোমশঙ্কর ও বাঁশরির সেই কথোপকথন অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সোমশঙ্কর। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহ তাকে স্পর্শ মাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

"বাঁশরি। তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন।

"সোমশঙ্কর। কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সঙ্কল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোন এক সঙ্কটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো।

"বাঁশরি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

"সোমশঙ্কর। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্ব্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। * * * নিশ্চিত জান সত্য ভঙ্গ হলে আমি প্রাণ রাখব না মরব তুষানলে পুড়ে।"

সোমশঙ্কর যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে যে উন্নততর বোধের জগৎ আশ্রয় করিয়াছে তাহা কিন্তু ওই মানবিক প্রেমের উন্নততর পরিণাম নয়। তাহা যদি সত্য হইত তবে ব্রত ভ্রষ্টতার জন্য সোমশঙ্করের মনে কোন আশঙ্কা থাকিত না। এক্ষেত্রে একদিকে প্রেম অন্য দিকে প্রেম-

শূন্যতা—এইরূপে দুটি সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা যে জীবনের সত্য দৃষ্টি নয় তাহা এই সমগ্র সত্তার দ্বিধা করণ হইতে স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। প্রেম নর-নারীর সমগ্র সত্তার মিলিত প্রকাশ। কিংবা বলা যায় যে বোধকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সত্তা সামঞ্জস্য লাভ করে তাহা প্রেম। চেতনার উর্দ্ধতর পরিণামে কিংবা ক্রমিক বিকাশে সামঞ্জস্যের এই তত্ত্ব বা প্রেমটাই ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করে অর্থাৎ ওই প্রেমই আবার উন্নততর জগতের সহিত নিম্নতর সুসমঞ্জস বোধের জগতের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করে। এমনি করিয়া ওই মিলনের কেন্দ্র-বিন্দু উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে ক্রমাগত স্থানান্তরিত হইয়া যায়। প্রেমের এই যে তত্ত্ব তাহাতে স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যায় ইহার ক্রমিক উর্দ্ধ পরিণামের সঙ্গে নর-নারীর সমগ্র সত্তার ধীর রূপান্তর সাধন ঘটে। প্রেমোপলব্ধি নর-নারীর কোন একটা আংশিক বোধ নয়, যে ইহাকে একটা অংশে সযত্নে রক্ষা করিয়া জীবনের আর সকল অংশের বিকাশ ঘটাইতে কোন বাধা থাকে না।

সোমশঙ্কর যাহাকেই বিবাহ করুক, যে জন্য বিবাহ করুক, বাঁশরি অন্ততঃ এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার প্রতি সোমশঙ্করের প্রেম মিথ্যা হইয়া যায় নাই। সুষমাকে সোমশঙ্কর ভালোবাসে না।

এই পরিচয় লাভ করিয়া বাঁশরি ধন্য হইয়াছে। তাহার প্রতি প্রেম যদি তেমনি সত্যই থাকে তবে বাঁশরির সোমশঙ্করকে দুঃসাধ্য ব্রত পালনের জন্য ছাড়িয়া দিতে আপত্তি কি? বাঁশরি সোমশঙ্করকে মুক্তি দিয়াছে। সোমশঙ্করের প্রেমের পরিচয় পাইয়া বাঁশরি আনান্দত, ওই প্রেমে সে তাহাকে বাঁধিতে চায় নাই।

প্রেমের দুঃখ সহ্য করিয়া পরস্পরকে মহত্তর কর্ম্ম-লোকে মুক্তি দেওয়াটাই নর-নারীর লক্ষ্য, এ ক্ষেত্রে প্রেম যে-কোন পরিণামে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় নাই। কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়াছে প্রেম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বোধ। ইহা প্রেমের রূপান্তর নয়, প্রেম ব্যতিরিক্ত অন্য পর কোন বোধের উপলব্ধি। এই বোধের জগতের উপলব্ধি ঘটিয়াছে বলিয়া

বাঁশরি প্রেমের দুঃখ ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বাঁশরি এই প্রতিশ্রুতি দান করিতে সন্ন্যাসী পুরন্দরও নির্ভাবনায় সোমশঙ্করের ভার বাঁশরির উপর অর্পণ করিয়াছে।

নাটকের সামাজিক পটভূমিকা সম্পর্কে পরিশেষে দুই একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সুষমার বিবাহ হইবার কথা ছিল ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম মতে। ইহাতে স্বাভাবিক ভাবে অনুমান করিতে পারা যায় যে নাটকের পাত্র পাত্রী ওই সমাজভুক্ত। বাঁশরি ক্ষিতীশের নিকট ওই সমাজের পরিচয় দিয়াছে উচ্চ শিক্ষিত নব্য ফ্যাসানেব্‌ল্‌ বাঙ্গালী সমাজ বলিয়া এই সমাজের নর-নারীর শিক্ষার একটা অধ্যায় সমাপ্ত হয় বিলাতি য়ুনিভারসিটিতে। এই সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসামর্থ্য যে কিছু নাই তাহা নহে। বাঁশরি একথা স্বীকারও করিয়াছে। তবে উহার সত্যকারের পরিচয় অর্থাৎ অসামর্থ্যও ত্রুটি লইয়া ইহার যে মহৎ সামর্থ্য ও সম্ভাবনা তাহার পরিচয় সম্যকরূপে বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজ (ক্ষিতীশ এই সমাজের মুখপাত্র ?) লাভ করিতে পারে নাই। এই সমাজ সম্পর্কে বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের যে পরিচয় তাহা দূর হইতে, কতকটা পুস্তক পাঠ করিয়া কতকটা লোক-শ্রুত, তাই বহুল পরিমাণে বিকৃত। ওই সমাজকে সত্য করিয়া জানিতে বাঁশরি ক্ষিতীশকে সহায়তা করিয়াছে। বাঁশরির সহায়তায় বাঁশরির দৃষ্টি দিয়া আমরাও ওই সমাজের একপ্রকার পরিচয় লাভ করিয়াছি।

এই বাঙ্গালী সমাজের সামর্থ্য ও অসামর্থ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করিয়া বলা যায় যে সন্ন্যাসী পুরন্দরের তথা রবীন্দ্রনাথের উন্নততর জগৎ সৃষ্টির যে পরিকল্পনা তাহার আশা ভরসা স্থল যে এই সমাজ তাহাতে মত ভেদের কোন কারণ নাই। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে লেশ মাত্র সংশয় ছিল না।

এই সমাজের ক্রিয়াটার কোন পরিচয় আমরা পাই নাই, পরিচয় পাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান মার্জ্জিত তত্ত্ব বুদ্ধি। এই বুদ্ধিও কোন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। এই বুদ্ধি তাই জীবনকে

গড়িয়া তুলিতে পারে না। ওই সমাজের নারী ও পুরুষরা যেমন জীবনের আর সকল দিককে অস্বীকার করিয়া কেবল বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাহাকেই ক্রমাগত তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত করিয়া চলিয়াছে, তেমনি ওই সমাজের সহিত বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের প্রাণ-মনের যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধিকে সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়া তাহারা যে সমাজ ও ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে তাহাই বস্তুতঃ নাস্তিক্য ধর্ম্ম। নাস্তিক্য ধর্ম্ম বলিলাম এইজন্য যে ওই তত্ত্বে এবং ওই ধর্ম্মে মানবিক বোধটাকে দলিয়া পিষিয়া হত্যা করা হইয়াছে। দিব্য-জীবন লাভের সাধনার জন্য যে মানবিক বোধের অস্বীকৃতি, তাহা আপাত দৃষ্টিতে অস্বীকৃতি বোধ হইলেও তাহা বস্তুতঃ সমগ্র সত্তার রূপান্তর তাহার মূল্য বোধের স্থানান্তর মাত্র। ইহা সেই জাতীয় কোন সাধনা নয়, আত্মতত্ত্বের কথা যতই ইহার সহিত জড়িত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হোক-না-কেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনা সমগ্র জীবনের রূপান্তর সাধন করিতে চায় নাই, তাহা জীবনের বুদ্ধিমাত্রকে সম্বল করিয়া বাকি সত্তাটিকে ছাটিয়া কাটিয়া বাদ দিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। তাহারা এই সমাজের যেমন তেমনি আপনাদের জীবনের বৃহত্তর অংশটিকে পরিহার করিয়া জীবনের সকল সমস্যাকে উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

উন্নততর জীবনবোধ বলিতে কেবল মাত্র বুদ্ধির বিকাশ বুঝায় না। তাহা একপ্রকার সৌন্দর্য্যবোধও নয়, যাহা ওই সমাজের নর-নারী সুপ্রচুর আয়াস সহকারে অনুশীলন করে। উন্নততর জীবনবোধ বলিতে বুঝায় সমগ্র সত্তার রূপান্তর, এই রূপান্তর ঘটে জাতিরই বৃহৎ আইডিয়া ও আইডিয়েল আশ্রয় করিয়া। ওই আইডিয়া ও আই-ডিয়ালের সহিত সমগ্র সমাজ বিধৃত বলিয়া ওই রূপান্তর সাধনে সমগ্র বৃহৎ সমাজেরও রূপান্তর সাধন ঘটে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজ এইরূপে অন্যোন্য নির্ভরশীল।

ক্ষিতীশের মধ্যে প্রবৃত্তি প্রবল, তাহার স্বভাবের মধ্যে স্থূলতার ভাগ বেশি, কিছু অমার্জ্জিত সেইজন্যও যেমন তেমনি উন্নততর জীবনবোধের কোন উপলব্ধি নাই বলিয়া সোমশঙ্কর ও সুষমা

বিশেষ করিয়া সোমশঙ্কর ও বাঁশরি যে উন্নততর বোধের জগতে মিলিত হইয়াছে তাহা কোনদিন বুঝিতে পারিবে না। বাঁশরি ক্ষিতীশকে একথা তাহার শেষ পত্রে জানাইয়াছে। তাহাদের উন্নততরবোধের জগতটিকে যেমন তেমনি ওই জগতের নর-নারীদের ক্ষিতীশের মত পুরুষ কোনদিন বুঝিতে পারিবে না। বাঁশরির রূপের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া ক্ষিতীশও ঘুরিয়া মরিয়াছে। প্রবৃত্তির বন্ধনে বাঁধা এই সমস্ত পুরুষ যে কতখানি অসহায় বিশেষ করিয়া যে নারী এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা জয় করিয়া উঠিয়াছে তাহার নিকট, তাহার পরিচয় বেশ স্পষ্ট করিয়া দান করা হইয়াছে। বাঁশরি সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই ক্ষিতীশকে লইয়া আপনার ইচ্ছামত খেলা করিয়াছে। ক্ষিতীশের সাধ্য নাই যে সে খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। ক্ষিতীশ এমনি দুর্ব্বল চিত্তের পুরুষ।

উন্নততর প্রেমের জগৎ বলিয়া সে প্রেম সামাজিক সকল সংস্কার জয় করিয়া উঠিয়াছে। এবং সেইজন্যই হয়ত সামাজিক কোন সংস্কারের দিক হইতে তাহা বিচার করিতে পারা যাইবে না। সোমশঙ্কর ও বাঁশরির প্রেমকে সামাজিক কোন সংস্কার আশ্রয় করিয়া বিচার না করিয়া কেবল মানবিক বোধ আশ্রয় করিয়া বিচার করিতে পারা যায় কি-না তাহা চেষ্টা করিয়া দেখা প্রয়োজন। তবু আশঙ্কা আছে ওই জাতীয় বোধকে বড় কোন বোধ বলিয়া শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা যদি অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া প্রমাণিত করা যায় তাহা হইলে ক্ষিতীশের প্রতি বাঁশরির অভিযোগ হয়ত আমাদের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবের স্থূলতা।

নারী ও পুরুষের পরিশুদ্ধ ও উন্নততর মিলনের একটা আদর্শ আমাদের সমাজেও আছে। সে পরিচয় আছে তাহার পুরাণে, কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে। সেখানে সামাজিক মিলন ছাড়া যতই উন্নততর স্বরূপে হোক-না-কেন কোন প্রেমকে স্বীকার করা হয় নাই। কেবল তাহাই নয় সুষমা ভালোবাসে অন্য একজন পুরুষকে, তাহার সাধনা ওই পুরুষকে নিত্য স্মরণ করিয়া দিবে, কিন্তু বিবাহ করিয়াছে অন্য একজন পুরুষকে ; সে পুরুষ আবার ভালোবাসে অন্য একজন নারীকে।

বাঁশরি ভালোবাসে একজন বিবাহিত পুরুষকে এবং সে ভালোবাসায় সে ধন্য হইয়াছে। এই তত্ত্বাশ্রয়ী প্রেম সম্পূর্ণ মানবিক বোধ বর্জ্জিত বলিয়া ইহাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। পুরন্দর পরিশেষে আবার বাঁশরির হাতে সোমশঙ্করের দুর্গম পথের পাথেয় রাখিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। এই তত্ত্ব-লোকে সোমশঙ্করের সহিত দুটি নারীর মিলন সাধিত হইয়াছে, একটি নারী তাহাকে ভালোবাসে না, একটি নারী তাহাকে ভালোবাসে। একটির সহিত তাহার বিবাহিত সম্পর্ক অর্থাৎ সামাজিক, অপরটির সহিত তাহার অসামাজিক অর্থাৎ অবিবাহিত প্রণয় বন্ধন।

তাহাদের আইডিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ওই আইডিয়াকে যদি তাহারা সমগ্র জীবনে রূপায়িত করিতে চায় তবে অনিবার্য্য রূপে সমস্যা দেখা দিবে। তাহাকে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বাঁশরি এই জাতীয় সংগ্রামের কথা বলিয়াছে। পূর্ণ জীবনাদর্শে প্রবৃত্তিকে খ্রীষ্টধর্ম্মের শয়তানের মত পরিহার করা নয়, সামঞ্জস্য সাধন করা প্রয়োজন। একমাত্র এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই ভারতীয় আদর্শে কোথাও অসামাজিক প্রেমকে স্বীকার (অর্থাৎ যাহা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়) করা হয় নাই।

লেখকের অন্য বই

বাঙ্গালার কবি-মণীষা

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :

* * * আলোচ্য গ্রন্থখানিকে অভিনন্দন জানাইতেই হয়। * * * এইরূপ সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজনও ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে আলোচনা করিতে গিয়া লেখক এখানে কবিদের ভাব-সাধনার উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; তাঁহার কথায় এই গ্রন্থ "তথ্যবহুল ঐতিহাসিক পরিচয় নয়, যে তত্ত্ব বা ভাব-সাধনা ওই তথ্য সৃষ্টি করে তাহারই পরিচয়।" লেখকের আলোচনার ভঙ্গীটি প্রাঞ্জল, ভাষা বাহুল্য বর্জ্জিত। পাঠক সমাজে এই গ্রন্থের সমাদর ঘটিলে তাহা সুখের কথা হইবে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ অঙ্গ-সজ্জা ও প্রচ্ছদ পরিপাটি।

যুগান্তর বলেন :

এই বইয়ে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও দেবেন্দ্র নাথ সেন এই চারজন কবির কবি-প্রতিভা ও কাব্য-বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা সর্ব্বত্রই গভীর অথচ বস্তুধর্মী—ভাসা ভাসা ভাবে দুই-চারি কথায় লেখক পাঠককে ভুলাইতে চান নাই, তিনি নিষ্ঠা সহকারে চারিজন কবিকেই পড়িয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং সেই ভাবোপলব্ধির আনন্দ দরাজ হাতে পরিবেশনও করিয়াছেন। * * * লেখক তথ্যজ্ঞ, রসিক ও শ্রদ্ধাশীল। তাঁহার ভাষা পরিচ্ছন্ন, হৃদ্য। আমরা বইটির যোগ্য সমাদর কামনা করি।